শ্রী শ্রীরাধারমণো জয়তি

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

# ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

ভাদ্র
১৩৩৬

## নববর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥১॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণোমদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্ ॥ ২॥
যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম যৎ ত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥৩॥

যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়, (নববর্ষারম্ভে) আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময় সর্ব্বান্তর্যামী নিত্য-নিরঞ্জন শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥১॥

হে বিষ্ণো! এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মরণ, চিন্তন, স্তুতি, বাক্য ও আচরণ সকলই তোমার ভাবে হয় ॥২॥

হে হরে! আমি তোমারই কৃপাশক্তিতে চালিত হইয়া যাহা যাহা করিব সে সকলই তুমি তোমার প্রিয়-কর্ম্মবোধে গ্রহণ কর এইটীই আজ আমার তোমার চরণকমলে একান্ত প্রার্থনা ॥৩॥

## প্রাণের কথা।*

( ১ )

সংসারের শত জ্বালা-যন্ত্রণা সহিয়া
নিত্য কত অভাব ও অভিযোগে প'ড়ে,
আধি ব্যাধি শোক তাপে নিয়ত দহিয়া,
ছট্‌ফট্ করি কত সতত কাতরে।
একাকী পড়িয়া থাকি সংসারের কোণে,
আত্ম বন্ধু কোন জন কোন দিকে নাই;
ভুঞ্জি নিজ কর্ম্মফল নীরবে নির্জ্জনে,
কেহই ত নাহি মোর, কা'রেও না চাই।
এ হৃদয়ে ছিল আশা আকাঙ্ক্ষা সে কত,
কোথা গেল সেই সব একি হ'ল হায়!
মন-বনে দাবানল জ্বলে অবিরত,
মনের সকল বৃত্তি আজি পুড়ে যায়!
পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব সাধ আশা!
আগুন লেগেছে মনে একি সর্ব্বনাশা!!

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* লেখকের পত্রে জানিলাম "প্রাণের কথা" খুব দীর্ঘ, একমাসে প্রকাশ অসম্ভব, কাজেই প্রতি মাসে কিছু কিছু প্রকাশ করিব। ভঃ সঃ

# শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাসদেবের পত্র

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেবের শ্রীহস্তের লিখিত একখানি পত্রের নকল শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদামহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন. আমরা পাঠকগণের আস্বাদনের জন্য নিম্নে উহা মুদ্রিত করিলাম। ( ভঃ সঃ )

গুড়প গ্রাম

২৮শে মাঘ, ১৩০৫

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ রাম কি জয়॥

* * * * প্রেমদাতা, পরম দয়াল নিতাই চাঁদের কৃপায় ভবিষ্যৎ পরম মঙ্গলময় সময় আসিতেছে।

সর্ব্বদা নিতাই গৌরাঙ্গের নাম প্রকাশ্যে না পারিলেও মনে মনে স্মরণ রাখিবে। আর নিয়মমত সন্ধ্যা-পূজা না করিতে পারিবার বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তৎসম্বন্ধে অভয় দিয়া বলিতেছি,—তিন সন্ধ্যা স্মরণ অথবা যখন পারিবে, অগত্যা দিন রাত্রে একবার— স্মরণ করিলেও হইবে, কিন্তু "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নামটী নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে করিতে পারিলে ভাল হয়। অগত্যা মনে মনেও নাম করিবে।

সর্ব্বদা লোকের নিকট দৈন্যভাব আনিবার চেষ্টা পাইবে, মনে রাখিও দীনতাই একমাত্র সাধন-কল্যাণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরাধারমণ চরণদাস।

# "অচেনা"

সহস্র বান্ধব মাঝে সে দুর্ভাগা একা।
চিনে নাই যেবা তোমা সর্ব্বজন সখা॥
একের হৃদয় ব্যথা বুঝে না অপরে।
বুঝ তুমি থাকি সদা সবার অন্তরে॥
যখনি মানব প্রাণ ছায় অন্ধকারে।
শুধু তবচিন্তা পারে আলোকিতে তারে॥
শোকাবেগ আলোড়িত মানবের মন।
হয় স্থির পেলে তব ছায়া পরশন॥
পাপীও যদ্যপি তোমা কাতরেতে ডাকে।
সব পাপ হ'তে তুমি তরাও তাহাকে॥
ভুলেও যে জন প্রভু স্মরেছে তোমায়।
তুমি প্রভু কখনও ভোলনা তাহায়॥
কে তুমি অচেনা বন্ধু দাও পরিচয়।
এত দয়াবান হ'য়ে হ'ওনা নিদয়॥

শ্রীশক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়।

# শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সহিত কথোপকথন।

( ১ )

প্রশ্ন—বাবা! ভগবানকে কিরূপে পাওয়া যায়?

উত্তর—তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—শুধু চাহিলেই পাওয়া যায়?

উত্তর—নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন—আপনি কি বলেন যে, আমরা ভগবানকে চাহি না?

উত্তর—না বাবা! বাস্তবিক আমরা তাঁহাকে চাহি না। এ সংসারে সামান্য অর্থের জন্য আমরা যেরূপ কষ্ট স্বীকার করি, পুত্র কন্যার ব্যাধি হইলে যেরূপ ব্যস্ত হই বা একটী বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য যত একাগ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকি, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যাকুলতা বা একাগ্রতাও আমাদের আছে কি? আমরা নিজের সুখের জন্য লালায়িত। ভগবানকে যে চাই তাহাও নিজের সুখের জন্য।

প্রশ্ন—বাবা! মানব জীবনে সুখ ভিন্ন প্রাপ্তির বিষয় আর কি হইতে পারে?

উত্তর—বাবা! মানব জীবনে প্রাপ্তির বিষয় সুখ নহে—আনন্দ।

প্রশ্ন—আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি?

উত্তর—সুখ মায়া কল্পিত, আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্তু। সুখ নিজের জন্য ব্যস্ত, সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র। আর

আনন্দ অপরের জন্য ব্যস্ত, নিজে সংসারের হইবার জন্য ব্যগ্র। সুখ প্রভু হইতে চায়, আনন্দ দাসানুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্ব্বদা ভয়, পাছে কিছু হারায়, আনন্দ আপনার যথা সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে। সুখ সুধার জন্য লালায়িত, আনন্দ দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক সদাশিব রূপে মহানন্দে বসিয়া থাকে। ফল কথা সুখ স্বার্থপর, আনন্দ নিঃস্বার্থ।

প্রশ্ন—বাবা! এ আনন্দ পাইবার উপায় কি?

উত্তর—শ্রীভগবানের শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনই আনন্দ বা শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ক্রমশঃ

শ্রীহরিদাস নন্দী।

# শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-গান

(১)

আজি, নন্দ-পুর মাঝে চন্দ্র পরকাশ
গোকুল নগর উজিয়ারি।
রাজ-ভবন মাঝে মঙ্গল বাজত
গাওত গোপকুল নারী॥
কৃষ্ণ-মেঘ-দল বরষি সঘনে
থির নিরমল হওল আপনে
বিজলী উজলিয়া লুকাওল গগনে
হরি ব্রজ-রাজ নেহারি॥

ভাদরে কৃষ্ণা অষ্টমী রজনী
রোহিনী যোগেতে (হরি) উয়ল আপনি
যত ব্রজ-রমণী শঙ্খনিনাদ শুনি
ধাই আওল সারি সারি ॥
দেখই সব জন যশোদা দুলাল
পূরব কত কথা অন্তরে জাগল
চাহি অনিমিখে কত সুখ উপজল
পাই গোলক বিহারী ॥
নন্দরাজ যাই যশোমতি ঠাঁই
কহত কতি মোর জীবন কানাই
দেহ দেহ বলি দু'বাহু বাঢ়াই
বক্ষে ধরল ধিরি ধিরি ॥
দেব দেবী যত অমর নগরে
পুষ্প বরিষল গোকুল উপরে
মধুর কীর্ত্তন মঙ্গল কারণে
শুনাওত যত নরনারী ॥

শ্রীমন্মথ নাথ চন্দ্র ।

( ২ )

অম্বরে ঘনঘটা ঘোরা রজনী, ঘন—
ঝিল্লীরব ঝঙ্কারব ঝনননন
থৈ থৈ যমুনা ধায় কলনাদে ।
নিদ্রিত মথুরা পুর নরনারী
বারি ঝর ঝর ঝরে—
হানি তড়িৎ গভীরনাদে গর্জ্জে জলদ
মদমত্ত দাদুরী নাচে গায় মনোসাধে ॥

শ্রীল বসুদেব দেবকী শঙ্কিত অতি
ভোজভূপতি কারা কক্ষ মাঝারে,
দৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধা কোমল চরণ কর
ভাসে দুস্তর দুখ সিন্ধু পাথারে,
জাগে কংস শমন ভয়ে যামিনী
কম্পিত ধরণী প্রতাপে—
লাঞ্ছিত ধ্যানি জ্ঞানি ব্যথিত ভক্তমুনি
স্মরে কাতরে হরি আর্ত্তনিনাদে ॥
হেন সন্তাপ-তাপিত যবে মানব
মরণ অধিক সহে দুখ দুর্ভোগ,
আজ, ভাদ্র বাদল ভরা অষ্টমী রাত্রে
রোহিণী নক্ষত্রে প্রকট শুভযোগ,
মুক্ত কারাগৃহ রুদ্ধদ্বার সব
মুক্ত চরণ কর শৃঙ্খল পাশ—
বসুদেব দেবকী নিরখে অতি অপরূপ
চতুর্ভুজধারী শ্রীহরি শ্রীনাথে ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম করে ধৃত
বক্ষে শোভিত মণি কৌস্তুভ হার,
শ্রবণে মকর মণি কুণ্ডল ঝলমল
শীর্ষে কিরীটী ঘন কুন্তল আর—
লক্ষকোটী রবি চন্দ্র উদয় সম
উদিত শ্যামল শিশু মূর্ত্তি—
শ্রীঅঙ্গ কিরণে অমৃত সিঞ্চনে
নাসে অনন্ত তাপ যাতনা অবসাদে ॥

উর্দ্ধে অলক্ষিতে অমরবৃন্দ নাচে
বিধি বাসব বৈষ্ণব ত্রিপুরারী,
গাহে আনন্দে বদন ভরি জয় জয়
বর্ষে কুসুম সব সুর সুকুমারী,
এ মহামুহূর্ত্তে পাষণ্ড অসুর সম
জনম জনমকৃত কোটী অপরাধে—
(এ) বিশ্বরূপ হরি-চরণ স্মরণ ছাড়ি
মত্ত সুজন সহ কলহ বিবাদে ॥

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী।

# বসুদেব দেবকীকৃত স্তব

জয় জয় নারায়ণ জয় জয় নারায়ণ
হে আর্ত্তভয় ভঞ্জন।
অনন্ত দুখ নাশন হরি
ত্রাহি ত্রাহি জনার্দ্দন ॥
মোরা, চিনেছি হে চতুর্ভুজ
অজ-ভব পূজিত তুমি,
রচিত তব বৈভব
এ বিশ্বমায়া নট ভূমি,
রঙ্গ তব রসময়
কে বুঝেছে অন্তর্যামি,
এ, মায়া তাড়িত অন্ধজনে
নাহি দিলে জ্ঞানাঞ্জন ॥

অনাদি হ'তে শায়িত যারা
শেষ সুখ-শয়ন পরে,
ক্ষীরোদ গর্ভোদকাদি
কারণ জলনিধি নীরে,
তব অংশের অংশ তারা
বিদিত সংসারে ;—
যারা চতুর্ব্যূহ রূপে
স্বভাবে স্বধামচারী,
বাসুদেব অনিরুদ্ধ
প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি করি,
অংশ তারা তুমি সবাকার
অংশীরূপে বিহর হরি,
ধাম পর ব্যোম—
বৈকুণ্ঠে হে সনাতন ॥
ব্রহ্মা তব তনয় তব,
প্রণয়িনী কমলা সতী,
অনন্ত বিশ্বেতে তব
অনন্ত রূপে সংস্থিতি,
অন্ত তব হে অনন্ত
কে করিতে পারে ;—
কি জানি মোরা তব গুণ
হে নব-নীরদ সুন্দর,
তব নামে প্রমত্ত ভোলা
নাচে হ'য়ে দিগম্বর,

নারদ তুলি তান
বীণা যন্ত্রেতে নিরন্তর,
গাহি হরি বদন ভরি
মুগ্ধ করে ত্রিভুবন ॥
কংসাসুর সংহারিতে
যদিও তুমি অবতরি,
তব তরে বা কেন হে তবু
শঙ্কিত হ'য়েছি হরি,
নহেত তব ভোজপতি
সামান্য অরি ;—
দুখ দিয়ে দিয়েছ ধরা
দুখেতে আর কি ভয় আছে,
ভয় শুধু এ ভাগ্য দোষে
তোমাধনে হারাই পাছে,
(৫) বিশ্বরূপে কহে ওরূপে
আর কেন হে এস কাছে,
হৃদয় চিরে রাখি তোমারে
লুকায়ে হৃদি-রঞ্জন ॥ *

শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী।

---

* শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী বিষয়ক আরও কয়েকটি কবিতা আমরা পাইয়াছিলাম কিন্তু স্থানাভাবে এবার সকলগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, লেখকগণ ক্ষমা করিবেন। (ভঃ সঃ)

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

(নিত্যধামগত সিদ্ধান্তবাচস্পতি শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী
মহোদয়ের ভাবাবলম্বনে লিখিত।)

আজ শুভ জন্মাষ্টমী দিনে বোধহয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনে এই জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্য করিয়াই ভক্তিদেবী পত্রিকারূপে প্রথম প্রকাশিত হইয়া ছিলেন। নানাবিধ বাধা বিপত্তি এই দীর্ঘকাল দেবীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কি জানি দেবীর কি ইচ্ছা, এক এক করিয়া সকল বাধা বিপত্তি সরাইয়া নিজ ইচ্ছায় আজ পর্য্যন্তও নিয়মিত প্রকাশ হইয়া আসিতেছেন। দেবীর এই স্বইচ্ছায় প্রকাশের কিছু সেবার অধিকার পাইয়াও আমরা ধন্য।

অতীত দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশ সময়ে দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী নক্ষত্রে নিশীথ সময়ে আয়ুষ্মান্ যোগে কৌলবকরণে সিংহ রাশিস্থ চন্দ্রে বৃষলগ্নে শুক্রের ক্ষেত্রে রবিরহোরায় দ্রেক্কাণে শুক্রের নবাংশে মঙ্গলের দ্বাদশাংশে বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার আবির্ভাব কালে চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি নিজ নিজ উচ্চগৃহে অর্থাৎ চন্দ্র বৃষে, মঙ্গল মকরে, বুধ কন্যায় ও শনি তুলায় অবস্থিত ছিলেন। আর বৃহস্পতি মীনে এবং রবি সিংহে, শুক্র তুলায় ও রাহু বিশ্চিকে অবস্থান করিতে ছিলেন।

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবকালে মথুরাপুরীর ও গোকুলপুরীর নর-

নারী সকল যোগ নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা সকল শান্তভাব ধারণ করিয়া ছিল। দিক্ সকল প্রসন্ন এবং গ্রাম, নগর ব্রজ ও আকর সকলের বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইয়া ছিলেন। নদীসকল প্রসন্ন সলিলা ও হ্রদিনী সকল জলজ-শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল। বিবিধ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভিত বনরাজি বিহঙ্গকুলের ও ভ্রমর নিকরের কলরবে শব্দায়মান হইয়াছিল। সমীরণ সুখস্পর্শ ও হুতাশন উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সাধুগণের মানস প্রসন্ন ও স্বর্গীয় দুন্দুভি সকল ধ্বনিত হইয়াছিল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব সকল গান, চারণ সকল স্তব, অপ্সরা ও বিদ্যাধর সকল নৃত্য, দেবতা ও মুনি সকল পুষ্প বর্ষণ করিয়া ছিলেন।

ঘোর তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে সাধুগণের প্রার্থনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ ঐশ্বরীক চতুর্ভুজরূপে কংশের কারাগারাস্থত শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবকীদেবী হইতে প্রকাশ হইলেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মহামনা বসুদেব দেখিলেন— শাস্ত্র যাঁহাকে পুরাণ-পুরুষোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন সেই সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীহরি আজ বালকরূপে কারাগার মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন। আঃ মরি মরি কি রূপের ছটা, পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, চারিটী হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা পাইতেছে, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভমণি স্নিগ্ধ নীল নীরদবর্ণ, অমূল্য বৈদূর্য্য মণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম অনুবদ্ধ হইতেছে সর্ব্বঅঙ্গ নানা আভরণে সমলঙ্কৃত।

বসুদেব শ্রীহরিকে তদবস্থায় পুত্ররূপে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া পুত্রজন্মোৎসবে আনন্দ-মনে, মনে মনেই ভুদেব ব্রাহ্মণগণকে অযুত গাভি দানের সঙ্কল্প করিলেন। যদিও আজ ভগবান পুত্ররূপেই বসুদেব দেবকীর নিকট প্রকাশ পাইয়াছেন তথাপি তাঁহার অঙ্গ-কান্তিদ্বারা কারাগৃহ উজ্জ্বল হইয়াছে দেখিয়া এবং পরম পুরুষ বলিয়া অবধারণ করিয়া ভগবত্তক্তি দ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধি, বিগতভয় বসুদেব স্বভক্তদ্রোহী দুষ্টগণের বিনাশকারী ভগবানের

প্রভাব বিদিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধি দৃক্ ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি গুণাতীত, সর্ব্বান্তর্যামী, কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ অর্থাৎ আপনি কাহারও গোচরীভূত নন, আপনার অনুভবেই আনন্দ হয়। আপনি পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেও সম্প্রতি আমার নয়ন গোচর হইলেন, ইহাতে আমার বড়ই সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

স এব স্ব প্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥

অর্থাৎ—গুণাতীত আপনি নিজ মায়াবলে এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অপ্রবিষ্টভাবে থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হয়। সর্ব্বত্র ব্যাপ্তভাবেই আপনি প্রকাশ পাইতেছেন।

যথেমেঽবিকৃতাভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানা বীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্নতেষামিহ সম্ভবঃ ॥

অর্থাৎ যেমন অবিকৃতভাব অর্থাৎ মহৎ তত্ত্বাদি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের মত প্রকাশ পায় আপনিও সেইরূপ। যেমন মহদাদি ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া পৃথকভূত হইলে নানাবিধ কার্য্যকরণ শক্তি লাভ করতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্টের মত প্রকাশ পায় পরন্তু প্রবিষ্ট নয় কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাহারা ছিল।

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয় লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃত ত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥

অর্থাৎ—আপনি এই প্রপঞ্চ বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও রূপাদি জ্ঞান-জনিত অনুমেয় স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নন, আবার সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপক সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ পরমার্থ বস্তু যে আপনি আপনার কোন আবরণ সম্ভবেনা সুতরাং আপনার অন্তর বাহির ভেদও সম্ভবে না, কেবল আমার পরম সৌভাগ্য বশতঃই বিদিত হইলেন।

য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্‌যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্‌॥

হে ভগবন্‌! চৈতন্য স্বরূপ আত্মা দ্বারা প্রকাশিত এই দৃশ্য বস্তু সমূহেতে যে ব্যক্তি আত্মব্যতিরিক্ত অর্থাৎ আত্মা ছাড়া পৃথক অথচ উত্তমরূপে বর্ত্তমান বলিয়া মনে করে সে নিশ্চয়ই মূর্খ, কারণ বেদাদি শাস্ত্রবাক্য যাহাকে অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই ত্যক্ত বস্তুতে তাহারা নিত্য কেলি করে।

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতি সংযমান্‌ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥

হে বিভো! আপনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার হইয়াও অচিন্ত্য নিজশক্তি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিয়া থাকেন। আপনি শক্তিমান; শক্তির কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে; অতএব কোন বিষয়েই কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্ব মায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥

আপনি কৃপা করিয়া ত্রিলোকীর পালনার্থ সান্নিধ্য মাত্র দ্বারা সত্ত্বগুণের উপকারক শুদ্ধ বিষ্ণুরূপ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোময়ত্বহেতু ব্রহ্মরূপ এবং সংহারের নিমিত্ত তমোময়ত্ব হেতু ক্রোধাদিবহুল রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষুর্গৃহেঽবতীর্ণোঽসিমমাখিলেশ্বর।
রাজন্য সংজ্ঞাসুর কোটিযূথপৈর্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

হে বিভো! এই জগতের রক্ষা করিবার ইচ্ছায় আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে অখিলেশ্বর! আপনি যে এই অবতারে ক্ষত্রিয় নামধারী অসুর সমূহের প্রধান অধিপতি কর্তৃক সুরক্ষিত সেনাসমূহকে বিনাশ করিবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্মনৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাং স্তেণ্যবধীৎ সুরেশ্বর।
সতেঽবতারং পুরুষৈঃসমর্পিতং শ্রুত্বাঽধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥

হে দেবাধিদেব! এই খল দুরাচার কংস আমাদিগের গৃহে আপনি আবির্ভূত হইবেন এই কথা পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াই আপনার অগ্রজ সকলকে সংহার করিয়াছে। সংপ্রতি তাহার নিয়োজিত প্রহরিগণ কর্তৃক আপনার আবির্ভাব বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

বসুদেব এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত হইলে কংসভয়ে ভীতা দেবকীদেবীও মহাপুরুষ চিহ্নধারী আপনার গর্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত পুত্ররূপী ভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবকী বলিলেন—

রূপং যত্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥

বেদ সকল যাহাকে অব্যক্ত অনির্ব্বাচ্য গুণাতীত নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ আদিভূত সত্তামাত্র স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করেন, সর্ব্বব্যাপী আত্মপ্রকাশক জ্ঞানস্বরূপ সেই সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুই আপনি।

নষ্টে লোকে দ্বিপারার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেশেষসংজ্ঞঃ॥

কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধপরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশভুবন বিনিষ্ট হইলে ভূতেন্দ্রিয়াদি নিজ নিজ কারণে লীন হইলে, অহঙ্কার তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে লয় পাইলে, ব্যক্তবিশ্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলে শেষ সংজ্ঞক ( অনন্ত নামক ) একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকিবেন।

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং।
নিমেষাদির্ব্বৎসরান্তোমহীয়াং স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥

তুমি কালেরও নিয়ন্তা, এই যে নিমেষাদি বৎসরান্ত এবং বৎসরাবৃত্তি দ্বারা মহান্ দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত সর্ব্বসংহারককাল প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং যেকাল দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে সেই কালকে বেদসকল আপনার ইচ্ছা বা লীলা বলিয়াই কীর্ত্তন করেন।

মর্ত্ত্যোমৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎ পাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য সুস্থঃ শেতেমৃত্যুরস্মাদপৈতি॥

হে সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীহরে! মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মরণ-ধর্ম্মশীললোক, লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়াও নির্ভয় হইতে পারে না, কিন্তু আপনার চরণলাভে মৃত্যুভয় বারণ হইয়া থাকে। কারণ আপনার পাদপদ্ম হইতে মৃত্যুও ভয়ে পলায়ন করে।

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন স্ত্রাহিত্রস্তান্‌ভৃত্যাবিত্রাসহাঽসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মাপ্রত্যক্ষংমাংসদৃশাংভোঃ কৃষীষ্ঠাঃ॥

হে সর্ব্বমঙ্গলময়! আপনি অতি দুরাচারী উগ্রসেন তনয় কংস হইতে ভীত যে আমরা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনার এই ধ্যানগম্য ঐ ঐশ্বরীংরূপ জ্ঞান দৃষ্টিহীন মানবদিগের গোচরীভূত করিবেন না।

জন্মতে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥

হে মধুসূদন! পাপ কংস যেন আমাতে আপনার আবির্ভাবের কথা

জানিতে না পারে। আমি আপনার মঙ্গলের জন্য কংস হইতে অতিশয় ভীত হইতেছি।

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদোরূপমলৌকিকং।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥

হে বিশ্বাত্মন্! শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভাযুক্ত আপনার এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ অবিলম্বে সম্বরণ করুন। আমি বড়ই ভীত হইয়াছি।

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরোভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহোনৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥

যে পরাৎপর পরমপুরুষ প্রলয়কালে এই পরিদৃশ্যমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে অসঙ্কোচিতভাবে নিজের উদর মধ্যে যথাযোগ্যরূপে ধারণ করেন, কি আশ্চর্য্য সেই সর্ব্বময় ভগবান আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিলেন! হে দয়াময়! এ কেবল মনুষ্য লোকের বিড়ম্বনা অর্থাৎ আপনার অভাবনীয় লীলা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

বসুদেব ও দেবকীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান বলিলেন—"মা! স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে তুমি পৃশ্নিনামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, তৎকালে এই পিতা বসুদেব সর্ব্বদোষ রহিত সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তোমরা দুইজনে প্রজা সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ নিয়মিত করিয়া উগ্রতর তপস্যা করিয়া ছিলে। তোমরা বর্ষা, বাত, রৌদ্র, হিম, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কালধর্ম্ম সকল সহ্য করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা কামাদি মনোমল বিদুরিত করিয়া গলিতপত্র ও বায়ু ভোজন দ্বারা দেহ ধারণ পূর্ব্বক আমার নিকট হইতে অভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধির অভিলাষে শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। মন্মনা হইয়া এই প্রকার পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে করিতে দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে আমি তোমাদিগের তপস্যা ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে বরদানের

ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তোমরা আমার নিকট মৎসদৃশ পুত্র বর প্রর্থনা করিয়াছিলে, আমিও তোমাদিগকে "তাহাই হউক" বলিয়া বর দিয়াছিলাম। আমার সমান অপর কাহাকেও না দেখিয়া আমার বাক্য রক্ষার জন্ম আমি স্বয়ংই তোমাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া ছিলাম। তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় তখন আমার নাম হইয়াছিল "পৃশ্নিগর্ভ"।

তারপর দ্বিতীয় জন্মে তোমরা অদিতি ও কশ্যপ নাম ধারণ করিলে আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া "বামন" নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই তৃতীয় জন্মেও সেই আমি তোমাদিগের বিশ্বাসের জন্ম এইরূপ চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তোমরা পুত্রভাবেই হউক বা ব্রহ্মভাবেই হউক পুনঃ পুনঃ আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমাতে বদ্ধস্নেহ হইয়া মদ্গতিই লাভ করিবে। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

ভগবান এই কথা বলিয়া তখনই স্বেচ্ছানুসারে দ্বিভূজ নরবালকেররূপ ধারণ করিলেন। এই দ্বিভুজ নরবালকরূপের আবির্ভাবে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ভুজরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দ্বিভুজরূপ শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাত্মকরূপ এবং চতুর্ভুজরূপ তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মকরূপ। তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই উভয় রূপই প্রকটিত বা অপ্রটিত হইতে পারে। দ্বিভুজরূপের প্রকট সময়ে চতুর্ভুজরূপ অপ্রকট থাকে, আবার চতুর্ভুজরূপের প্রকট কালে দ্বিভুজরূপ অপ্রকট থাকে। চতুর্ভুজের প্রাকট্যে নন্দনন্দনত্ব আচ্ছাদিত এবং বসুদেবনন্দনত্ব প্রকাশিত হয়। দ্বিভুজরূপের প্রাকট্যে বসুদেবনন্দনত্ব আচ্ছাদিত এবং নন্দনন্দনত্ব প্রকাশিত হয়। ভগবান তাই দ্বিভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নন্দনন্দনত্ব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত বসুদেবকে বলিলেন—

যদি কংসাদ্বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়।
মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদাগর্ভ সম্ভবাম্॥

হে পিতঃ! যদি আপনারা আমার জন্য কংস হইতে ভীত হইয়া থাকেন, তবে আমার মায়া যিনি গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুন এবং আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া আসুন।

ভগবান শ্রীহরি এইভাবে পিতাকে বলিয়া স্বাভাবিক নরবালকের ন্যায় ক্রীড়ামত্ত হইলেন। এ দিকে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দালয়ে গমনোদ্যত হইলে যোগমায়া প্রভাবে দ্বাররক্ষক ও অপরাপর পুরবাসী সকল নিদ্রিত হইল, কারাগৃহের কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধদ্বার আপনা আপনি উন্মুক্ত হইয়া গেল। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন সহকারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব নিজ ফণা দ্বারা ঐ বারি নিবারণ মানসে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ঘন বারি বর্ষণে যমুনা নদী গম্ভীর জলপ্রবাহের বেগ দ্বারা তরঙ্গায়িত ও ফেন ব্যাপ্ত এবং ভয়ানক আবর্ত্ত দ্বারা আকুলিত থাকিয়াও সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন তদ্রূপ বসুদেবকে জানুমাত্র জলা হইয়া পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সকলেই নিদ্রিত, তিনি নিজ ক্রোড়স্থিত শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তাঁহার তনয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় যমুনা পার হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কন্যাটিকে দেবকীর শয্যায় রাখিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের করও চরণদ্বয় পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং কারাগৃহের কপাট সকল পূর্ব্বের ন্যায় আবৃত হইল।

এইটী হইল ভাগবতের মত। পুরাণান্তরে আছে—বসুদেব যখন মথুরাধিদেব শ্রীশ্রীভুতেশ্বর মহাদেবের স্থান অতিক্রম করিয়া যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যমুনা অতি ভয়ঙ্কর, তদ্দর্শনে তিনি কি উপায়ে পার হইবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বিদ্যুৎ চমকিল, তাহাতে দেখিতে

পাইলেন যে একটী শিবা অনায়াসে যমুনা পার হইয়া যাইতেছে, উহা দেখিয়া বসুদেবের সাহস হইল, তিনি কৃষ্ণকে দৃঢ়রূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শিবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ যমুনা জলে কৃষ্ণ পড়িয়া গেলেন, বসুদেব রোদন করিতে করিতে পুত্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণও যমুনার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া বসুদেবের নিকট পুনরাগমন করিলে বসুদেব কৃষ্ণকে পাইয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। এবং যথাকালে যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। যমুনার এই স্থানটী এখন গ্রামাকারে পরিণত এবং শ্রীকৃষ্ণকে কোল দেওয়ায় "কোল" নামে প্রসিদ্ধ।

আমরা এবার এই জন্মবৃত্তান্তই সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া রাখিলাম, ক্রমে ক্রমে আমরা অন্যান্য লীলা আলোচনার চেষ্টা করিব।

# হিন্দোলী

( ১ )

ওগো, সাজিয়ে ডালা, কানন্ বালা, দাঁড়িয়ে ল'য়ে অঞ্জলি।
বায়ুর দোলে, মেঘের কোলে, ঘুমিয়ে অলস্ দল্তোলি॥
গাচ্ছে' উদার, মেঘমল্লার, পদ্মাবতীর প্রেমতলী।
ঐ, লগন্ পেয়ে, আস্‌চে ধেয়ে, শ্রীগোবিন্দের হিন্দোলি॥

( ২ )

পাগল বাদল, বাজায় মাদল, হাম্বা ডাকে মঙ্গলী।
কীচক, স্বনে, গাচ্ছে বনে, হিন্দোলের ঐ তান্ তুলি।
গীত-মগনা, শ্রীযমুনা, চলচে দুকুল আন্দোলী।
লগন্ পেয়ে, আস্‌চে ধেয়ে শ্রীগোবিন্দের হিন্দোলী॥

( ৩ )

গুঞ্জরে অলি, মঞ্জুরে কলি, চঞ্চলা চলে চঞ্চলি,
মধুর রসে, বিশ্ব ভাসে, উজ্জ্বলে দিশি উজ্বলি
হাসে, কীর কোয়েলী, গোপ গোয়ালী, নীপ বেতসী বান্ধলী।
লগন্ পেয়ে, আস্‌চে ধেয়ে শ্রীগোবিন্দের হিন্দোলী ॥

( ৪ )

সবে, আয় চ'লে আয়, যায় চলে যায়, স্বয়ম্বরের গোধূলী।
এস, পথের পাশে, দাঁড়াও এসে, পাত্ত ল'য়ে প্রাঞ্জলি,
লগন্ গেলে, যাবে খুলে, সব স্বপনের দল্‌গুলি
স্মরণ কর, বরণ কর, শ্রীগোবিন্দের হিন্দোলী ॥

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কাব্য-পুরাণতীর্থ

# শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের বিবরণ সম্বন্ধে আমার ভ্রম।

বিগত শ্রাবণ সংখ্যার "ভক্তিতে" ভক্তবর ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এ অধমের সঙ্কলিত "শ্রীশ্রী দ্বাদশগোপাল" হইতে যে সকল প্রমাণাদি তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার ভ্রমের কথা উল্লেখ করিতেছি। শ্রীপাদ গৌরী দাস প্রভুর জীবনী সংগ্রহ কালে আমি যে যে গ্রন্থ তৎকালে দর্শন করিতে পাইয়াছিলাম তাহা হইতেই তাঁহার বিবরণ উদ্ধৃত করি। কিন্তু পরে নটবর দাস রচিত—"সুবল মঙ্গল" নামক একখানি

গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ ১ম বর্ষ "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়" পত্রিকায় দর্শন করিয়া জানিতে পারি যে, গৌরীদাস প্রভু মুকুটী কুলোদ্ভূত বরুণবাচস্পতির বংশধর ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ আছে ;—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
সত্য করি দুই ভাই ঘরেতে রহিলা।
প্রকাশ হইয়া দুই নীলাচলে গেলা॥
ঠাকুর পণ্ডিতের শাখা করিল গণন।
এবে বংশাবলী তাঁর করিব লিখন॥
বরুণ বাচস্পতি নাম মুকুটী কুল উজ্জ্বল।
ধন বিদ্যা যশারন্তে ভুবনাচার্য্য আত্মজ॥
কংশারি মিশ্র অম্বিকা নগরেতে স্থিতি।
ষড়াত্মজ বিখ্যাত গৌর ভক্ত মহামতি॥
দামোদর পণ্ডিত জগন্নাথ সূর্য্যদাস।
গৌরীদাস কৃষ্ণদাস নৃসিংহ চৈতন্যদাস॥
বরুণ বাচস্পতি ঘরণী নাম রত্নাবতী।
তাঁর গর্ভে দুই পুত্র হইল সন্ততি॥
ভুবন মিশ্র নাম আর মোহন মিশ্র।
দুই ভ্রাতা পিতৃ ভক্ত করে ইষ্ট কার্য্য॥
মোহন মিশ্রের কিছু সন্তান না হইল।
ভুবন ঠাকুরের এক পুত্র উপজিল॥
সুরধুনী নাম হয় ভুবন ঘরণী।
কংশারী মিশ্র নাম পুত্রের বাখানি॥

কংশারী মিশ্রের পত্নী নাম যে কমলা।
তাহার গর্ভেতে ছয় পুত্র উপজিলা।
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট।
সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ।
তাহার কনিষ্ঠ হন পণ্ডিত গৌরীদাস।
অনুজ কৃষ্ণদাস যেঁহ পুরে মন আশ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য।
প্রেম বিতরণ করি বিশ্ব কৈল ধন্য॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি গৌরাঙ্গের সনে।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় করেন প্রেম দানে॥
দামোদর ঠাকুরের পুত্র বড়ু গঙ্গারাম।
তেলিয়া বোধরে যেঁহ কৈলেক বিশ্রাম॥
তার এক পুত্র নাম গোকুলানন্দ হয়।
বড়ু গঙ্গাদাস ঠাকুরের চরণ আশ্রয়॥
জগন্নাথ ঠাকুরের এক পুত্র হয়।
বিষ্ণুদাস ঠাকুর যেঁহ জানিহ নিশ্চয়॥
ইহার যে চারি পুত্র বিদিত প্রমাণ।
অনন্ত আচার্য্য উদ্ধারণ পুরে ধাম।
শ্যামদাস আচার্য্য পাকড়হাঁস বাসী।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য হন বোধর নিবাসী॥
রাম জীবন আচার্য্য গৌর্ণা ঝাড়ান্দি।
এই চারি পুত্র হন মহা প্রেমোন্মাদি॥
অনন্ত আচার্য্যের হএন পুত্র চারি।
মধুসূদন, নৃসিংহানন্দ নাম যেঁহো ধরি॥

রামলক্ষ্মণ, যদুনন্দন নাম হয়।
এই চারি পুত্র যাঁর করিল নিশ্চয়॥
শ্যামদাস আচার্য্যের চারি পুত্র হয়।
বল্লভ কিশোর রাম জীবন মহাশয়।
গোপীনাথ ছোট পুত্র ইহার বিদিত।
এই চারি পুত্র নাম আচার্য্য যে খ্যাত॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্যের এক পুত্র হয়।
রূপ রাম নাম খ্যাত জানিহ নিশ্চয়॥
রূপ রাম ঠাকুরের এক পুত্র হয়।
নিমাই আচার্য্য বলি জানিবা নিশ্চয়॥
রাম জীবন আচার্য্যের দুই পুত্র হয়।
গোকুল গোপাল আচার্য্য খ্যাত যেই হয়॥
সূর্য্য দাস পণ্ডিতের দুই কন্যা হন।
এক পুত্র চাঁদ হালদার তার নাম॥
বসুধা জাহ্নবা বলি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সূর্য্য দাস ঠাকুরের বংশাবলী হয়॥
চান্দ হালদার ঠাকুরের দুই পুত্র হয়।
রাম কানাই আচার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
রাম আচার্য্যের পুত্র মধুসূদন নাম।
মধুসূদনের পুত্র হয়ে কৃষ্ণ নাম॥
কানাই আচার্য্য পুত্র রাম চন্দ্র হয়।
তার ঘরে চারি পুত্র জন্মিল নিশ্চয়॥
রাম কৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রামেশ্বর হয়।
মধুসূদন আচার্য্যাদি জানিহ নিশ্চয়॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের দুই পুত্র।
তার নাম ব্যক্ত করি আর সব সূত্র ॥
বড়ু বলরাম আর রঘুনাথ দাস।
বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ ॥
বলরাম ঠাকুরের সন্তান না হইল।
রঘুনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র হৈল।
মহেশ পণ্ডিত আর ঠাকুর গোবিন্দ।
অন্নপূর্ণা দেবী হইল বাড়িল আনন্দ ॥
এই বংশাবলী নাম করিল লিখন।
তৃতীয় চন্দ্রিকা কথা করিল বর্ণন ॥
সুবল রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে করি আশ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু নটবর দাস।

অপিচ উক্ত শ্রীপত্রিকায় লিখিত আছে ;—( শ্রীপাট অম্বিকা ভ্রমণ কারির কথা )—পূজ্যপাদ শ্রীল আনন্দ লাল গোস্বামী প্রভু মহোদয় উক্ত "সুবল মঙ্গল" গ্রন্থখানি উক্ত লেখককে দর্শন করান। লেখক মহোদয় লিখিয়াছেন,—( ১৩ পৃঃ) "সম্প্রতি এই পাটে যে গোস্বামিগণ আছেন তাঁহারা পরম ভক্ত, শ্রীহৃদয় চৈতন্যের বংশধর। গৌরীদাস পণ্ডিতের পৌত্রীকে শ্রীহৃদয় চৈতন্যের পুত্র বিবাহ করেন। বর্ত্তমান গোস্বামিগণ তাঁহাদেরই সন্তান। ইত্যাদি—

শ্রীশ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত বিবরণে আমার যে সব ভুল ভ্রান্তি হইয়াছে, তাহা সংশোধন মানসে উক্ত শ্রীপাটের পূজ্যপাদ গোস্বামী শ্রীযুক্ত নন্দলাল প্রভুপাদ দাদা, এ অধমকে আহ্বান করিয়াছেন। আমি তাঁহার চরণ দর্শন করতঃ নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবার ও দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা উল্লেখ করিবার বাসনা করিয়াছি।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

১। বাংলায় শ্রীহরি সভা স্থাপনের ইতিহাস কি? এইরূপ সভা কি পূর্ব্বে ছিল? না শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পরে হইয়াছে? কাহার দ্বারা কতদিন পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ভক্তিতে প্রকাশিত হইলেই জানিতে পারিব।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

২। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ সেবিত হইতেছেন, কৃপা করিয়া ভক্তিতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীসত্যাকিঙ্কর শর্ম্মা B, A.।

৩। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবিত শ্রীশ্রীশালগ্রামশীলা বর্ত্তমানে কোথায় আছেন? শ্রীহরি দাস নন্দী।

৪। বাংলা ও ইংরাজী ভাষা ভিন্ন আর যে যে ভাষাতে—মহা প্রভুর জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জানিতে বাসনা করি।

৫। প্রাচীন শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়া পত্রিকা (মাসিক) ও আনন্দ বাজার ও শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়া পত্রিকা (সাপ্তাহিক) কাহার নিকট আছে! জানাইলে উপকৃত হইব।

শ্রীনটবর দত্ত।

৬। গুরুর যদি সাধারণ বাহ্য চরিত্র খারাপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বাহ্য ভক্তি বা সম্মানাদি দেওয়া যায় কিনা?

৭। নিচজাতির আনিত বাতাসা দ্বারা হরিরলুট দেওয়া যাইতে পারে কিনা?

ডাঃ—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র জানা।

## প্রাপ্তগ্রন্থ সমালোচনা

শ্রীশ্রীশ্যামলীলামৃত। শ্রীমদ্দাশগদাধরবংশীয় শ্রীল দাশ-গোবিন্দ ভক্তিসরোজ মহোদয় দ্বারা পদ্যে এই গ্রন্থ বিরচিত। ৩৯০ পৃঃ —মূল্য ১॥০, প্রাপ্তিস্থান "দাশ গদাধর আশ্রম," ব্রজরাজপুর, ভেড়-য়াশোল পোঃ, জেলা বাঁকুড়া।

লেখক মহাশয় শ্রীল দাশগদাধর প্রভু এবং তদ্‌বংশীয় ভাগবতগণের সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবরণ ও কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, তাহা এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত করিয়াছেন। ২৯০ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত 'নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি' সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং তৎপরে 'মনিগোস্বামীর কথা' নামে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপি যে উপদেশ মালা লিখিত হইয়াছে তাহা বড়ই মূল্যবান্। আমরা জানিতাম এঁড়িয়াদহের দাশ গদাধর প্রভুর বংশ নাই, কিন্তু এই শ্রীগ্রন্থ পাঠে আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। ভক্ত চরিত স্বভাবতঃই বড় মধুর, তাহার উপর আবার আকুমার ব্রহ্মচারী গ্রন্থকার নিজ স্বভাবসিদ্ধ মধুর ভাষায় পর পর ঘটনা সকল অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে তত্ত্ব ও তথ্য দুই যথেষ্ট আছে। গৌড়ীয় ভক্তগণের এ গ্রন্থখানি পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

## বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

পানিহাটী "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির" হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয় লিখিয়াছেন—"পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় সম্প্রতি আমাদের 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে' পুরাতন বহু কাগজ পত্র প্রদান করতঃ আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রাচীন

ভক্তগণের লিখিত বহু পত্র, তাঁহার নিজের লিখিত প্রবন্ধ, তাঁহার জীবনী, পুরাতন বৈষ্ণব পত্রিকাদি এবং বহু তথ্য তালিকা প্রভৃতি আছে। প্রকাশযোগ্যগুলি আমরা 'ভক্তিতে' ক্রমশঃ প্রকাশ করিব, এবং আগামী কার্ত্তিক মাসের পানিহাটীর বৈষ্ণব প্রদর্শনীতে ঐ সকল দ্রব্য সুসজ্জিত করা হইবে। প্রভুপাদ শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের নিয়ামক পদ গ্রহণে স্বকৃত হওয়ায় আমরা বিশেষ ভাবে গৌরবান্বিত হইয়াছি।"

**প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা**—নিম্নলিখিত অমূল্য দ্রব্যগুলি পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে বিজয় করিয়াছেন ;—

(১) শ্রীল বীরভদ্র প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর।

(২) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীহস্তেরলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পৃষ্ঠা।

(৩) ঠিক ঐ সময়ের লিখিতই ঐ শ্রীচৈতন্যভাগবতের পৃষ্ঠা।

(৪) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন তাহার পৃষ্ঠা।

(৫) শ্রীল ভগবান্ দাস বাবাজী মহারাজের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ প্রভৃতি।

আগামী কার্ত্তিক মাসের প্রদর্শনীতে ঐরূপ আরও নানা অমূল্য দ্রব্য প্রদর্শিত হইবে। যাঁহার নিকট যাহা আছে সত্বর প্রেরণ করুন।

ভক্তবর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয় বিনীত ভাবে জানাইয়াছেন— "আমরা ভক্ত এবং শ্রীভগবানের স্মৃতি বলিয়া যেখানে যে কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি তাহাই মস্তকে বহন করতঃ সযত্নে শ্রীমন্দিরে রক্ষা করিতেছি। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহক মাত্র, এজন্য আসল কি নকল চিনিবার আমাদের অবসর নাই আর সে শক্তিও নাই। যাঁহাদের সে শক্তি আছে তাঁহারা বাছাই করিবেন। সে ভার তাঁহাদের উপর প্রদান করতঃ আমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আমাদের বিশেষ ভয়, নকল বাছিতে, পাছে আসলকেও বর্জ্জন করিয়া বসি!

**ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা**—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কাহার না পরিচিত? যদিও আজকাল ২।১ জন নামজাদা (?) লেখক তাঁহার সম্বন্ধে যথেষ্ট অবিচার করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কবিবরের লেখার ভঙ্গি বড়ই চমৎকার বলিয়া মনে হয়। আমরা 'হিতবাদী'র উদ্ধৃতাংশ হইতে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। কবিবর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"আমি আর কিছুই জানিতে ইচ্ছা করি না, যেন তোমাকে জানিতে পারি। আমি আর কোন অভিমানের প্রত্যাশা করি না, যেন তোমার অভিমানে অভিমানী হই। আমি আর কাহারও ভরসা করি না, কেবল তোমারই ভরসা করি। আমি আর কোন সঙ্গের প্রার্থনা করি না, কেবল তোমার সঙ্গের সঙ্গী হইতে প্রার্থনা করি। হে ভক্তবৎসল ভগবান্! যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্ম ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তোমার ভজনা করে, অন্য সকল উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমারই উপাসনা করে, সকল আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ তোমারই শরণাগত হয়, তুমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিমলানন্দ প্রদান কর, তাহার সকল সন্তাপ হরণ কর, তাহাকে মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্য সুখে সুখী কর। * * * তোমার সাধনা করিয়া যদি সর্ব্বনাশ হয় তাহাও মহা মঙ্গলের আধার বলিয়া স্বীকার করিব, কিন্তু তোমার ভজনা ভাজন না হইয়া যদি ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হই তাহাকেও সৌভাগ্য না বলিয়া দুর্ভাগ্য রূপেই গণ্য করিব; কারণ তুমিই সর্ব্বস্বধন, নিধনের ধন, সাধনের ধন, পরম ধন। যে মনুষ্য একান্তচিত্তে এই পরম ধনের প্রার্থনা করে সে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনকে তৃণ অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। যে ব্যক্তি ভক্তি ভরে তোমার নামামৃত পান করে তাহার কি আর সামান্য সুধার ক্ষুধা থাকে?"

পাঠকগণ আস্বাদন করুন, কি সুন্দর ভাষা ও সরল প্রার্থনা। স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে, যাহারা নিজ স্বার্থ বজায়ের সঙ্গে নিজের জেদ বজায় রাখিতে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া এই সকল প্রাচীন মনীষিগণের উপর কটাক্ষ করেন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না।

**দীর্ঘজীবী বৈষ্ণব।** "রংপুর দর্পনে" প্রকাশ;—উক্ত জেলার 'বুড়ির হাট আকড়ায়' শ্রীযুক্ত জলধর গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব আছেন, উহাঁর বয়ঃক্রম ১২৩ বৎসর হইয়াছে। ইনি এখনও গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া নাম গান করতঃ ভিক্ষা করিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট ঐ ভক্তবর "হরেকৃষ্ণ" বাবাজী বলিয়া পরিচিত।"

---

**গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী**—বিগত ৫ই শ্রাবণ ৩১ চালতা বাগান সেকেণ্ড লেনে শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার শ্রীল রামানন্দ বসু বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসু M, A, B, L ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি ও শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজের বিশেষ ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত পুলীন চন্দ্র দে মহাশয় সম্পাদক পদে বরিত হইয়াছেন। এই ভক্তযুগলের পরিচর্য্যায় এবার শ্রীসম্মিলনীর আমরা উন্নতির বিশেষ আশা করি। শ্রীসম্মিলনীর মুখপত্র শ্রীগৌরাঙ্গ সেবকের পুনরাবির্ভাবও বাঞ্ছনীয়।

---

**সদনুষ্ঠান।**—বিগত ২৪শে আষাঢ় সোমবার রথযাত্রার দিন হাওড়া জেলার অন্তর্গত মৌড়ী গ্রাম নিবাসী কুণ্ডুবংশাবতংস শ্রীযুক্ত বাবু কমল কৃষ্ণ কুণ্ডুচৌধুরী মহাশয় তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আহূত হইয়া

সটীকানুবাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, সৌবর্ণাঙ্গুরীয়ক, পিত্তলের হাঁড়ী প্রভৃতি সহ যথাযোগ্য বিদায় গ্রহণ করতঃ প্রীত হইয়া আসিয়াছেন। অনেক লোকের রসনা তৃপ্ত হইয়াছে। বহু গরীব দুঃখী বিদায় পাইয়াছে। শ্রীরাধা গোবিন্দের মন্দির, সিংহাসন, শয়নাসন, নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার এবং পূজার জিনিষপত্র দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। আজ কাল এতাদৃশ দেব-দ্বিজ ভক্তি-সম্পন্ন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠাতা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইতিপূর্ব্বে কমল বাবু প্রায় চারিলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটী হাঁসপাতাল করিয়া দিয়াছেন। তখন হইতে প্রত্যহ বহু রোগী বিনা ব্যয়ে সুচিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। শুনিতেছি শীঘ্রই আবার সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও অন্নছত্র করিয়াদিবেন। তাহা হইলেই অনেক ছাত্র সেখানে থাকিয়া বিনা ব্যয়ে সংস্কৃত পড়িতে পারিবে। আশা করি কমল বাবুর চেষ্টায় আবার ওস্থান আন্দুলের ন্যায় দক্ষিণ নবদ্বীপ নামের যোগ্যহইবে। কমল বাবুর সুকীর্ত্তি অক্ষয় ও দিগন্ত ব্যাপিনী হউক আমরা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট কমল বাবুর সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

---

ভক্তির পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ, শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ যে কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইবে তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিলে আমরা আনন্দের সহিত উহা মুদ্রিত করিব।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়াত
"ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥"

২৮শ বর্ষ | ভক্তি | আশ্বিন ও কার্ত্তিক
২য় ৩য় সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। | ১৩৩৬

# প্রাণের কথা

[ ২ ]

সত্যাই কি নাহি মোর নাহি রে কেহই ?
সত্যাই কি এ হৃদয়ে আর কিছু নাই ?
নাহি যদি,—আজও তবে এ ভাবে কে অই,
হৃদয়ে বাজায় বাঁশী শুনিতে যে পাই !
এত জ্বালা-যন্ত্রণার ভিতরেও তবে,—
কেন শুনি, কেন শুনি ওরে সেই বাঁশী ?
কেন রে বাজিয়া ওঠে এ মধুর রবে ?
পাগল করিতে মোরে, করিতে উদাসী !
আমি যে পাগল হই শুনি সেই ধ্বনি,
উদাস পরাণ মোর কোথা ছুটে যায় ;
আত্মভোলা হ'য়ে ওরে আমি যে তখনি,
ভরি' লই চিত্ত মোর নূতন আশায়।
দাব-দগ্ধ বনভূমি এ মম হৃদয় ;—
আবার যে ফল-ফুলে সুশোভিত হয় !

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের সহিত কথোপকথন।

[ ২ ]

বাবাজী। ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ"—সকলের রুচি একরূপ নহে, তাই বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন ধাম, বিভিন্ন রূপ হইয়াছে। মোটকথা লক্ষ্য স্থির করিয়া ডাকিতে পারিলেই লক্ষিত অভিষ্টদেব সন্নিকটবর্ত্তী হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রঃ। লক্ষ্য স্থির করিবার উপায় কি?

বাবাজী। একমাত্র প্রেমানুরাগ।

প্রঃ। প্রেম জন্মিবার উপায় কি?

বাবাজী। প্রেম নিত্য সিদ্ধ জিনিষ, সাধনার দ্বারা কখনও সাধ্য নহে। তবে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে প্রকাশ পায় মাত্র।

( ৩ )

বাবাজী। বাবা! যত কিছু সাধন ভজন, নিয়ম নিষ্ঠা কর না কেন, সর্ব্বাগ্রে গুরু-কৃপা চাই। গুরু-কৃপা না হইলে কাহারও কৃপা হইতে পারে না। যদি সাধন পথে অগ্রসর হইতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-দেবের সন্তোষ বিধান কর, অক্ষয় গুরু কৃপা সঞ্চয় কর, শ্রীগুরুদেবকে অগ্রগামী করিয়া তদানুগত্য অবলম্বন কর, অতি কষ্টসাধ্য কার্য্যও সুগম হইবে, অলভ্য বস্তুও অনায়াসে লভ্য হইবে।

প্রঃ। বাবা! শ্রীগুরুদেব যদি প্রকট না থাকেন তবে কি করা যাইবে?

বাবাজী। বাবারে! শ্রীগুরুদেব নিকটে না থাকিলে জীবের এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। গুরু নিত্য, চিন্ময় ও সর্ব্বব্যাপী। তোমার

প্রয়োজন হইলেই তিনি উপস্থিত হইবেন। যখন অভাব বোধ করিবে, ব্যাকুল প্রাণে ডাকিলেই তাঁহার দর্শন পাইবে।

( ৪ )

প্র:। বাবা! যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে অক্ষম, তাহার কি কোন উপায় নাই?

বাবাজী। কেন থাকিবে না বাবা! যে ব্যক্তি লেখা পড়া জানে না বা বিষয়ে বোধ নাই, তাহার কি জমিদারী চলে না? যদি কোন কার্য্য করিতে অক্ষম হও, বা ভালমন্দ বিচার করিতে না পার, তবে অপরকে ক্ষমতাপত্র দাও, সুচারুরূপেই কার্য্য চলিবে।

প্র:। সে কিরূপ বাবা?

বাবাজী! শোন তবে বলি;—একদিনও যদি কায়মনো বাক্যে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ কর, সরল প্রাণে গুরুদেবের চরণে প্রার্থনা কর,—"প্রভো! আমি আপনার শ্রীচরণে বিক্রিত হইলাম; আজ হইতে আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।" বাবা! যেদিন উহা করিবে, সেদিন হইতেই তোমার সম্বন্ধে, তোমার আর কিছু ভাবনা থাকিবে না।

যদি শ্রীগুরুদেবের আদেশানুযায়ী তাঁহার হইয়া কিছু করিতে পার কর, কিন্তু সাবধান! ফলাফল তাঁহার। দিবানিশি মনে ধারণা করিয়া রাখ,—তোমার কর্ম্ম করিবারই অধিকার, ফলাফলের আকাঙ্খা তুমি করিও না।

শ্রীগীতাগ্রন্থে আছে—তাহাতে পাঠ করিয়াছ;—"তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর—যাহা তপস্যা কর, সকলের ফলাফ তাহাকে সমর্পণ কর।" ইহারই নাম ক্ষমতা পত্র দান (আম্‌মোক্তার নামা)। তুমি তোমার জন্ত ব্যস্ত হইও না, তিনি তোমার জন্ত চেষ্টা করিবেন। তুমি কেবল তাঁহাকে স্মরণ রাখ।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিদাস নন্দী।

# কেন তবে ?

কেন মোরে তুমি সৃজিলে হে বিধি !
সংসারে কেন পাঠালে ?
দূর এ প্রবাসে একা ফেলে রেখে,
কেন বা এমন কাঁদালে ?
বঞ্চিত কেন করিলে দয়াল,
ও রাঙ্গা চরণ হইতে ?
মোহের গর্ত্তে কেন ফেলে দিলে,
তোমা ভুলে দুঃখ সইতে ?
মনে যদি ছিল এইটে তোমার,
দিবে না আমারে ভক্তি,—
আমার এ প্রাণে রবে না যদি গো,
তোমাতে সে অনুরক্তি ;—
তবে বল কেন আমার মনটা,
আমার প্রাণটা করিলে ?
করিলে যদি গো,—তবে কেন প্রাণে
কলুষ-গরল ভরিলে ?
জাননা কি প্রভু, তুমি ছাড়া মোর
নাহিক কোনই শকতি ?
জেনে শুনে ভবে পাঠাইলে কেন,
প্রাণে নাহি দিয়ে ভকতি ?
তুমি-ই পাঠালে ওগো ইচ্ছাময়,
তোমারি সৃজিত এ ভবে ;
ভকতি-বিহীন করিয়া এমন,
পাঠাইলে বল কেন ভবে ?

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ।

# ভক্ত-মহিমা ও ভগবদ্ভজন।

অহং ভক্ত পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্রস্থ হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

কর্ম্ম জ্ঞান যোগ প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা কিম্বা অষ্টসিদ্ধি ও চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়াও কেহ শ্রীভগবানকে ধরিতে পারে না। পারে শুধু তাহার বিভুতি লাভ করিতে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর যাঁহার মায়াশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্য করিতেছেন, তাহার মায়ার পার জীব পাইবে কি করিয়া? শ্রীভগবান নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাং তরন্তিতে॥

শ্রীভগবানের দৈবীশক্তি সম্পন্ন গুণময়ী দুস্তরা, অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়া হইতে সে-ই ত্রাণ পাইতে পারে যে একান্ত ভাবে তাহার আশ্রয় নিতে পারে। যিনি একান্ত প্রাণে শ্রীভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ভগবদ্ভক্ত বা দাস। শ্রীভগবান এ হেন ভক্তের সর্ব্বদাই বশ। শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত ভাবে শরণ গ্রহণ করিয়া, ভক্ত পদবী লাভের একমাত্র উপায় শ্রীভক্তি ঠাকুরাণীর কৃপা। ভক্তি দেবীর কৃপা ব্যতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ অধরচাঁদকে ধরা যায় না। ভক্তিবলে তাঁহাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার সেবানন্দে, প্রেমেতে ভাসেন ভক্ত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুতেই ভগবান বশ বা প্রীত নহেন; শুধু তিনি ভক্তের কাঙ্গাল ও ভক্তির বশ। ভক্তের হৃদয়ে নিরন্তর বাস করেন তিনি। ভক্ত সর্ব্বদা তাঁহার কৃপা অনুভব করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণে ভগবচ্চরণ ধৌত

করিয়া দেন, বদন ভরিয়া তাহার নাম গান করেন। ভক্তিতে ভগবান নিজে ধরা পড়িয়া বিকাইয়া যান বলিয়া, আপন অন্তরঙ্গ হ্লাদিনী শক্তি ভক্তিদেবীকে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিবারই চেষ্টা করেন। যথা— শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোক—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তি সুদুর্লভা॥

* * * *

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা পরেন বলিয়া চিরদিনই ভক্তিকে লুকাইয়া রাখিতেছেন। তিনি ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি ফল দানে সকামী ভক্তগণকে ভুলাইয়া রাখেন, আর নিষ্কামী ঐকান্তিক ভক্তগণের নিকট ঠেকিয়া ভক্তির বশ হয়েন। শ্রীভক্তি দেবীর কৃপাশ্রিত ভক্তের ক্রীড়ার পুতুল হইয়া পড়েন শ্রীশ্যামসুন্দর। ভক্ত ভক্তিবলে শ্রীভগবানকে বিক্রয় করিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত—দ্বারকা নিবাসে সত্যভামার প্রতীজ্ঞায় নারদের নিকট বিক্রিত হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। দ্রোপদীর ভক্তি বলে তাহার বস্ত্ররূপে বেষ্টিত হইয়া লজ্জা রক্ষা করিলেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ হইতে রক্ষা করিলেন কাম্য বনে। উত্তরার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্রদ্বারা গর্ভস্থ শিশু ভক্ত পারিক্ষিতকে রক্ষা করিলেন অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে। ভক্ত ভীষ্মের প্রতীজ্ঞা রক্ষার জন্য, আপন প্রতীজ্ঞা নষ্ট করিয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে। বিদুরের ক্ষুদ মাগিয়া খাইলেন হস্তিনায়। ভগবান সর্ব্বদা ভক্তের রক্ষক, তাহার সাক্ষী ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ। অগ্নিতে, জলে, বিষে, অস্ত্রে, হস্তীপদতলে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইল না; এবং তাহার বাক্য রক্ষার জন্য স্ফটিকস্তম্ভে শ্রীভগবানের অদ্ভুত আবির্ভাব। ভক্ত বলিরাজার

ভক্তি-ডোরে তিনি চিরতরে বাঁধা পড়িলেন ; পাদপদ্ম মস্তকে দিয়া দ্বারী হইয়া রহিলেন পাতালে। ভক্ত গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি করিলেন তাঁহার ভক্তি বলে। চণ্ডাল কন্যা শবরীর শুষ্ক, পর্য্যুষিত ও উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষন করিলেন পরম প্রীতি ভরে শ্রীরামচন্দ্র। ভক্ত সুগ্রীবের জন্য গোপনে বালীকে বধ করিয়া জগতে এই শিক্ষা দিলেন যে, ভক্তের জন্য আমি সবই করিতে পারি। ভক্তের মুখে শ্রীভগবান আহার করেন। যথা—

ব্রহ্মপুরাণে—

নৈবেদ্যং পুরতোন্যস্থ দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥

শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, ভক্ত আমার মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু ও প্রাণ। আমার ভক্ত দাসের সর্ব্বভাবের রক্ষক আমি। মহারাজ ভক্ত অম্বরীষকে দুর্ব্বাসার মহাশাপ হইতে রক্ষা করিয়া ভক্তদ্বেষীয় শিক্ষা দিলেন জগতে। ভক্ত গজরাজকে উদ্ধার করিলেন মহা বিপদ সাগর হইতে। পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করিলেন পদস্পর্শে।

পতিত পাবন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্ত হরিদাসকে রক্ষা করিলেন কালযবনের মহা প্রহার হইতে। শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যতার সীমা নাই। শ্রীমন্মহা প্রভু ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিয়াছেন—

যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তয়ে নাহি যায় কার দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তারে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥

মোর সুদর্শন চক্রে রাখে মোর দাস।
মহা প্রলয়েতে যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করি মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহরে পায় দঢ়॥ (শ্রীচৈঃ ভাঃ)

শ্রীকৃষ্ণের সেবকবৃন্দ কখনও সংসার দুঃখাদি প্রাপ্ত হন না। তাহারা নিরন্তর সেবানন্দরসে আত্মহারা হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখেরবাণী—

শুন শুন মাতা, কৃষ্ণ ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কাল চক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥

সেবক বৎসল শ্রীনন্দনন্দন হরি, নিরন্তর ভক্তির অধীন হইয়া ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করেন। আর ভক্ত প্রেমে গদগদ হইয়া বলেন—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভগবান ভিন্ন আর কিছু জানেন না ভক্ত। সর্ব্বত্রই ইষ্ট দেবের মূর্ত্তি দর্শন করেন আর বিভোর হইয়া তাহার পূজা করেন। যথা :—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তারমূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রই হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥ ( শ্রীচৈঃ চঃ মঃ )

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

আদরং পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভি বন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যাধিকঃ সর্ব্ব ভূতেষু সন্মতিঃ॥

* * * *

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দঢ়॥ ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

অতএব ভক্তের অপেক্ষা প্রিয়তম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আর কেহ নাই। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ দাস ভক্তগণই সাধু, বৈষ্ণব, মহান্ত ও শ্রীগুরু গোঁসাই নামে ভুবন পবিত্র করেন। মহান্ত স্বভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া পামর জীবকুলের ত্রাণ করেন। শ্রীগুরু স্বরূপে মন্ত্র দানে, মায়া মুগ্ধ জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন পূর্ব্বক পরমার্থ বস্তু দেখাইয়া দেন এবং বৈষ্ণব স্বরূপে সদাচার ও ভজন প্রণালী শিক্ষা প্রদানে, অজ্ঞ জীবকুলের ভক্তি পথের বন্ধু হন। বৈষ্ণব-হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দ বাস করেন। যথা :—

ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥ ( ঠাকুর নরোত্তম )

শ্রীগোবিন্দদাস বৈষ্ণবগণ জাতি বর্ণ কিম্বা বিধি নিষেধাদির অতীত। কারণ, ভক্ত হৃদয় কোন গুণের মধ্যে নহে। তাঁহারা সর্ব্বভাবে শুদ্ধ সত্ত্ব ও নির্ম্মল। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ, আর বিষ্ণুভক্তি বিহীন ব্রাহ্মণও শ্বপচাধম। যথা পদ্ম পুরাণে :—

চণ্ডালোঽপি মুনি শ্রেষ্ঠঃ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

শ্রীভগবানের নিকট চতুর্ব্বেদ পরায়ণ দ্বিজও প্রিয় নহে, ভক্তিমান চণ্ডালও প্রিয় এবং এহেন প্রিয় ভক্তের পূজাদিই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথাঃ পাদ্মে :—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতামতা।
সর্ব্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

শ্রীগোবিন্দ পরায়ণ ভক্তগণই পরমভাগবত ও ভক্তিরস পাত্র। এই ভাগবত সেবার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেম জাত হয়। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত :—

এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেমে হন বশ॥

বৎসের পশ্চাতে ধেনু যেমন আকুল ব্যাকুল ভাবে ধাবিত হয়, ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে ভগবানও তদ্রূপ গমন করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বর্গ, অষ্ট-সিদ্ধি, ও চতুর্ব্বিধামুক্তি ভক্তের স্তুতি গান করিতে করিতে পশ্চাতে চেরী স্বরূপ ভ্রমণ করে। যথা আদি পুরাণে :—

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনু গচ্ছন্তি মুক্তয় স্তুতিভি সহ॥

শ্রীভগবান নারদকে বলিয়াছেন, আমি বৈকুণ্ঠে কিম্বা যোগি হৃদয়ে বাস করি না; যে স্থানে আমার ভক্ত ভজন কীর্ত্তন করেন সেই স্থানে আমি আনন্দে বিরাজ করি। যথাঃ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ॥

অনন্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সারগ্রাহী সাধু মহাজনগণের আচার প্রচার ও স্বয়ং শ্রীভগবানের আচরণ ও উপদেশ বাণী দ্বারা একমাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, ভক্ত সেবক ভিন্ন ভগবানের অন্তরঙ্গ আর কেহ নাই। এবং ভক্ত সেবা ভিন্ন ভক্তি লাভ কখনও হয় না। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

ভক্ত পদ ধূলি আর ভক্ত পদ জল।
ভক্ত ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্র ফুকারিয়া কয়॥

কলিযুগ পাবনাবতার, অখিল আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীগৌরচন্দ্র নীলাচলে রথাগ্রে ভক্তগণ সহ প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন আর বলিতেছেন :—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্র,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নোবনস্থোযতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে,
গোপীভর্ত্তুঃ পদ কমলযোর্দাসদাসানুদাস॥

সর্ব্বাবতার সার রসরাজ নাগর মদন মোহন শ্রীগৌর গোবিন্দ আপনি আচরিয়া জীবকে সর্ব্বতত্ত্ব সার শিক্ষা দানচ্ছলে বলিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণ নহি, নরপতি নহি, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কোন বর্ণই নহি, আমি গৃহী বা বনবাসী যতি নহি ; আমি অখিল রসামৃত সার শ্রীগোপীবল্লভ রাধারমণের দাসানুদাসের দাস। শ্রীকৃষ্ণের দাস উপাধি ভিন্ন শ্রেষ্ঠ ও মহৎ পদবী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই। কৃষ্ণ দাস উপাধি ভিন্ন, অন্য যাবতীয় উপাধিই মায়া মুগ্ধ জীবের মহাব্যাধি। অজ, ভব, নারদ, ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ দাস পদ পাইবার জন্য চিরদিন পিপাসিত। সাক্ষাৎ রোহিনী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ, যদ্যপিও পূর্ব্বাপর লীলায় কৃষ্ণের বড় ভাই, তথাপি সর্ব্বদা দাস অভিমান। এই দাস্যরস সর্ব্বভাবের ভক্তগণই পোষণ করেন এবং ইহা হইতে অধিক আনন্দ আর নাই। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান।
আপনাকে করে তার দাস অভিমান॥

সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু।
কোটী ব্রহ্ম সুখ তার নহে এক বিন্দু॥
মুক্তিদাস চৈতন্যের আর নিত্যানন্দ।
সদা ভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তিহোঁ দাস্য সুখ মাগে করিয়া বিনতী॥
দাস্য ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি ভব নারদ আর সুখ সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধুত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে করিল উন্মত্ত॥
কৃষ্ণ প্রেমের এই অপূর্ব্ব স্বভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব॥

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

## "ভক্তি" পত্রিকার কৃতিত্ব *

( অষ্টাবিংশ বর্ষে উপনীত হওয়ায় – শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন )

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে অনুমান প্রায় ৫০।৬০ খানি বৈষ্ণব পত্রিকার

আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু ২।১ খানি ব্যতীত আর সব গুলিই জলবিম্বের ন্যায় কাল সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে যে সকল বৈষ্ণব পত্রিকা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাদের বয়ঃক্রম ৫।৭ বৎসরের বেশী হইবে না। এমত অবস্থায় ( এই ভিঃ পিঃ ফেরৎ দেশে ) আজ ২৮ বৎসর ধরিয়া "ভক্তি"যে নিয়মিত প্রকাশ হইয়া আসিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয় ও পরিচালকবর্গের কৃতিত্বের কথা মনোমধ্যে বিশেষ ভাবেই উদয় করে। "ভক্তির"একটি বিশেষত্ব—এই ২৮বৎসর মধ্যে"ভক্তিতে" কোন দিনই কোন ব্যক্তি বা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ প্রকার করিতে দেখি নাই। শত সহস্র সাম্প্রদায়িক গোলমালের মধ্যে পড়িয়াও ভক্তি পত্রিকা নীরবে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এ কৃতিত্ব বড় কম গৌরবের নয়।

তাই আজ আমরা ভক্তির এই কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ সহকারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রাচীন পত্রিকা "ভক্তিকে" অভিনন্দিত করিতেছি, এবং ইহাঁর প্রধান পরিচালক ও সত্বাধিকারী আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহোদয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিতেছি। মনে হইতেছে ভক্তি পত্রিকার দিন দিন যেরূপ, দেশে বিদেশে গতিবিধি বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে অচিরেই এই শ্রীপত্রিকা খানি প্রত্যেক ভক্তের গৃহে বিরাজ করিবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীসত্যকিঙ্কর শর্ম্মা (B,A,D,E,D,)

* আমরা নিজের কথা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে কখনই ইচ্ছুক নয়, বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত ভক্তি পত্রিকায় নিয়মিত লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধেই এবার নিয়মভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম। ( ভক্তিকার্য্যাধ্যক্ষ )

# বৈষ্ণব-তীর্থ-গ্লানি।

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে ব্রাহ্মণগণের বিনা ভেটে প্রবেশাধিকার আছে। শূদ্রগণকে ভেট দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। অন্যান্য শ্রীমন্দিরেও এই ব্যবস্থা আছে। শূদ্র যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভজন পরায়ণ হন তাহাকেও শূদ্রের ন্যায় ভেট দিতে হয়। সেবাইতগণ যে কৈফিয়ৎ দেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য অর্থের অনাটন হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রার্থী সকলেই তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে বাধ্য; অথচ কেবল মাত্র শূদ্রগণের নিকট জিজিয়া করের ন্যায় ভেট আদায় করা হয় ও ব্রাহ্মণগণকে জিজিয়া রূপ ভেট দিতে হয় না। মুসলমান রাজত্ব কালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য থাকায় মুসলমান রাজত্ব ধ্বংসের মুখে গিয়াছিল। মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলে। মুসলমান রাজা; সুতরাং জেতা মুসলমান বিজেতা হিন্দু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই যুক্তিতে হিন্দুর নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করিত।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ধর্ম্মগ্লানি, এই ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। তিনি ভক্তকে ব্রাহ্মণের উপর স্থান দিয়াছেন। শ্রীবাস আঙ্গিনায় তিনি যখন অন্তরঙ্গ লইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতেন, তখন বাহিরের আন্ লোকের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। দরজা বন্ধ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নৃত্য-কীর্ত্তন করিতেন। এক ব্রহ্মচারী তপস্বী, পরম সাধু বিপ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিবার আশায় শ্রীবাসের শরণাগত হইয়া সঙ্গোপনে আঙ্গিনার মধ্যে ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে বাধা পড়িল; তিনি প্রেমা-

নন্দ পাইলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাহিরের কোন লোক এখানে আছে কিনা। তারপর যাহা ঘটিল শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩শ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত পয়ারেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে—

ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান নিষ্পাপ জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিএাছ দঢ়॥
শুনি ক্রোধাবেশে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ার বাহির নিএগ কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি?"
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়॥
চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে সত্য বলিলুঁ বচন॥
গজেন্দ্র বানর গোপ কি তপ করিল।
বোল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥

প্রভু বোলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবা এথাই॥"
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥
"এই মোর ভাগ্য বড় যে কিছু দেখিলুঁ।
অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ॥
অদ্ভূত দেখিলুঁ নৃত্য, অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ অনুরূপ পাইলু তর্জ্জন॥
সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥"
এই মত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীগৌর সুন্দর॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিল তার মস্তক উপর॥
প্রভু বোলে "তপ করি না করিহ ছল।
-বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' জানিহ কেবল॥"
'হরি' বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িল ততক্ষণ॥
শ্রদ্ধা করি যে জন শুনয়ে এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁরে মিলিবে অবশ্য॥"

ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে যে জন্মগত পার্থক্য আছে তাহা দূর করিবার উপায় একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজে আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগীতাতে যেরূপ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেওয়া হইয়াছে, শ্রীমন্মহাপ্রভুও ভক্তকে নিজ জন জ্ঞান করিয়া তাহাকে সকল অধিকার দিয়াছেন। তিনি

যবন হরিদাস ও শূদ্র রামানন্দকে ভক্ত জ্ঞান করিতেন বলিয়া হরিদাসের দ্বারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন ও রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শুনিলেন।

হিন্দুজাতি সংখ্যাতে অনেক বেশী, অথচ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর মুষ্টিমেয় লোক অপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিম্নস্থানে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ও বৈষম্য থাকায় শূদ্রগণ একেবারে স্বাধীন চিন্তা শূন্য সংস্কার হীন ও গোলাম হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণগণ অপরিমিত ও যথেচ্ছাচার ক্ষমতা ভোগ করিয়া নিজেদিগকেই ভূদেব জ্ঞান করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন না।

যে ভাবে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে অচিরে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু ধ্বংসের দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার ও প্রকৃত সংস্কার হয় না। সংস্কারকগণ উপরিল্লিখিত পয়ার গুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিপথের পথিক হইলে শ্রীগীতা ৪।৮ শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সারথী ও গুরু ( শ্রীগীতার ১০।১০, ১১ ) হইয়া অসম্ভব সম্ভব করিয়া দিবেন।

শ্রীবাস আঙ্গিনায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যে লীলা নিত্য করিতেছেন। ( আন্-লোক যেমন শ্রীবাস আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার পায় নাই, বর্ত্তমান সময়ে গৌর-ভক্ত ছাড়া অন্য কেহ সেই নিত্য লীলা দেখিতে পান না )। অথচ ভক্ত যদি শূদ্র হয় তাহা হইলে সে শ্রীমন্দিরে বিনা ভেটে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এবং ব্রাহ্মণ ( অভক্ত হইলেও ) শ্রীমন্দিরে বিনা ভেটে প্রবেশ করিতে পারিবেন। সেবাইতগণ কাহার সেবা করিতেছেন ও কি সেবা করিতেছেন? শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগত প্রাণ। তাঁহাকে ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখার ফলে সেবাইতগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াও ধর্ম্মের কুটিনাটি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধাভক্তির জ্যোতি দেখিতে পাইতেছেন না।

তাঁহারা গোস্বামী পাদগণের বংশধর বা শিষ্য প্রশিষ্য ইত্যাদি হইয়া নিজেদিগকে গোস্বামী আখ্যায় ভুষিত করিয়া প্রতিষ্ঠা, উপাধি, অর্থ, ক্ষমতা, যশ ইত্যাদি ভক্তি বিরোধী জিনিষ লইয়া মায়িক সংসারের বদ্ধ জীবের ন্যায় কাল কাটাইতেছেন। অথচ তাঁহারা ভবপারের কাণ্ডারী সাজিয়া জীব-উদ্ধারের জন্য ভক্তের মাথায় পদধূলি দিতেছেন ও ভক্তগণকে অনিবেদিত বস্তুর উচ্ছিষ্ট দিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত ব্যক্তি মাত্রেই ভক্ত। সাধন ভজন দ্বারা ভক্ত ক্রমে ঐকান্তিক ভক্ত হইতে পারেন। চিহ্ন দেখিয়া যখন জাতি নির্দ্দেশ হয়, তখন শ্রীতিলক কণ্ঠি দেখিয়া ভক্ত নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। যিনি শ্রীতিলক কণ্ঠি ব্যবহার করেন না, তাঁহাকে শ্রীতিলক কণ্ঠিধারী ব্যক্তির নিম্নে স্থান দেওয়া উচিত। শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে ভক্তের অধিকার থাকা উচিত, অভক্ত সে অধিকার কখনই পাইতে পারেন না; কারণ তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ অমান্য করিয়া তাঁহাকে অবতারী বলিয়া স্বীকার করেন না।

পৃথিবীর ইতিহাস দেখিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আভিজাত্যাভিমানী ব্যক্তিগণকে বাধ্য হইয়া উচ্চ আসন ছাড়িয়া নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। দর্পহারী মধুসূদন কাহারও দর্প রাখেন না। ভক্ত অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন। সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে; আরও সহ্য করিলে ভক্তিযোগ জগতের নিকট নিন্দনীয় হইবে। ভক্তিযোগ নিন্দনীয় হইলে ঘোর কলির তমসাচ্ছন্ন জীব রুদ্রদেবের সংহার লীলা হইতে অব্যাহতি পাইবে না। জগতের শান্তি-বিধান জন্য ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিয়া সকলের চিত্ত ভক্তির বিমল জ্যোতির দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দিতে হইলে ভক্তকে তদনুযায়ী সকল অধিকার দিতে হইবে।

অনেকে বলিয়া থাকেন "জোর করিয়া কাহাকেও ভক্তি করা যায় না।

ভক্তি মনের জিনিষ। মাথা যদি কাহারও নিকট ভক্তিতে অবনত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভক্তি করা যায় না বা উচিতও নহে।" ভক্তি সাধন ভজন সাপেক্ষ। সাধনভজন করিতে হইলে অগ্রে গুরুস্থানীয় ব্যক্তির শুভ ইচ্ছা ও আদেশ পালন করা উচিত। গুরুবর্গ কখনই স্নেহের পাত্রগণের অমঙ্গল কামনা করেন না। গুরুবর্গ অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্নেহের পাত্রগণের জন্য ভক্তি পথে ভজন করিবার যে সব বিধি নিষেধ দিবেন তাহা প্রথমাবস্থায় অবিচারে পালন করিতে হইবে। গুরুবর্গের আদেশ পালন করিতে করিতে যে পরিমাণে ভক্তি লাভ হইবে তদনুসারে শাসন ও দণ্ড শিথিল হইবে। শেষে ভক্ত পদবাচ্য হইলে গুরুবর্গ স্নেহের পাত্রকে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন সদ্য বিবাহিতা হিন্দু-রমণী তাঁহার পতিকে আদৌ পছন্দ করিলেন না; গুরুবর্গের শাসনে ও সামাজিক নিয়মে বিবাহিতা পত্নী বাধ্য হইয়া স্বামীর ঘর সংসার করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার সন্তানাদি হইল এবং বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে ভোগ-লালসার তীব্রতা কমিয়া আসিলে পত্নী পতিভক্তি লাভ করিল ও দম্পতি সুখ শান্তিতে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। গুরুবর্গের শাসন না থাকিলে নববিবাহিতা পত্নী কালে পতিকে প্রিয়তম জ্ঞান করিতে পারিতেন না এবং পাতিব্রতধর্ম্ম পালন হইত না। কোন শিক্ষার্থী বালক বিদ্যালয়ে যাইতে অনিচ্ছুক। গুরুবর্গের শাসনে তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। ক্রমে বিদ্যালাভে একটু যত্ন জন্মিলে সে স্বেচ্ছায় সানন্দে বিদ্যার্জ্জন করিবার জন্য যত্নশীল হয় ও বিদ্যা মাহাত্ম্যে সে ভক্তি পরায়ণ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য যেসকল সুব্যবস্থা রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা প্রত্যেক হিন্দুকে পালন করা উচিত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব হিন্দু ধর্ম্মের গ্লানি ও জাতিগত বৈষম্য দূর করিবার জন্য নিজে আচরিয়া যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই পালন করিতে পারেন। তিনি জগৎবাসীর জন্য ভক্তিপথ সুগম করিয়া গিয়াছেন। ভক্তি পথের পাথিক হইলে শেষে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই স্বয়ং ভগবান জ্ঞান হইবে। কোন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকগণ গৌরাঙ্গ সেবকের সংস্পর্শে আসিয়াও গৌরাঙ্গপদাশ্রয় করেন না গৌরাঙ্গে তাঁহাদের এই ত্রুটি দেখিয়াও সেবকগণ তাঁহাদিগকে ভক্তিপথের পথিক করিবার কোন চেষ্টা করেন না; বরং গৌরাঙ্গসেবকগণ তাঁহাদিগের এই ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহাদিগের সহিত পানভোজনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে আস্কারা দিয়া চিরতরে তাঁহাদিগের জন্য ভক্তিযোগের পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। এরূপ না করিয়া গৌরাঙ্গসেবকগণ তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, ভক্তিপথেরপথিক হইলে তাঁহাদের শূদ্রত্ব দূর হইবে এবং তাঁহারা ভক্তের সব অধিকার পাইবেন।

সেবকগণের হস্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দণ্ড ন্যস্ত আছে। কিন্তু তাঁহারা ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠতম স্থান না দেওয়ায় ও অভক্ত, গৌরাঙ্গদ্বেষী, মদ্যমাংস-ভোজী বিপ্রগণের সহিত বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় তাঁহারা নিজে-দিগকে নিস্তেজ, শক্তিহীন, ভীরু ও ভক্তিহীন জ্ঞান করেন। সবমাত্র সাধুসঙ্গে জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভের পথ সুলভ হয়। অথচ বংশানুক্রমে প্রতিবেশী শূদ্রগণ গৌরাঙ্গসেবকের সংস্পর্শে আসিয়াও কেন গৌরাঙ্গ-পদাশ্রয় করিয়া ভক্তপদবাচ্য হইতে পারেন না ইহাই বিবেচনার বিষয়।

কোন ভক্ত স্ত্রীলোকের মুখে শুনা গেল যে, খানাকুল কৃষ্ণনগরের শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর শ্রীমন্দিরে উক্ত স্ত্রীলোক মাহিষ্য জাতি বিধায় ৺সেবাকার্য্যের জল বাটনা দিবার অধিকার পায় না। তিনি জাতীয়

অভক্ত, সংস্কারহীন ও মৎস্যাহারী বিধবা স্ত্রীলোক উক্ত ৺সেবাকার্য্যে জল বাটনা দিবার অধিকার পান। এরূপ বিসদৃশ, অশাস্ত্রীয়, ও যুক্তিহীন ব্যবস্থা অচিরে দূর হউক। উক্ত স্ত্রীলোকটীর বাটীতে শ্রীবিগ্রহসেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে মধ্যে মধ্যে সাধু, বৈষ্ণব ও ভক্তের সমাগম হয় ও সেবা হয়। তিনি ঐ শ্রীপাটের গোস্বামীর পদাশ্রয় করিয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতেছেন, তিনি গোস্বামীগুরুর ৺জীউর সেবার "পালা"র সময় যাবতীয় দ্রব্য ও অর্থ সরবরাহ করেন এবং নিজে মাথায় করিয়া ৺ সেবার দ্রব্যাদি অনুরাগের সহিত বহন করিয়া দূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক ৺জীউর শ্রীমন্দিরে আনিয়া গুরু গোস্বামীর আদেশ মত তাঁহার অনু-পস্থিতিতে ঠাকুর সেবার "পালার" সব কার্য্য পরিদর্শন করেন। এ হেন ভক্ত স্ত্রীলোক মাহিষ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া নিজের দ্রব্য দ্বারা নিজের অভীষ্টদেবের দাসী হইয়া সাধারণ বেতনভোগী মাহিষ্যজাতির চাকরাণীর অধিকারও পাইলেন না। হিন্দুসমাজে মাহিষ্যজাতী জল আচরনীয় হইয়াছেন। অথচ উক্ত ভক্ত স্ত্রীলোকটী নিজের গুরুর শ্রীপাটে ৺ সেবা কার্য্যে দাসীবৃত্তি করিতে যাইয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন, আর তাহার গুরু গোস্বামীও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ, কোন প্রতিবাদ করেন না। অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক ও অন্যায় কার্য্য করার যে দোষ, তাহার প্রতিকার কল্পে কোন প্রতিকার পর্য্যন্ত না করায়ও সেই দোষ। উক্ত মাহিষ্য স্ত্রীলোকটী যখন দেখিলেন যে, গুরু-নির্দ্দিষ্টপথে ভজন করিয়াও তিনি অভক্ত, সংস্কার-হীন তিলি জাতীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা হীন, তখন তিনি কিরূপে ভক্তি ও ভক্ত-মাহাত্ম্য সূচক শাস্ত্রবাক্যে আস্থা রাখিয়া দৃঢ় ভক্তি লাভ করিতে পারেন?

জীবের স্বভাব, কেহ অধীনস্থ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে চাহে না। যাহার যেমন ক্ষমতা, তদনুযায়ী সে অন্যকে কায়দায় রাখিয়া চিরকাল

তাহার উপর প্রভুত্ব করিবে। বিধি কর্ত্তৃক জীব এই স্বভাব পাইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ বিধির বিধাতা। তিনি ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া জীবকে অধিকার অনুযায়ী সাধন ভজনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারত পরাধীন হওয়ায় ভারতবাসী হিন্দুর এরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, তিনি বর্ত্তমান অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়, অন্যায় ব্যবস্থাগুলিও দেশাচার, কুলধর্ম্ম ইত্যাদি জ্ঞানে তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। এবং হিন্দু ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি কিরূপ দ্রুতপদে উন্নতির পথে চলিতেছেন তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার ইচ্ছাও করেন না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রদর্শিত শ্রদ্ধা-ভক্তিপথ আশ্রয় ভিন্ন বর্ত্তমান ধর্ম্ম কলহ, জাতি কলহ ও রাজ্য কলহের অবসান হইবে না। ভক্ত কিছু যাচ্ঞা করেন না, ভক্ত ভয় কাহাকে বলে জানেন না, ভক্ত কেবল ভালবাসিতে জানেন। এইরূপ ভক্তপদবাচ্য হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? হরিবোল।

দীন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী।

# শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের সংস্কারার্থে আবেদন।

সে আজ প্রায় ৪১৫ বৎসরের কথা, যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু তীর্থ-পর্য্যটন ছলে শ্রীমথুরা মণ্ডলে আরিট গ্রামে (অরিষ্ট নামক অসুরের নিধন স্থলে) আসিয়া দুই ধান্য ক্ষেত্রকে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণকুণ্ড বলিয়া প্রকাশ করিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের

পর আন্দাজ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ ২৩৮ দুইশত আটত্রিশ সিক্কা ( টাকা ) মূল্যে ছয় কিত্তা জমি খরিদ করিয়া শ্রীবদরী নারায়ণের আদিষ্ট কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্যে কুণ্ডদ্বয় খনন করান। পরে ঐ ছয় কিত্তা জমি শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীপাদের নামে হেবা নামা ( দান পত্র ) করিয়াদেন। তৎপরে আবার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উক্ত জমির মালিকগণ বহু সরিক বিধায় তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ পৃথক কোবালায় শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদের নামে খরিদ করিয়া লন। ঐ কোবালা সকল বাদশাহ হুমায়ুন ও আকবরের শাসন কাল ১৫৩৫ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হইয়াছিল। বাদসাহ হুমায়ুন ও আকবর মন্ত্রী টোডরমল প্রভৃতি শ্রীপাদ গোস্বামীগণকে প্রগাঢ় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন এবং পীরের ন্যায় তাঁহাদের আদেশ মান্য করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদের দোয়া বা কৃপা প্রার্থনা করিতেন। নাথু নামক জনৈক মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীকুণ্ডের কতক জমি বেদখল করায় এবং বৃক্ষাদি ছেদন করায় শ্রীজীব গোস্বামী পাদের অনুগত শ্রীগোপী দাস নামক জনৈক বৈষ্ণবমহাত্মা, বাদসাহের কাছে নালিস করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে জল আসিবার যে নালা আছে ঐ নালার সম্মুখভাগের ক্ষেত্রাদি চাষ আবাদ করিয়া যাহাতে কুণ্ডে অপবিত্র জল প্রবেশ করিতে না পারে এবং কুণ্ডতীরস্থিত ভূমিতে যে সমস্ত বৃক্ষাদি আছে তাহা ছেদন করিতে না পারে এই মর্ম্মে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ স্থানীয় জমিদার বারি খাঁ ও হায়দর কোদায়ের নিকট হইতে এক স্বীকার পত্র ( একরার নামা ) লিখাইয়া লন।

ঐ আরিট গ্রামের ইতর লোকজন শ্রীকুণ্ডের সীমানায় বৃক্ষাদি ছেদন এবং অন্যান্য অযথা অনিষ্ট করাতে শ্রীরূপদাস গোস্বামী অযোধ্যার গভর্ণর বাহাদুরের দরবারে নালিশ করিয়া ছিলেন তাহাতে উক্ত

মাহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শ্রীরূপদাস গোস্বামী মহাশয়ের অনুকুলে এই মর্ম্মে রায় প্রদান করেন যে, কেহও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণকুণ্ড এবং সংলগ্ন জমির উপর অযথা অত্যাচার করিয়া বৃক্ষলতাদি ছেদন করিতে পারিবে না। যাহাতে পুনর্ব্বার ঐরূপ কোনও প্রকার মামলা মোকর্দ্দমা দায়ের না হয় তাহারও চূড়ান্ত মীমাংসার হুকুম নামা প্রদান করেন। গভর্ণমেণ্টের সরকারি কাগজ-পত্রে উহার প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ শ্রীপাদ দাস গোস্বামীর অনুমতি লইয়া কাঁচা কুণ্ডদ্বয় পাকা করিয়া দেন। তৎপর শ্রীযুক্ত লালা বাবু শ্রীশ্রীরাধা কুণ্ডের ঘাটগুলি পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত রূপদাসগোস্বামী মহারাজ শ্যামকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করেন ও ঘাটগুলি বাঁধাইয়াদেন। রায় বাহাদুর বনমালি রায় তাঁহাকে যে অর্থ সাহায্য করেন উহাতে উক্ত শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের এক পার্শ্বের ঘাটগুলিও বাঁধান হয়।

ইহাই কুণ্ডেরসংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কাহারও বিস্তারিত ইতিহাস জানিবার অভিপ্রায় হইলে এখানে আসিয়া অথবা পত্রাদি দ্বারা জানিতে পারেন। পুরাতন দলিল পত্রাদি সমস্তই আমাদের নিকট আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেস্থানে প্রেমেবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিয়া ছিলেন, শ্রীপাদ গোস্বামী চরণগণ যেস্থানকে সর্ব্বশ্রেষ্ট আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেখানে বাস করিবার জন্ম জীবমাত্রকেই উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন, শ্রীরাধাপদদাস্যাভিমানী বৈষ্ণবগণের কল্যাণ কামনায় করুণাময় গোস্বামী পাদ মহাত্মাগণ যেস্থানের নিমিত্ত বৈরাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়া অর্থ সঞ্চয় পুর্ব্বক জমি খরিদাদি করিয়া, এমন কি বাদসাহ দরবারে মামলা মোকর্দ্দমা পর্য্যন্ত করিয়া সুদূর বঙ্গদেশ হইতে একহাজার মাইল দুরস্থিত স্থানে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন আজ আমাদের সেই গৌরবকীর্ত্তি লুপ্ত প্রায়। আজ প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ গ্রামের জমিদার ও ব্রজবাসী-

গণ "বাঙ্গালীরা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লো।" এই অপরাধে তাহাদের তাড়াইবার নিমিত্ত বহু মোকর্দ্দমা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এযাবৎ কাল পর্য্যন্ত যত মোকর্দ্দমা হইয়াছে সকল গুলিতেই বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ জয় লাভ করিয়াছেন। হাইকোর্টের রায়ের মধ্যে জজসাহেব একথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণ প্রায়ই নিষ্কিঞ্চন। অর্থ বল বা লোক বল নাই, কি করিয়া তাঁহারা এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিবেন ? এক্ষণে এই পঙ্কোদ্ধার ও সংস্কার কার্য্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অন্ততঃ ২০০০০৲ কুড়ি হাজার টাকার কম নহে। অতএব হিন্দু সাধারণের নিকট বিনীত প্রার্থনা তাহারা যেন এবিষয়ে মুক্ত হস্তে সাহায্য করেন। অর্থের সদ্‌ব্যয় ইহা অপেক্ষা আর হইতে পারে না। যেই কুণ্ড সেই কুণ্ডেশ্বরী। ইহার সেবা করিলেই শ্রীরাধারাণীর সেবা করা হয়। এই কুণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে,—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্ব গোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভা॥ ( পদ্মপুরাণ )

দানকেলী কৌমুদীর শেষ শ্লোকে—পৌর্ণমাসী বলিতেছেন—

রাধা কুণ্ডতটি কুটির বসতি স্ত্যক্তান্য-কর্ম্মাজনঃ
সেবামেব সমক্ষমত্র যুবয়োর্যঃ কর্ত্তুমুৎকণ্ঠতে।
বৃন্দারণ্য সমৃদ্ধি দোহদপদক্রীড়া কটাক্ষদ্যুতে-
স্তর্ষাখ্যাস্তুকরস্য মাধব ফলী তূর্ণং বিধেয়াস্তয়া॥

পৌর্ণমাসীর কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিতেছেন—"ভগবতি ! তথাস্তু।"
উপদেশামৃতে আছে—

( ১ ) বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাৎ
বৃন্দারণ্য মুদার পাণি রমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।

রাধাকুণ্ড মিহানি গোকুল পতেঃ প্রেমামৃত প্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্যবিরাজতো গিরিতটে সেবাংবিবেকীনঃ কঃ॥

(২) কর্ম্মিভ্যঃ হরেঃ প্রিয়তয়া খ্যাতিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো
জ্ঞান বিমুক্ত ভক্তি পরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠা যতঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজ দৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বত দিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।

(৩) কৃষ্ণস্যোসচ্চঃ প্রণম বসতি প্রেয়সীভ্যোঽপি
রাধা কুণ্ডঞ্চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তি-ভাজাং
তৎপ্রেমদং সকৃদপি সরঃ স্নতুরাবিষ্করোতি॥

ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ আমাকে কৃপা করিয়া ভৃত্যজ্ঞানে সেবা করিবার অধিকার দিয়াছেন আমি শ্রীকুণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে এই আবেদন করিলাম। এক্ষণে সকলের কৃপাশীর্ব্বাদ ও সাহায্য করযোড়ে প্রার্থনা করি।

এই কুণ্ড সংস্কারার্থে যিনি যাহা সাহায্য করিবেন তাহা নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইবেন। আমরা যথাসময়ে সাধারণের গোচরার্থ সংবাদ পত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করিব।

১। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন।
বৈষ্ণবপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া

২। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী—
শ্রীশ্রীরাধারমণবাগ নবদ্বীপ, নদীয়া।

বিনীত নিবেদক
বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী
মহান্ত, শ্রীরাধাকুণ্ড, মথুরা।

# ভক্তির পরিচয়।

যোগীন্দ্র-জায়া যোগমায়া যখন তাঁহার অতি মনোরমপম বামাকণ্ঠের সুললিত কলগীতে শ্রীহরির শ্রীঅঙ্গ-চিন্ময় শ্রীগঙ্গা-নীরে পরিণত ক'রে দেশ-কালের পরপারে শব্দ ব্রহ্মের জয়স্তম্ভ প্রোথিত কল্লেন, সেই হ'ল ভক্তির জন্মোৎসব এবং ভক্তিদেবীর জাত-কুণ্ডলী। সেই সময় হইতেই প্রায় গণনা ক'রে আসা যাচ্ছে। হরি যখন হর নারীর সঙ্গে অদ্বৈত প্রেমরসের মহা-ভাবের সমবায়ে সম্মিলিত, সম্বন্ধ-বন্ধনের সে এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় অভিনব নিদর্শন। সেই অনন্ত মুহূর্ত্তের অনাহত "বামদৃশাং মনোহর" ললিত কলধ্বনি যিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই এবং কেবল তিনিই একাকী তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনে সমর্থ। সেদিনের সংবাদ শ্রীগুরু-মুখে শুনিয়াছি, সেখানে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে বর্দ্ধমান, এক অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত, সম্বন্ধ কালের অন্বিত একতান নিত্য বিরাজমান। হরি সেখানে সুরধুনী; রঙ্গময় তখন রঙ্গময়ী তরঙ্গিনী, শ্রীহরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, তখন তরঙ্গিনীর সঙ্গিনী; শুভঙ্কর হর আবার সেই বরারোহীকে বরণ করে শিরে তুলে নিয়ে যখন তাণ্ডবের সহিত তুমুল শব্দে রাসস্থলীকে বিড়ম্বিত কর্ত্তে লাগলেন সে কি সম্বন্ধের বিস্তার,—সুরপুর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর, নাগা-নর, মহাসিন্ধু তরুলতা, এক কথায় চরাচর সম্বলিত দ্যাবাপৃথিবী সে সুর-তালে সম্মোহিত হ'তে লাগল। ভক্তি কখনই অবরুদ্ধা অর্থাৎ পর্দ্দানশীল নন, তিনি চিরদিনই যদৃচ্ছার ন্যায় স্বৈরিণী—অভিসারিকা। ভক্তির অবরোধ কোথায়?—

শ্রীবৈষ্ণব-চূড়ামণি হর-শিরে যখন ভক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার, তখন তিনি স্বতন্ত্রা, তখন তাঁর জন্য অবরোধ প্রথার সৃষ্টি হবার কোনো কথাই

ছিল না। অবরোধ হ'ল অনেক পরে। হর যখন গীত-নৃত্যের পরিণতি এবং পরিপাকে গঙ্গাকে মাথায় নিয়ে জল-ভর-বিলম্বী অথচ অবৃষ্টি-সংরম্ভ মেঘমালার ন্যায় হিমাংশুর যোগাসনে সমাসীন হ'লেন, তখন সুযোগ ক্রমে বিধি এসে বহু-বিধানে তাঁকে ডেকে ডুকে তাঁহার পুরাতন কমণ্ডলুতে পুরে ফেল্‌লেন। এই দেখলাম, ভক্তি-গঙ্গা দেবীকে প্রথম অবরোধে, প্রথম বিধির বন্ধনে। এইখানে হ'ল, সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল, সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ এবং সত্য বলতে গেলে, প্রায় সুপ্ত লুপ্ত বা গুপ্ত। কোথায় বা অপরাজিতা সে স্বৈরিতা। কোথায় কমণ্ডলুর নিশ্ছিদ্র প্রাচীর গর্ত্তে নিরন্ধ্র অবরোধ।

ওকি! বিধির হৃদয় এত শুষ্ক কেন, বিধির হৃদয়ে সে নন্দন স্পন্দন কৈ? বিধি-মুখে সে মাদক-কল-নাদ শুনি না ত? বিধি যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী জ্ঞানী, বিধি পূজাপূজক বিধি-ধোয়ধায়ী তাহাতে কি। বিধির প্রাণ খগমৃগ গুল্মতৃণ শ্বশ্ব-পাকের জন্য কাঁদে না কেন? বিধি এসে স্ববলে গিরিধরে দৈব-দুর্গ্রহের দিনে গোপ গোপী গো গোবৎসের প্রাণ রক্ষা করুন না, দেখে প্রাণ পুলকিত হউক। না, না, বিধির কাছে তরঙ্গিনী বন্দিনী। কমণ্ডলুর বাহিরে সেখানে নগেন্দ্র বালার একপদ বাড়িয়া যাইবার স্থান নাই। তবে সত্যই কি ভক্তি-গঙ্গা চিরবন্দিনী? কখনই না—সে গঙ্গাদেবীকে যে ভগীরথ মুক্ত কল্লেন। ভগীরথ যদি বিধির যজ্ঞ যাজী অভিশপ্ত সগর বংশের শৌক্র সন্তান হইতেন, অবশ্যই, তা হ'লে ভক্তিদেবীকে সে কমণ্ডলু হইতে মুক্ত কর্ত্তে কখনই সমর্থ হ'তেন না। তাঁর জীবনমূলে ত সে সবিষ-পৌরুষ দেহধর্ম্ম লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম জাতিধর্ম্ম, কুল-ধর্ম্মের চর্ম্মবন্ধন ছিল না, পক্ষান্তরে আবার তিনি ঋষি বরে বলিষ্ঠ—তাঁর ক্ষমতায় তাই এই অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপারটী যেরূপেই হউক, অবশেষে সাধ্য হয়ে দাঁড়াল। প্রকৃত ভক্ত জানেন ভক্তির মর্ম্ম। সুদীর্ঘকালের অবরুদ্ধা গঙ্গা ভক্ত-ভগীরথের মহিমায় আবার মুক্ত হয়ে অন্তে মুক্তি বিতরণের

জন্য তাঁহার উচ্ছল-জল-কল কলনাদ লইয়া জলধি অভিমুখে অভিসার কর্লেন। জয় জয়, ভক্তের জয়। ভগীরথের গঙ্গাবতারণের পথ কি একেবারে বাধা শূন্য? না তা নয়, বাধাই ত শক্তি দিয়ে ভক্তকে শক্ততর করে তুলেন। বাধার সৃষ্টি আছে স্থিতি আছে আবার প্রলয় ও আছে। এ সম্বন্ধে নিজ নিজ জীবনই যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান কর্ত্তে পারেন।

ভগীরথের প্রথম বাধা বিধির কমণ্ডলু, তার পরের বাধা একটা বৃহৎ ব্যাপার—অবরুদ্ধা গঙ্গার রুদ্ধনীরের সে উদ্ধত বেগ ধারণ করে কে? সে বাধা থাকল না—সে বেগ ধারণ কর্ব্বার যিনি ছিলেন তিনিই ধর্লেন। ধূর্জ্জটি এসে হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মাকে মাথায় করে নিলেন। ভক্তের সহায় ভক্তাবতার, ভক্তশক্তি, ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ এবং ভক্তাখ্য জনেরা। ভোলার মহিমা কি বল্‌ব, গীতি-গালবাদ্যে সরিদ্বরাকে বরণ করে, তিনি কেবল্ মাথায় ধরেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি তাণ্ডবে উচ্ছ্বসিত গঙ্গাধারার প্রবল প্রবাহকে ধরার দিকে প্রবাহিত করে দিলেন। ভক্তি গঙ্গা তখন মুক্তপ্রাণে মুক্তগানে হিম-বিধু-মুক্তা ধবল তরঙ্গে সাগর অভিমুখে শুভযাত্রা কর্লেন। ভক্তের বন্ধু পঞ্চানন, ভক্তের সহায় পঞ্চতত্ত্ব। এরা যখন ভক্তির বান চৌদিকে ছড়াইয়া বহাইয়া দেন তখন বাধা বন্ধন থাকে কোথায়? অবশ্য শত শত বাধা সম্মুখে পড়ে, কিন্তু অচিরে সুদূরে তিরোহিত হয়।

ঐ দেখুন, ভগীরথের সম্মুখে ভক্তিগঙ্গার গতিপথে অচলায়তন গিরি-স্থিতি প্রাণহীন দেশাচারের তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা। তাকে ভেদ করে পথকে অবাধ করার কি এক হাস্যজনক প্রহসন। দেবদণ্ডীর কত দুর্ব্বানী। তার যে মরণের ঔষধ গলায়, তা ত সে জান্‌ত না। দেখুন না, কেমন করে, ভক্তি মাতা আমার অচল-সচল নগ-নাগের নির্ব্বাণ মুক্তি ব্যবস্থা করে প্রস্থান কর্লেন। জয় জয় ভক্তির জয়।

তারপরে জহ্নু-শুষ্কধর্ম্মের শোষণ শক্তিতে ভক্তিমাকে উদরসাৎ করে

নিশ্চিন্ত। তা কি হয়? আপস হল, মাও তাকে ধন্য ক'রে, তার কন্যা হ'য়ে, তবে অভিমানের উরুভেদ ক'রে সাগরের দিকে চল্লেন। ভক্তি যে অমানিনী মানদা।

আবার ঐ দেখুন পায়ে পায়ে কত বাধা, ভক্ত সেজে ভাক্ত, ভক্ত ভগীরথ হ'য়ে অসুর কেমন শঙ্খধ্বনি ক'রে ভক্তিমাতার আগে আগে চলেছে। কতক্ষণ চলতে পারে। কতক্ষণ জলের তিলক, কতক্ষণ শূন্যের শিলা শীঘ্রই সব পরিস্কার। গঙ্গাসাগরে সঙ্গমতীর্থ-ক্ষেত্রে ভক্তির পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল, ভক্তিসাধক ভগীথের "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" গঙ্গা স্পর্শে অঙ্গারের বৈষ্ণবী সেবা লক্ষণা মুক্তি বিহিত হ'য়ে গেল। হরিহরি বলুন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কাব্য পুরাণতীর্থ।

# কয়েকটী উক্তি

জীবনপথে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন কখন এমন দুই একটী ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, যাঁহাদের স্মৃতি বা উক্তি চিরদিনের মত চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যায়। আমি এইরূপ কয়েকটী মহাত্মার কথা ক্রমশঃ উল্লেখ করিব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিবস গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালে আমি স্বগৃহ হইতে কিঞ্চিৎদূরে একটী বৃদ্ধ দোকানদারের দোকানে উপবিষ্ট ছিলাম। বৃদ্ধ আমাকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং আমার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। আমি অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। আমার হস্তে প্রায়ই কোন সুপাঠ্য ধর্ম্মপুস্তক থাকিত। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি ধর্ম্মালাপ করিতাম, কিম্বা কোন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতাম। বৃদ্ধের দোকানে কিছু কিছু গাছগাছড়া বা মশলা মাত্র ছিল। কতগুলি হাঁড়িকলসীও ছিল। বৃদ্ধ দোকান খুলিয়া বসিয়া রহিতেন মাত্র।

খরিদ্দার বড় একটা দেখিতে পাইতাম না। সমস্ত দিবসে বৃদ্ধের ।/০, ৷৵০ বিক্রয় হইত কিনা সন্দেহ। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ দোকান বন্ধ করিতেন। তাঁহার দোকান করা কেবল পূর্ব্ব অভ্যাস বজায় রাখিবার জন্য এইরূপই বোধ হইত। যাহা হউক আমি মধ্যাহ্নকালে কোন পুস্তক হস্তে বৃদ্ধের দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটি বিদেশী ব্রাহ্মণ সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স অনুমান ৪০ বৎসর। সামান্য বেশ। গলদেশে মাত্র একখানি চাদর। তিনি উপস্থিত হইয়াই কহিলেন —"বাবা, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।" বৃদ্ধ কহিলেন,—"তোমাকে কি ভিক্ষা দিব, আমার সমস্ত দিবসে ।০ আনা পয়সাও রোজগার হয় না।" ব্রাহ্মণ কহিলেন—"কাহার কি দিবার আছে, বাবা, কেহ কাহাকেও কিছু দেয় না। যিনি জগতে একমাত্র দাতা (দেনেওয়ালা) তিনিই দিয়া থাকেন। মানুষ বৃথা অভিমান করেমাত্র! আচ্ছা! তুমি কিছু না দিতে পার, দিও না।" তাহার পর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"কি পুস্তক পড়িতেছ বাবা?" আমি কহিলাম,—ইহা একখানি ধর্ম্মপুস্তক।" তিনি কহিলেন—"জগতে পুস্তক কই? তিনখানি পুস্তক মাত্র আমি পাঠ্য দেখিতে পাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কি পুস্তক?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা আর মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" আমি বুঝিলাম, ব্রাহ্মণ সাধারণ ভিক্ষুক নহেন। তাঁহাকে আরও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আর অধিকক্ষণ রহিলেন না। ক্ষিপ্রপদে অন্য কোথায় চলিয়া গেলেন। আমি ব্রাহ্মণের কথিত পুস্তকত্রয়ের কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। এক্ষণে আর একমহাত্মার কথা বলি।

আমার স্বগ্রামে অপর কোন স্বর্গগত ব্রাহ্মণ আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি একদিবস কথায় কথায় কহিলেন—"জগতে অধ্যয়ন করা কিংবা

ব্যাখ্যা করা তত কঠিন নহে। কিন্তু ভাগবত-জীবনলাভ করা বড়ই কঠিন।" পরলোকগত ব্রাহ্মণের এই জ্ঞানগর্ভ উক্তি আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আর এক দিবস তিনি কহিলেন—"তোমাকে একটি সংস্কৃত বচন বলিতেছি। মনে রাখিও।"—এই বলিয়া আবৃত্তি করিলেন

"হরিং হরিতকীঞ্চৈব গায়ত্রীং জাহ্নবী জলং।
অন্তর্মল বিনাশায় স্মরেৎ ভক্ষেৎ জপেৎ পিবেৎ॥"

শ্লোকটি নিতান্ত সরল; অর্থ বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু শ্লোকের অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্বের বিষয় অনুক্ষণ চিন্তনীয়। আমি শ্লোকটী সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া থাকি এবং উহার অনুকূল যে সমস্ত প্রমাণ আছে সেগুলিও স্মরণ করিয়া থাকি। শ্লোকের অর্থ পাঠকমাত্রে অনুধাবন করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলি "অন্তর্মল বিনাশের নিমিত্ত শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে, হরিতকী ভক্ষণ করিবে, গায়ত্রী জপ করিবে এবং গঙ্গাজল পান করিবে।" হরিস্মরণ মাত্রই যে জীবের চিত্ত পবিত্র হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিষ্ণুস্তব উপলক্ষে মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষাঃ নিবেদিতফলাস্তয়ি॥"

হে ভগবন্, তোমাকে স্মরণ করিলেই যখন সেই স্মরণকারীকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া থাক, তখন দর্শনস্পর্শনাদি বৃত্তিসমূহ তোমাতে প্রয়োগ করিলে যে কি ফল হইবে তাহা স্মরণজনিত ফল হইতেই অনুমিত হইতেছে।" তাহার পর স্ত্রীশূদ্রাদির আচমনমন্ত্রে আছে "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ। নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।"

অতএব হরিস্মরণমাত্র যে চিত্ত শুদ্ধি হয় তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলাম।

তাহার পর হরীতকীর অন্তর্মল বিনাশের বিশেষ শক্তি আছে। কবিরাজ মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছি—

হরীতকীং ভুঙ্ক্ষ্ব রাজন্ মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতে মাতানোদরস্থা হরীতকী ॥

হে রাজন্ আপনি হরিতকী ভোজন করুন। ইহা গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় হিতকারিণী। জননী কদাচিৎ কুপিতা হয়েন, কিন্তু হরীতকী উদরস্থ হইয়া কখনও অপকার করে না। ( অবশ্য হরীতকী ভোজনেরও মাত্রা আছে।) তারপর, ব্রাহ্মণের জপ্য গায়ত্রীর সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। শুনিতে পাই গায়ত্রী মন্ত্রের জপকারী ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করেন বলিয়াই গায়ত্রীর নাম "গায়ত্রী" হইয়াছে। তারপর, পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর সুপবিত্র বারির কথা আর কি বলিব? ভগবান শঙ্করাচার্য্য সত্য বলিয়াছেন—

"ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা-জল-লব কণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চ্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাঃ ॥"

যিনি ভগবদ্গীতা কিঞ্চিৎমাত্রও অধ্যয়ন করেন এবং গঙ্গাজল কণিকামাত্রও পান করেন, যিনি একবারমাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে যমের আর কি অধিকার আছে? আজ এই পর্য্যন্ত, সময়ান্তরে অন্যান্য উক্তি লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস

---

# চয়ন

**সঙ্গীতের উপকারিতা**—বিলাতের এক ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন যে, সঙ্গীতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। যাঁহারা অক্ষুধা,

মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগে পীড়িত তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গীত উত্তম ঔষধ।

বিলাতের ডাক্তার সাইরিল হরসফোর্ড রয়াল হাঁসপাতালের একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক। ইনি যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। ইনি বলেন, যক্ষ্মারোগের পক্ষে সঙ্গীতের তুল্য মহোপকারী ঔষধ আর নাই। যক্ষ্মারোগের সূত্রপাত মাত্রই যদি রোগী সঙ্গীতাভ্যাস করে, তবে ঐ রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। গায়কেরা নাসিকা দ্বারাই নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, মুখবিবর দ্বারা শ্বাস গ্রহণের অবকাশ হয় না। এইরূপ গ্রহণে শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত জীবাণু সকল শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং যক্ষ্মারোগ বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ব্যতীত গায়কগণ আর একটি উপকারী প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহা গভীর শ্বাস প্রশ্বাস। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বক্ষ বিস্ফারিত হয়। এইরূপ কার্য্যেও যক্ষ্মারোগের জীবাণুর বক্ষ মধ্যে অবস্থান কষ্টকর হইয়া থাকে। সঙ্গীতে গলনলীর অগ্রভাগের বিশেষ পরিচালনা হয়, চিকিৎসকেরা বলেন, প্রথমতঃ গলনলীর অগ্রভাগেই যক্ষ্মার সূত্রপাত হয়। সুতরাং সঙ্গীতে ইহার প্রতিষেধক কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে সঙ্গীতের ক্ষমতা অতুলনীয়। ডাক্তার হরসফোর্ড বলেন গির্জ্জার গায়ক বালকগণ যে প্রায়ই সবল ও দৃঢ়কায় হয়, সঙ্গীতই উহার একমাত্র কারণ। (ঢাকা প্রকাশ)

---

**খাদ্য**—বিলাতী ছাপমারা ব্যবস্থার কোন প্রতিবাদ নাই। এমন কি আমাদের উপবাসগুলি পর্য্যন্ত বিলাতী সাটিফিকেট লইয়া আমাদের ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিতেছে। তুলসী বিলাতের হুকুমে জলচল হইবার পথে

আসিতেছে। নিরামিষ তরীতরকারী বিলাতের ও আমেরিকার পণ্ডিতগণের প্রসাদী হইয়া আমাদের উপভোগ্য হইতেছে। অর্থাৎ আমাদের সেকেলে মহর্ষিগণ যে বিজ্ঞানের ছিটা ফোঁটা জানিতেন, তাহা তাঁহাদের সন্তানেরা এখন একটু আধটু বিশ্বাস করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশের পণ্ডিতেরা তাঁহাদের জ্ঞানগরিমার গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন। আমরা ততদূর যাইবার অধিকারী নহি। সম্প্রতি ফোর্ড গাড়ীর আবিষ্কর্ত্তা মিঃ হেনরী ফোর্ড বলিয়াছেন, খাদ্যদ্রব্য মানবের মনের উপর, শরীরের উপর ও চরিত্রের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাঁহার মতে খাদ্যবিচার ও খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ধর্ম্মের অঙ্গ হওয়া উচিত। ধর্ম্মযাজকগণেরও এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কুখাদ্য খাওয়ায় মানুষ কুকর্ম্মান্বিত হয়। মিঃ ফোর্ড আরো বলেন, খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া মানুষ যখন দৈনিক নির্দ্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইবে, তখন ব্যাধি দূর হইবে, পাপকার্য্যে আসক্তি হ্রাস পাইবে। মানুষ প্রকৃত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ হইলে, চিকিৎসার প্রয়োজন থাকিবে না, তখন দেশের লোকের চুরির প্রবৃত্তি প্রায় থাকিবে না। সুতরাং জেলখানারও বিশেষ আবশ্যকতা রহিবে না। ধর্ম্মযাজকেরা লোক শিক্ষায় খাদ্য বিচার ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করুন, তাহাতে দেশবাসীর সমধিক উপকার হইবে। এইভাবে সমগ্র দেশময় খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে, দেশে ব্যাধি, অকাল মৃত্যু, শোক তাপ কিছু থাকিবে না। মিঃ ফোর্ড আশা রাখেন, এই কার্য্য করিলে দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে।" আমরাও বলি, ফিরে এসো—ঐতো পন্থা হিন্দু মহর্ষিগণের। [ ঢাকা প্রকাশ ]

---

**বিশ্ববিদ্যালয়**—মহামনস্বী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২টী বিষয়ে শিক্ষাদান করা

হয়। অধ্যাপক ১৫০ জন। ছাত্র সংখ্যা ২৬ শত। প্রায় সকল অধ্যাপক ও অর্দ্ধেকের বেশী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতেই বাস করেন। ১৭৩টী পাকা বাড়ী হইয়াছে। লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ৬০ হাজার। পরীক্ষাগার ১২টী। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার যন্ত্র। সম্প্রতি যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক ফুরাইয়া গিয়াছে। বাকী অর্দ্ধেক ধনভাণ্ডারে আছে। আরো ১ কোটী টাকার জন্য মালবীয়জী দেশবাসীর নিকট হাত পাতিয়াছেন; দেশবাসী মালবীয়জীর ভাণ্ডার অক্ষয় করিয়া দিবেন, এই ভরসা আমাদের আছে। ( ঢাকা প্রকাশ )

---

# শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট বৈষ্ণব-প্রদর্শনী।

কৃপাসিন্ধু ভক্তগণচরণ সরোজে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন;—

আগামী ১৭ই কার্ত্তিক রবিবার ( ইংরাজী ৩রা নবেম্বর ) শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ সুন্দরের ৺পুরীধাম হইতে শুভাগমন স্মরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এজন্য পতিত পাবন গৌর-ভক্তবৃন্দের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন;—উপরিউক্ত পূণ্য দিবসে আপনারা সবান্ধবে, ও স্ব-সম্প্রদায়ে,—শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের আনন্দ লীলা নিকেতন,—চির-আবির্ভাব ক্ষেত্র, শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনে, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন, আমাদের উদ্ধার করিবেন। এই পরমোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমরা অধমতারণ

ভাগবতগণের প্রত্যেককেই করজোড়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বাসনা পূর্ণ করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত বৈষ্ণব-পদরজ-প্রার্থী

দীন—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী ( ভাগবতরত্ন )

( শ্রীশ্রীরাঘব বংশাবতংশ )

কাঙাল—শ্রীরামদাস বাবাজী ( প্রভৃতি )

## বৈষ্ণব-প্রদর্শনী সংবাদ

এবারে উৎসবক্ষেত্রে বিপুলভাবে বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর ( exhibition ) আয়োজন হইতেছে। ইতি মধ্যেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানাবিধ মূল্যবান ঐতিহাসিক দ্রব্য সংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে। এরূপ প্রদর্শনী নূতন, ইহা দর্শন না করিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত মূল শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ( ভাগবত ), শ্রীগৌরহরির শ্রীঅঙ্গের শ্রীবস্ত্র, এবং সিদ্ধভক্তগণের স্মৃতি চিহ্ন ও বহু অপরূপ ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হইবে।

স্বদেশপ্রাণ মহাত্মাগণের প্রত্যেকের নিকট আমাদের নিবেদন:—কৃপা করিয়া এই অভিনব ও মহানন্দজনক প্রদর্শনী ( বিনা দর্শনীতে ) সন্দর্শন করতঃ আনন্দ উপভোগ করুন, তাহা হইলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সফল হইবে, আমরা ধন্য—কৃতার্থ হইব।

## পরিশেষে প্রার্থনা

প্রদর্শনী বা গৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যরাজির মধ্যে যাঁহার যাহা আছে বা প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কৃপা করিয়া উৎসবের পূর্ব্বে শ্রীগ্রন্থ মন্দিরে প্রেরণ করুন। বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসমূহ একস্থানে

স্থায়ীভাবে পরম যত্নে রক্ষিত হইবার পক্ষে সকলকেই যত্নবান হইবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

## প্রার্থিত দ্রব্য

হস্তলিখিত পুঁথি। চিত্রিত পুঁথির পাটা বা কাঠ, যে কোন ভাষায় মুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ, সদগ্রন্থ। পুরাতন বৈষ্ণব পত্রিকা ( ছিন্ন বা যে কোন সংখ্যা ) বর্ত্তমানের সর্ব্বপ্রকার মাসিক পত্রিকাদি, বটতলার ছাপা বৈষ্ণব গ্রন্থ, বিভিন্ন সংস্করণের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাচিত্র ( প্রাচীনকালের চিত্রিত বা বর্ত্তমান কালের মুদ্রিত ) শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির প্রভৃতির ফটো; শ্রীপাটের বা বৈষ্ণবতীর্থের ফটো, নক্সা, মানচিত্র, এবং পুরাতন ইষ্টক প্রভৃতি। গৌড়-মণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল, পুরীমণ্ডল ও বিষ্ণুমন্দিরের ফটো, প্রাচীন এবং বর্ত্তমান যুগের শ্রী শ্রীগৌরভক্তগণের ফটো।

"প্রভু কহে যার মুখে শুনিএকবার—
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

ভাগবতগণের হস্তাক্ষর, রচিত পদ, গীত, গ্রন্থ, ( পাণ্ডুলিপি ) সিদ্ধ-মহাত্মাগণের ফটো, পাদুকা প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন। শ্রীগৌর পারিষদবর্গের বংশতালিকা; প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পয়সা কড়ি, হরিসভা ও ভাগবত সভা-সমূহের মুদ্রিত পত্র ( পুরাতন হইলেও ) প্রভৃতি দ্রব্য আমরা প্রার্থনা করিতেছি। মোটকথা—বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি ক্ষুদ্র বা ছিন্ন বিজ্ঞাপন-পত্রও আমরা প্রাপ্ত হইলে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছি।

## সর্ব্বশেষে নিবেদন।

এবিষয়ে আমরা আপনাদের নিকট সর্ব্ববিষয়েই কৃপা প্রার্থী। অর্থ,

সামর্থ, দ্রব্য ও শুভাশীর্ব্বাদ এই চারিটাই আমরা প্রত্যেক্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। প্রতিদান সামান্য হইলেও আমরা মস্তকে করিয়া গ্রহণ করিব। যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা দীন সেবকগণের প্রতি কেবল মাত্র শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেই আমরা পরম লাভ মনে করিব।

## অভিমত

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির সম্বন্ধে বহু অভিমতের মধ্যে ২।১ খানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) বৈষ্ণব জগতের উজ্জলরত্ন শ্রীখণ্ডের শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত ;—

"শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির অচিরেই পূর্ণতা লাভ করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। ইহা আমি মানসচক্ষুতে দর্শন করিতেছি।"

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্‌সেলার শ্রদ্ধেয় রেভারেণ্ড ডক্টার ডব্লুউ, এস, আর কোহাট M. A. D. Phil সাহেব মহোদয়ের কথা—
"বাংলা দেশ বিশেষতঃ কলিকাতার এত নিকটে এমন একটী জিনিষ আছে ( গ্রন্থমন্দির ) তাহা আমি জানিতাম না, বড়ই প্রীত হইলাম।"

(৩) পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর মহোদয় ;—
"শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির বৈষ্ণব জগতে এসিয়াটিক সোসাইটীর মত একটী প্রতিষ্ঠান দাঁড়াইবে। ইহার সাধু উদ্দেশ্য ;—বৈষ্ণব গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ-সংগ্রহান্তর বিপুল গ্রন্থাগার ( Bodlion Library ) প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ বৈষ্ণব বিদ্যার একস্থ সৌন্দর্য্য পিরামিড় ( museum ) ভাগবত ধর্ম্মের সুচিত্র মন্দির প্রস্তুত করা। এই অমূলধন সঞ্চয় মানসে × × × ইনি বেশ অগ্রসর হইয়াছেন ও সিদ্ধির পথে দাঁড়াইয়াছেন।

"ধর্ম্ম ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই সার্ব্বজনীন মঙ্গলময়ী কীর্ত্তিমঠ

নির্ম্মাণের ইষ্টক স্বরূপ নিজস্ব পুঁথি, পত্র, সম্পদ, ধনদৌলত আন্তরিক সহানুভূতি সহকারে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের আনন্দ লীলানিকেতন শ্রীপাট পাণিহাটীতে সম্পাদক সমীপে প্রেরণ পূর্ব্বক এই বিশাল নির্ম্মাণ বিষয় সহায় হইবেন, ইহাই অনুরোধ।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(ক) পথ পরিচয়—E. B, R সোদপুর ও E, I, R কোন্নগর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল ব্যবধানে পাণিহাটী গ্রাম।

(খ) প্রদর্শনী ১৭ই কার্ত্তিক হইতে ৪ দিবস খোলা থাকিবে।

(গ) পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে বিদেশীয় ভক্তগণের জন্য বাসার বন্দোবস্ত করা হয়। ( রিপ্লাইকার্ড প্রার্থনীয় )

(ঘ) পত্র, বুকপোষ্ট, পার্শেল মনিঅর্ডার নিম্ন ঠিকানায় ( টেলিগ্রাম, রেল পার্শেল প্রভৃতি নিকটেই E, B,R সোদপুর ষ্টেশন মারফতে ) প্রেরণ করিবেন। ইতি

ঠিকানা,—সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির
পাণিহাটী পোঃ ( ২৪পরগণা )
নিবেদক—বৈষ্ণব দাসানুদাসাভিলাষী—
শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

## বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

**ভক্তি-নিকেতনে উৎসব।**—ভক্তিকার্য্যালয়ে কয়েক বৎসর শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তগণের সাহচর্য্যে একটী আনন্দ উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবারে সম্পাদক মহাশয়ের পারিবারিক নানাপ্রকার অসুস্থতার

জন্য ও প্রধান উদ্যোগী ভক্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ অধিকারী কঠিন রোগে শয্যাগত থাকায় উৎসব বন্ধ থাকিবারই প্রস্তাব হয়, কিন্তু লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের কি যে লীলাভঙ্গি অনাহূত ভাবে বিদেশস্থ কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত হইয়া বেশ আনন্দ করিয়া গিয়াছেন। ২ দিন ভক্তগণ সঙ্গে খুবই আনন্দে কাটিয়াছে। আমরা উৎসবে উৎসাহ দাতা ভক্তগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহাদের মঙ্গল করুন।

**শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী** মহাশয় গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে হেতমপুর গিয়াছিলেন সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া নীলাচলে গিয়াছেন এখনও আসেন নাই ৺দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিবেন। অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং পত্রাদি ব্যবহার করিতে চাহেন, সকলকে পৃথকভাবে উত্তর দেওয়া কষ্টকর, তাই সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে,**১৯০নং দর্মাহাটাষ্ট্রীট, কলিকাতা।** এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখিলেই তাঁহার সংবাদ পাইবেন।

**নেতাগিরি।** সেদিন বঙ্গবাসীতে দেখিলাম একজন নেতা মাদক-দ্রব্য সেবন নিষেধ বলিয়া খুব বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন, যখন তখন যাকে তাকে ধরিয়াই কথার তুবড়ি ছুটাইয়া থাকেন. তিনি আবার মাদক-দ্রব্য নিবারণী সভার সভাপতি। দেশের ছেলেদের কেমন তাহার কথায় সন্দেহ হয়, একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া গিয়া চুপি চুপি নেতার বাড়ীতে উপস্থিত; দেখে নেতামহাশয় সুরাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত, সবে মাত্র এক গ্লাস ঢালিয়াছেন অমনি ছেলেরা গিয়া বলিল 'আপনি না মদ খাবার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন? এযে আপনি নিজেই মদ খাইতেছেন?' তখন নেতা মহাশয় বলিলেন "ঔষধের জন্য মদ খাওয়া ব্যবস্থাত আছেই।" ছেলেরা নাছোড় বান্দা, তাহারা বলিল আপনার কি অসুখ? কর্ত্তা উত্তর করিলেন— "তা,

অসুখ, বুঝেছ, সেটা, জান, এই যে মনে কর, একটু না খেলেই অসুখ করে।" শুনিয়া ছেলের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আজকাল একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেকের ভিতরেই এই রোগটি দেখা যায়। মুখে উপদেশের স্রোত বহাইয়া লোককে তাক্ লাগাইয়া দেয় কিন্তু কাজের বেলা কিছুই করেনা। এই যে অপরকে উপদেশ করা আজকাল এক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি কোন সৎ বৈদ্য নাই, যিনি এ রোগের ঔষধ বাৎলাইয়া দিতে পারেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।" কিন্তু আজ কাল এ সকল হইতে চলিল কি?

ভেট।—ভক্তিতে অনেকদিন হইতেই নবদ্বীপের ভেট সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ভক্তির নিয়মিত লেখক সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ভুলুয়া বাবা অনেকবার এসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী উকিল মহাশয় এবিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা সকল বিষয় তাঁহার সহিত এক মত না হইলেও স্থানান্তরে তাহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম, দেশের মঙ্গলাকাঙ্খী যুবকগণকে আমরা এ বিষয় অবহিত হইতে আহ্বান করি।

আদর্শ মুসলমান।—আমরা শুধু দলাদলি মারামারি লইয়াই মত্ত, নিজের নিজের ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা মহাপুরুষগণের উপদেশ যদি যথার্থভাবে গ্রহণ করি এবং তাহার বিষয় যদি একটু অনুধাবন করিয়া দেখি তাহা হইলে কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়ের সহিতই বিরোধভাব আসিতে পারে না। বিগত ২১শে ভাদ্রের হিতবাদিতে দেখিলাম—"গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ছাপরায় একটী জনসভা হইয়াছিল, ঐ সভার উদ্যোগীগণের মধ্যে অধিকাংশই নাকি মুসলমান ছিলেন। অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুসলমান ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

আহম্মদ আলি খাঁ কোরাণ ও গীতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ঐ সভায় বলেন যে, উভয় গ্রন্থেরই নির্দ্দেশ এক। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।" আজকাল মূলে সত্য থাকুক বা না থাকুক আপনার জিদ্ বজায় রাখিতে গিয়া প্রাচীন মতকে ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে তথাকথিত বাবুর দল যেরূপ বদ্ধ পরিকর এরূপ সময় এরূপ মহানুভবতার পরিচয় যথার্থই প্রশংসার্হ।

**রেঙ্গুনে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব।**—এবার সুদূর রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙ্গালীগণের উৎসাহে নানা স্থানে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব মহ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা সংবাদ পাইলাম শ্রীশ্রীদুর্গা মন্দির হইতে অন্যান্য বারের ন্যায় সকল হিন্দু সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়াছিলেন অন্যবার অপেক্ষা এবার লোক সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল এবং নাম গানের আনন্দ হিল্লোলে দশদিক মুখরিত হইয়াছিল। রেঙ্গুন হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত অটল বিহারী বন্দোপাধ্যায় তাঁহার রেঙ্গুনস্থ নিজ ভবনে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। বাংলা হইতে শ্রীশ্রীমুরলীধরের শ্রীমূর্ত্তি নিয়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ উপচারে সাজাইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ ইঁহার পরিবারস্থ ভক্তিময়ী মহিলাগণের সেবার পারিপাট্যে শ্রীমূর্ত্তি অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিলেন। সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "ভক্তিময়ী মহিলাগণের ভক্তি ও গুণের বর্ণনা অসম্ভব। উৎসব ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা কীর্ত্তন সময় বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবন যেন শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি দর্শকগণের সম্মুখে প্রকট করিয়া দিয়াছিল। অটল বিহারী আমাদের অটল থাকুন, যেখানে অটলা শক্তি সেখানে অটল প্রেমভক্তি থাকিবেই।" রেঙ্গুন হাই কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত জে, আর, দাস মহাশয়ও সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আজ হরিনামোন্মত্ত দেখিয়া রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালী-গণ যথার্থই যেন এক মহা গিরীর শীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে বহুলোক লালায়িত হইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগীনের খাঁদুবাবুও তাঁহার রেঙ্গুনস্থ বাসাবাড়ীতে এই জন্মাষ্টমী উৎসব করিয়া ছিলেন। ছেলেরা মনের মত করিয়া ঠাকুরকে সাজাইয়া দর্শক-গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। কারাগার নির্ম্মাণে যেরূপ নিপুণতা দেখাইয়াছে তাহাতে ভাব ময় প্রাণেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সংবাদ দাতা জানাইয়াছেন, যে,—"রেঙ্গুনে খোল করতাল সহযোগে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রথম শ্রীযুক্ত সুললিত কুমার ঘোষ মহাশয়ই আনিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম খুব আনন্দ হইত পরে বহুতর বিপদ উপস্থিত হইলেও তিনি কিছুতেই নাম ছাড়েন নাই। সুললিত বাবুর যত্নেই আজ এখানে এই হিল্লোল উঠিয়াছে, রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালী এজন্য তাঁর নিকট চিরঋণী।" রেঙ্গুনে হরি নামের প্রচার দেখিয়া এবং এবার শ্রীজন্মাষ্টমীর আনন্দ উৎসব দর্শনে আমাদের বন্ধুবর শচীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"হরিনাম সুললিত গায়রে সুদূরে।
মৃদঙ্গ করতাল বাজে মধুরে মধুরে॥
এহেন সাগর পারে নন্দের নন্দনে।
ঘরে ঘরে পূজে আজ তুলসী চন্দনে॥
রেঙ্গুনে নামের হিল্লোল বাড়ে দিন দিন।
ওরে ভাই! দেখ চাহি এবড় সুদিন॥"

* * *

**শ্রীগ্রন্থ পাঠ।**—কলিকাতায় মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের "কল্পতরু প্রাসাদে"—অনেকদিন হইতেই প্রভুপাদ শ্রীল

রাধাবিনোদ গোস্বামী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন, মধ্যে একদিন শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তনও হইয়া গিয়াছে।

**অভিনয়।**—'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে—'শান্তি সভার' উদ্যোগ "শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" লীলা অভিনয় ১০ই ভাদ্র হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভাব প্রচারিত হইয়াছে।

**"মায়াপুর" পোষ্ট আপিস** নাম লইয়া কৃষ্ণনগরের আদালতের হাকিমের উপর মীমাংসার ভার পড়িয়াছে। বিচারকের রায় আমরা যথা সময়ে প্রকাশ করিব।

**যুগল চিত্র।**—"প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় গত সংখ্যায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও গৌর হরির একখানি সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

**গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর** সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দে ও শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী যুগলে মিলিয়া সম্মিলনীর ঋণ পরিশোধ ও সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি সাধন জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। সম্মিলনীর মাঠে সিংহ ব্যাঘ্র লুকাইয়া থাকিতে পারে এরূপ জঙ্গল হইয়াছিল এইবার সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইতেছে।

**পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে** বিদ্যুৎ আলোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেও একবার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু সেবারে পাণ্ডাগণ নানা প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন, শুনিলাম এবার পাণ্ডাগণ কোন আপত্তি করেন নাই।

**শ্রীবৃন্দাবনের বাঁদর চালান** সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও কোন মীমাংসা হয় নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে কসাইখানা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল এখন আবার বানর চালান সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে এসব কি হইতেছে ?

সংবাদ পত্রে শুধু আলোচনা করিয়া কতদূর ফল হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে প্রাণ আছে এমন জন কয়েক কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলে বোধহয় সহজেই এসব গ্লানি দূর হয়। কিন্তু পরস্পর দলাদলি লইয়াই ব্যস্ত কখন আর এসব কার্য্যে হাত দিবেন।

# প্রশ্নোত্তর বিভাগ

পরম পূজনীয় সম্পাদক মহাশয়ের শ্রীচরণেষু—

আপনার ১৩৩৬ ভাদ্র সংখ্যার মাসিক পত্রিকা "ভক্তি"র ২৭ পৃষ্ঠায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে ২নং প্রশ্নের আংশিক উত্তর আপনার পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। প্রশ্নকর্ত্তা বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ সেবিত হয়, তাহার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন, হয়ত অনেকের নিকট হইতেই উত্তর পাইয়া থাকিবেন। পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বাহিরে আমিয়া যে কয় স্থানে উক্ত মহাপ্রভুর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন দেখিয়াছি তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশের মধ্যে আকিয়াব সহরের ও রেঙ্গুন পৌনাবস্তির শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানিতে পারিয়াছি এবং যেরূপ সেবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহাতে আকিয়াবের বিগ্রমূর্ত্তির সেবার কোনরূপ ত্রুটী নাই এবং যাহাতে স্থায়ীভাবে সে কার্য্য চলিতে পারে তাহার সুচারু ব্যবস্থাও তাঁহার স্থাপয়ীতাই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রেঙ্গুন পৌনাবস্তিস্থিত যে বিগ্রহ আছেন তাঁহার সেবার ত্রুটী দেখিলে হিন্দু মাত্রেরই বিশেষ দুঃখের কারণ হয়। উক্ত বিগ্রহের সেবাইত যে পৌনারা ( কনৌজী ব্রাহ্মণ কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইদানীং ব্রহ্মভাবাপন্ন ) আছেন, অর্থাভাব বশতঃই সেবার সুব্যবস্থা

করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মন্দিরটী বড় ও প্রাচীন,—প্রায় ২৫০। ৩০০ বৎসরের. ইদানীং সংস্কার অভাবে বিশেষ জীর্ণ। রেঙ্গুন প্রবাসী বাঙ্গালীদেরও বিশেষ কোন সহানুভূতি ইহাতে নাই।

২। এতদ্ভিন্ন Strait Settlement ভ্রমণকালে (Penang) পিনাং সহরে যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিয়া আসিলাম সে সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা লিখিতেছি, আশাকরি আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিবেন।

উক্ত মন্দিরে যে বিগ্রহমূর্ত্তি আছেন, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারী। এই বিগ্রহ প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বাংলা হইতে লইয়া গিয়া সেবা প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানে ইহাঁর সেবাইত জিলা চট্টগ্রামস্থিত মোহরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। উপযুক্ত পুত্র না থাকায় ও বার্দ্ধক্যনিবন্ধন বিশেষ অর্থাভাবে উক্ত সেবার কার্য্য যে আর বেশীদিবস চলিবে বা বাঙ্গালীর গৌরব সেই মন্দিরটী বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে তাহার ভরসা নাই। অতএব আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, যে কোন উপায়ে সুদূরস্থিত ঐ মন্দিরটী বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে সুন্দররূপে চালিত হইবার ব্যবস্থা হউক, তাহা হইলে আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব।

এই মন্দির ও বিগ্রহের ইতিহাস কাহারও জানা থাকিলে আপনার পত্রিকার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—"পরিব্রাজক বাবাজী"

# শোক সংবাদ

আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে এসে আমাদের পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় ৺কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে এই আত্মীয় স্বজন পরিত্যাক্ত বাংলার সন্তান যে কতদূর মর্ম্মাহত হ'য়েছে, তা এক ভগবান ছাড়া কেহ জানেন না।

গত বৎসর শারদীয়া পূজার সময় আমি দেশে ছিলুম, আমাদের মাষ্টার মহাশয় আমাদের নিয়ে কত আনন্দ করেছিলেন। আমার বেশ মনে পড়ে যে, তিনি একবার আমায় বলেছিলেন, 'খুব পরিশ্রমী হবে, দুর্ব্বলতা বলে জিনিষটাকে অন্তরে স্থান দিওনা।' তাঁর সেই শিক্ষা যে কোন কাজে পিছু হেঁট না। যখন তিনি আমাদের ট্রুফ ও স্কাউট পরিদর্শন করতে আসতেন, নিজেই আমাদের লাইনে দাঁড়ায়ে আমাদের কত উৎসাহিত করতেন। একবার আমাদের নিমতায় ক্যাম্পে যেতে হয়েছিল, সেই ভোর বেলায় উঠে আমাদের নিয়ে কত আমোদ করতে করতে গিয়েছিলেন, তা আজও আমার বেশ মনে আছে। তিনি বালকের কাছে বালক হতেন, যুবার কাছে যুবক হতেন, ছাত্রের কাছে শিক্ষক হতেন। আবার দরিদ্রের কাছে ধনী হতেন। তিনি আমাদের পানিহাটি গ্রামে 'কো অপারিটিফ এণ্টিম্যালেরিয়া সোসায়িটি' স্থাপন করেন, আবার পানিহাটি নিমতা পানাগড় প্রভৃতি স্থানে 'ম্যালেরিয়া নিবারণী' সভা স্থাপন করেন। তাঁর সেই নিঃস্বার্থ পবিত্র পরোপকার তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি দরিদ্রের পিতা মাতা হয়ে মর জগতে এসেছিলেন, মৃত্যুকালেও তাঁর ব্রত ভঙ্গ করেননি। ধন্য মহাপুরুষ আজ তোমার পদচিহ্ন লক্ষ্য ক'রে জগতে তোমার অনুশরণ করবার চেষ্টা বোধ হয় পানিহাটীবাসী ও আরও অনেকে করবার চেষ্টা করবে। ভাই থাঁদু ! তুমি শুধু একা পিতৃহীন হওনাই, আজ সারা পানিহাটিবাসী পিতৃহীন, আশাকরি তাঁর স্মরণার্থে আমাদের পানিহাটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে একখানি অয়েল পেন্‌টিং ফটো থাকিবে, কেন না বালকগণ এই পবিত্র মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখে তাঁর মতন হবার চেষ্টা করিবে।

আমি আজ তাঁর বালকবালিকা ও পরিবারের গভীর শোকে আমার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( ধুপে ),
রেঙ্গুন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

| ২৮শ বর্ষ<br>৪র্থ সংখ্যা | **ভক্তি**<br>ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। | অগ্রহায়ণ<br>১৩৩৬ |
|---|---|---|

# প্রাণের কথা

( শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত )

( ৩ )

পুড়ে ছাই হ'য়ে যাওয়া হৃদয়ে আমার
ভাবের কুসুম কত নানা বর্ণে ফোটে ;
কিন্তু রে জীবনটুকু ব্যর্থ আজি যার,
তার এ হৃদয়-ভাব বিড়ম্বনা বটে !
তার এ হৃদয়-ভাব বুঝিতে কে চায়,—
কে করে আগ্রহ তার কথা শুনিবারে ?
হৃদয়ের ভাব তার হৃদয়ে মিলায় ;
সে কেবল পায় মাত্র হেলা এ সংসারে !
ঘৃণা অবহেলা ল'য়ে আছে যে দাঁড়ায়ে,—
নিজের অদৃষ্ট ফল লইয়া নীরবে
শক্তি নাই যেতে যার এ দশা এড়া'য়ে,
শুনিতে যাহার কথা কেহ নাই ভবে ;
হায় সে দুর্ভাগা শুধু বিড়ম্বনা ফলে,—
আপন হৃদয়-ভাবে মত্ত কুতুহলে !

———

# মর্য্যাদা লঙ্ঘনের পরিণাম

পরিব্রাজক ভুলুয়া বাবার সদ্ভাব-তরঙ্গিনী হইতে )

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে, বেনাপোল পরিত্যাগ করিয়া হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে বলরাম আচার্য্যের গৃহে আসিলেন।

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥"

সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বলরাম আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। বলরাম আচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুর বলরাম আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে, গোবর্দ্ধন মজুমদার তাঁহার জন্য পৃথক ভজনযোগ্য পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বলরাম আচার্য্যের গৃহে তিনি ভিক্ষা ( সন্ন্যাসীর ভোজনকে ভিক্ষা বলে ) গ্রহণ করিতেন।

গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র রঘুনাথের তখন বাল্যকাল। বলরাম আচার্য্যের গৃহে তখন রঘুনাথ অধ্যয়ন করিতেন। সাধুতার জীবন্তমূর্ত্তি, পবিত্রতা ও প্রতিভার সমুদ্র হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। হরিদাস ঠাকুরও তাঁহার প্রতি স্নেহপূর্ণ ছিলেন।

হরিদাস ঠাকুরের এই কৃপাই রঘুনাথের ভবিষ্যৎ বৈরাগ্যের প্রধান হেতু,—বাল্যকালে নাম-প্রেমময় পরমভাগবত হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গলাভই তাঁহার শ্রীচৈতন্য প্রাপ্তির প্রধান হেতু। ইনিই পরিণত বয়সে বৈষ্ণব-জগতের সুপ্রসিদ্ধ মহাজন শ্রীল রঘুনাথ দাস। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥"

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই। তাঁহারা একদিকে যেমন প্রধান জমিদার, অন্যদিকে নবাব সরকারেও সেইরূপ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সমগ্র

রাজস্বের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পিত ছিল। নবাব সরকার হইতে এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে সম্মান সূচক "মজুমদার" এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। সাধারণ লোক তাঁহাদিগকে রাজা বলিত। রাজার মত তাঁহাদেরও সভা ও সভাসদ্ ছিল।

একদিন বলরাম আচার্য্যের অনুরোধে হরিদাস ঠাকুর হিরণ্য মজুমদারের সভায় গমন করিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই অত্যন্ত সম্মানের সহিতই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সভাসদ্‌গণের মধ্যে কেহ তাঁহার সাধুতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কেহ বা হরিনামের প্রভাব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কেহ বলিলেন, নাম হইতে পাপ ক্ষয় হয়; কেহ বলিলেন, নাম হইতে মোক্ষ হয়। নামের মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া নামময় হরিদাস ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাদের আলোচনায় যোগদান করিয়া নামের অপার মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আপনারা যে মোক্ষের কথা বলিতেছেন, তাহা হরিনামের আভাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষ লাভ নামের প্রধান মহিমা নহে, নামের বলে ভগবান শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে প্রেম-ভক্তির উদয় হয়, ইহাই নামের প্রধান মহিমা। নামের ফলে মোক্ষলাভ হয় বলিলে নামের মহিমা খর্ব্ব করা হয়।

"হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণ-পদে প্রেম উপজয়ে॥"

এই কথা বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এক শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক বাহ্যঃ॥

মুক্তি নামের প্রধান ফল নহে। তাই ভাগবত বলিতেছেন, ভগবানের নাম সাধনা যাহার ব্রত ভগবানের নামই তাহার প্রিয়। তিনি নাম

কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগ প্রাপ্ত হন। প্রেমের উদ্গমনে তাঁহার চিত্ত অধিকতর দ্রবীভূত হয়। তজ্জন্য তিনি গ্রহগৃহীত ব্যক্তির মত বিবশ হইয়া কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন চীৎকার, কখন নৃত্য করিয়া থাকেন। বলিতে বলিতে হরিদাস ঠাকুর শ্রীধর স্বামী কৃত পদাবলীর শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

অংহসংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণীরিবতিমির জলধির্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

এই শ্লোকের আবৃত্তি করিয়া আবেগ ভরে সভার পণ্ডিতগণকে ইহার ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ("হরেঃ জগন্মঙ্গলং নাম সকৃৎ উদয়াৎ তিমির জলধেঃ তরণীইব সকল লোকস্য অখিল অংহঃ সংহরৎ জয়তি।") সূর্য্য উদিত হইয়াই যেমন জগতের অন্ধকার রাশিকে ধ্বংস করিয়া থাকেন, সেইরূপ যে শ্রীহরির জগন্মঙ্গল নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই জীবের সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া যায়, সেই নাম জয়যুক্ত হউক।

এই বলিয়াই পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের আর এক শ্লোক বলিলেন—

"ম্রিয়মাণো হরের্নামগৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্॥

( 'ম্রিয়মানঃ অজামিলঃ অপি পুত্রোপচারিতং হরেঃ নাম গৃণন্ ধাম অগাৎ কিং উত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥" )

শ্রদ্ধা বিহীন অজামিল মরণ সময়ে পুত্রের নামে শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিয়া যখন বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছেন, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?"

হরি নামের আভাসেই মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ভক্তগণ সেই মুক্তি ও

প্রার্থনা করেন না। এই বলিয়া পুনরায় ভাগবত হইতেই শ্রীভগবানের উক্তি বলিলেন—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ॥"

( "মদ্ভক্তাঃ জনাঃ মৎসেবনং বিনা উদীয়মানঃ উত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামিপ্য, একত্বমপি ন গৃহ্ণন্তি।" ) ভগবান বলিতেছেন —আমার ভক্তগণ কেবল মাত্র আমার সেবাই প্রার্থনা করে, চতুর্ব্বিধা মুক্তি তাহাদিগকে দিলেও তাহারা গ্রহণ করে না। আমার সঙ্গে একলোকে বাস, আমার সমান ঐশ্বর্য্য, আমার সমান রূপ এবং আমার সমীপে অবস্থান অথবা আমাতে লীন হওয়া এ সকল কিছুই তাহারা প্রার্থনা করে না।

এই ভাবে প্রেমবিহ্বল চিত্তে হরিদাস ঠাকুর হরিনামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ছিলেন, আর তাঁহার অমৃতময় ব্যাখ্যা সকলে একাগ্রমনে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছিলেন। সহসা গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক একজন আরিন্দা ( রাজস্ব বাহকগণের জমাদার ) সভার মধ্যে উত্থিত হইয়া হরিদাস ঠাকুরের কথার প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। সে কিছু শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্নও ছিল; বয়সে যুবক এবং রূপবান তাই যেন স্বভাব একটু ধৃষ্ট ও চঞ্চল ছিল। শ্রীচরিতামৃতে আছে—

"ক্ষুদ্রহঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥

সে ভাবুকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল, "কোটী জন্ম তপস্যা করিয়া, বহু তপস্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাধকগণ যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না, এই বৈরাগীটা নামাভাসেই সকলকে তাহা দান করিয়া বেড়াইতেছে।

হরিদাস ঠাকুর তাহার এই ধৃষ্ট বচনে চঞ্চল হইলেন না। নম্র ভাবে স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—তুমি আমার সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিও

না। আমার নিজের কোন কথা ইহাতে নাই, শাস্ত্রেরই ঘোষণা আছে নামাভাসে মুক্তি হয়। ভক্তিরসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবে।

"ত্বৎ সাক্ষাৎ করণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্যমে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মান্যপি জগদ্গুরো॥"

হে ভগবন্! সাগর সংস্থিত ব্যক্তির পক্ষে গোক্ষুর খনিত গর্ত্ত মধ্যস্থ জল যেমন অত্যল্প বোধহয়, তদ্রূপ আপনার দর্শনে অপ্রাকৃত সুখ-সমুদ্র-সংস্থিত আমার পক্ষে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান সুখ বা ব্রহ্মানন্দও অত্যল্প বোধ হইতেছে। অতএব ভক্ত্যানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ কিছুই নহে। সেই ভক্তি নামেরই ফল। আমি শাস্ত্রের ঘোষণা অনুসারে পুনরায় বলিতেছি যে, ভক্তির নিকট মুক্তি কিছুই নহে, নামের আভাসেই মুক্তি ঘটিয়া থাকে।

হরিদাস ঠাকুরের ব্যাখ্যা শেষ হইলে গোপাল চক্রবর্ত্তী ধৃষ্টের মত বলিয়া উঠিল "যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তাহা হইলে তোমার নাক কাটা যাইবে। এই কথা তুমি সভামধ্যে স্বীকার কর।" হরিদাস ঠাকুর মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন "আচ্ছা, তাহাই হইবে, যদি নামাভাসে মুক্তি না হয় তাহা হইলে আমার নাক কাটিও।"

গোপাল চক্রবর্ত্তীর ধৃষ্ট বচন শুনিয়া সভার সমস্ত লোক হাহাকার করিয়া উঠিল। মজুমদার তাহাকে ধিক্ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমার মত ধৃষ্ট নাই।" বলরাম আচার্য্য তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—

"ঘট পটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান।
হরিদাস ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান॥
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ। (চৈঃ চঃ)

গোপাল চক্রবর্ত্তী কথা বলিয়া প্রকারান্তরে সভার সমস্ত লোকেরই অভিসম্পাতের তলে পতিত হইল। মজুমদার তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

সভার সমস্ত লোক হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পর্ব্বতের মত সহিষ্ণু, প্রসান্ত মহাসাগরের ন্যায় উদার হৃদয় হরিদাস ঠাকুর প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন—তোমাদের কোন দোষ নাই, ঐ ব্রাহ্মণ কুমার গোপালেরও কোন দোষ নাই, উহার তর্ক নিষ্ঠ মন। হরিনাম মাহাত্ম্য তর্কের গোচর নহে, যিনি ভক্তি যুক্ত হইয়া নাম আশ্রয় করেন নাম মাহাত্ম্য কেবল তিনিই জানিতে পারেন। ভগবান শ্রীগোবিন্দের নিকট আমি গোপালের এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমরা আপন আপন গৃহে গমন কর।” ধন্য ক্ষমা, ধন্য উদারতা, এত সদ্গুণ না থাকিলে ওরূপ দৃঢ় ভাবে নামের মহিমা ঘোষণা করিতে পারে কে?

নানাজনে নানাভাবে গোপালের সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। এদিকে তিন দিনের মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইল। তাহার সুন্দর শরীর ধ্বংশের মুখে গমন করিল; উন্নত নাসিকা গলিয়া খসিয়া পড়িল। সে সভামধ্যে হরিদাস ঠাকুরের নাক কাটিতে চাহিয়া ছিল, ঘটনাচক্রে তাহার নিজের নাকই কাটা পড়িল। ইহা সেই ভক্তজন-বল্লভ শ্রীগোবিন্দেরই বিধান। ভক্ত ক্ষমা করিলেও তিনি ক্ষমা করেন না।

“ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥ (চৈঃ চঃ)

তাই করুণাময় হরিদাস ঠাকুর গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিলেও ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। **মহতের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের শাস্তি কেহ এড়াইতে পারে না।** হরিদাস ঠাকুরকে অসম্মান করিয়া গোপালের শাস্তি হইল, ইহা দর্শন করিয়া জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইল কিন্তু হরিদাস ঠাকুর বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি যেন আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না।

জীবে দয়া যাঁর ধর্ম্ম, বিপ্রতনয় গোপালের দুঃখে তিনি যে মর্ম্মাহত হইবেন সে আর আশ্চর্য্য কি ? তিনি বলরাম আচার্য্যের নিকট অনেক করিয়া বলিয়া বিদায় লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শান্তিপুর আগমন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"বিপ্রের দুঃখ দেখি হরিদাস মনে দুঃখী হইলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥"

---

# ভক্ত মহিমা ও ভগবদ্ভজন

( শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায় লিখিত )

( ২ )

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত চতুর্ব্বিধ ভক্তগণই, শ্রীকৃষ্ণচরণে দাস্য ভক্তি প্রার্থনা করেন। কারণ জীবের স্বভাবই নিত্য কৃষ্ণদাস। যথা :—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস তাহা ভুলি গেল।
সে কারণে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥ ( চৈঃ চঃ )

শ্রীশ্রীসদ্গুরু বৈষ্ণব গোস্বামীর পাদপদ্মাশ্রয়ে দীক্ষা শিক্ষা লাভ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম যিনি যাজন করেন, তিনিই হইতে পারেন এহেন ভক্ত, কৃষ্ণদাস।

এই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ ভক্তগণ :—

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥

তাই ভক্ত কবি বন্দনা করিতেছেন :—

হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দি দন্তে ধরি ঘাস॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জীবশিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখ-নিঃসৃত মহা প্রেমময় শ্লোক দ্বারা আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন :—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগোঁ দাস্য ভক্তি দান।
আপনাকে করি সংসারী জীব অভিমান॥

জীব সর্ব্বদা সংসারী জীব অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ভক্তি প্রার্থনা করিবে এবং তাহার পদধূলি হইয়া থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর আর্ত্তনাদ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত অমূল্য শ্লোক :—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥ ( চৈঃ চঃ )

তিনিই একাধারে সাধু, বৈষ্ণব, ভক্ত, মহান্ত, ব্রাহ্মণ, দাস ও শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ শ্রীগুরু গোসাঁই, যিনি কায়মনো বাক্যে শ্রীগৌর-

কৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, জীববল্লভ শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শশধর শ্রীগৌরকিশোর সর্ব্ব শাস্ত্রবেদ পুরাণের মীমাংসা সার মহাবাণী শ্রীল রায় রামানন্দকে বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

ইহার উপর আর কি কথা আছে? শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর যবন কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে অতি ন জাতি ইত্যাদি বলিয়া দৈন্য করিতেছেন। তাই ভক্তবৎসল শ্রী গৌর ভগবান, ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন :—

এই মোর দেহ হইতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥ ( চৈঃ চঃ )

ভক্তবৎসল নিজ প্রিয় ভক্তকে এই মহাসত্য বাণী বলিয়া, জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, ভগবানের দ্বিতীয় দেহ ভক্ত। ভক্তের যে জাতি, কুল ভগবানেরও তাই। তাই ভক্ত মহাজন ব্যাসাবতার, নারায়ণীসুত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

জলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥ ( চৈঃ ভাঃ )

ভক্ত হরিদাস ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া দীন-দয়াল, পতিত পাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেছেন—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।

মহাবেদজ্ঞ, জ্ঞানবৃদ্ধ, ভক্ততাপস শ্রীশঙ্কর সদাশিবাবতার; অদ্বৈতপ্রভু, পিতৃশ্রাদ্ধায় শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে ভোজন করাইতেন আর বলিতেন :—

তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন॥　( চৈঃ চঃ )

ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাকৃপার লীলা কাহিনী, যিনি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে একাদশ পরিচ্ছেদে আস্বাদান করিয়াছেন; তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের ভক্তবৎসলতায়, প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গপদে মন প্রাণ বিকাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রাতুল চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, নয়নে মধুর রূপ-সুধা পান করিয়া, মুখে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিয়া, প্রেমিক ভক্তবৃন্দের প্রেম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভক্ত ঠাকুর হরিদাস ভীষ্মের ন্যায় মহাপ্রয়ান করিলেন। ভক্ত দেহ কোলে লইয়া প্রভু প্রেম-নৃত্যে আত্মহারা হইলেন; ভক্তবৎসল গৌর বিশ্বম্ভর হরিদাসের দেহ সমুদ্রে স্নান করাইয়া, সমুদ্রকে মহাতীর্থ করিলেন, আর হরিদাসের গুণ শতমুখে ভক্তগণের নিকট গাহিতে লাগিলেন। নিজ হস্তে সমাধি দিয়া পিণ্ডা বাঁধাইলেন আর স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া মহামহোৎসব করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল।
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥

আর দিবা নিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভক্তগণকে বলিতেন—

কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদেনী॥ ( চৈঃ চঃ )

প্রেমদাতা শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র ঠাকুর বৃন্দাবন দাস, স্বীয় প্রভুর আদেশে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায় লিখিয়াছেন—

জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদ বাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন॥ ( চৈঃ ভাঃ )

ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর আজীবন তিন লক্ষ ( ষোল নাম বাত্রিশ অক্ষর ) নাম, জপ ও কীর্ত্তন করতঃ প্রত্যহ মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করিতেন। বেনাপোলের জঙ্গলে ভজন-নিষ্ঠ হরিদাস ঠাকুরের ভজন নষ্টের জন্য সেই দেশাধ্যক্ষ রামচন্দ্র খাঁন একটী পরমা সুন্দরী বেশ্যা প্রেরণ পূর্ব্বক, তাহার মহাব্রতের পরীক্ষা করিয়াছিল, বৈরাগী হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ গুণে বেশ্যার

পুনর্জন্ম হইল। মহৎ সঙ্গের ও মহৎ কৃপার যে কি ফল তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সেই বেশ্যা। তিনি হরিদাস ঠাকুরের চরণে মস্তক বিক্রিত করিলেন। আর হরিদাস ঠাকুর তাহাকে উপদেশ করিলেন :—

ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লহ, তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥ ( চৈঃ চঃ )

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দীনাতিদীনহীনা সাজিয়া তিন লক্ষ নাম, ( "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, ॥" ) গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন :—

তুলসী সেবন করে চর্ব্বন উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হইল, প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥ ( চৈঃ চঃ )

অনন্ত ভুবন মোহিনী মায়াদেবী, বৈরাগী হরিদাসকে মোহিত করিতে গিয়া, ঠাকুরের দর্শনে ও ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইল এবং হরিদাস ঠাকুরের চরণে মস্তক লোটাইয়া বলিল :—

পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণ নাম নিতে॥
মুক্তি হেতু 'তারক' হয়েন রাম নাম।
কৃষ্ণ নাম 'পারক' করেন প্রেম দান॥
কৃষ্ণ নাম দেহ তুমি, মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও দিয়া এই প্রেম বন্যা

এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে, কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
উপদেশ লৈঞা মায়া চলিল পাঞা প্রীতি। ( চৈঃ চঃ )

হরিদাস ঠাকুরের ভজন কীর্ত্তন ছিল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র এবং কৃপা করিয়া জীবকে তাহাই উপদেশ দিতেন। কি ভাবে? না, "আপনি আচরিয়া করিতেন প্রচারের কার্য্য।" শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ, ঠাকুর হরিদাসকে বলিয়াছিলেন :—

সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥
প্রত্যহ করহ তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমা কথন॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু তুমি জগতের আর্য্য॥ ( চৈঃ চঃ )

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় দেহ, সর্ব্ব-বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞাতা ও প্রণয়ন কর্ত্তা সর্ব্বগোস্বামীগণাগ্রগণ্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সর্ব্বশাস্ত্র মীমাংসার বাণী "তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য"। অতএব যিনি কৃষ্ণ ভক্ত বৈষ্ণব, তিনি জাতি কুলাদির অতীত নিত্য শুদ্ধ চিরসত্য, অপ্রাকৃত, চিন্ময় বস্তু। তিনি যে কুলই পবিত্র করেন না কেন, তিনি সর্ব্বজগতের গুরু ও আর্য্য। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব নিরাকরণের ইহাই একমাত্র মহাজন নির্দ্ধারিত সুসিদ্ধান্ত ও সুযুক্তিপূর্ণ বিমল পন্থা।

নবকিশোর নটবর শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তারবিলাসে পূর্ব্ববঙ্গ হইয়া যখন পিতৃ-জন্মভূমি শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন ; তখন ভাগ্যবান তপনমিশ্র স্বপ্নাদেশে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট আগমন পূর্ব্বক, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিতে কৃপা-প্রার্থী হইলেন। রসিকশেখর, রঙ্গিয়া নিমাইচাঁদ উপদেশ দিলেন :—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নাম সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি দিনে নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পারহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যত কিছু বল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই শ্লোক নামাবলী হয় মহামন্ত্র।
যোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥ ( চৈঃ ভাঃ )

প্রেমের বন্যায় যখন "শান্তিপুর ডুবু ডুবু এবং নদে ভেসে যায়", তখন বিশ্বপাবন বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরচন্দ্র অনন্ত বিশ্ববাসীকে উপদেশ দিতেছেন :—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥ ( চৈঃ ভাঃ )

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া ও পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব ভক্তবৃন্দকে কৃপাদেশ পূর্ব্বক এবং প্রিয়তম ভক্তগণের দ্বারা যাহা আচার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র অবলম্বন সার ভজন প্রণালী। ইহার উপর আর কোন কথা নাই। আজীবন তিন লক্ষ হরিনাম ( মহামন্ত্র ) প্রত্যহ গ্রহণ করিয়া অন্তিমে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম জপিতে জপিতে শ্রীগৌর-চন্দ্রের রূপ-সুধা পান করিতে করিতে শ্রীগোলোক ধাম প্রাপ্ত হইলেন, ঠাকুর ব্রহ্ম হরিদাস।

অতএব রাসরস মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তনের চরম ফল হইল রাসরস সার রাইকানুর মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তি। তখন গোলোকাখ্য নবদ্বীপ যোগপীঠে তাঁহাকে বসাইয়া ধ্যান করেন ভক্ত :—

স্বধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতি বৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং,
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক মহাসদ্মসংঘৈঃপরীতম্।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ প্রণয়ভরলসৎ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যাভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপ মীড়ে॥
শ্রীমন্মৌক্তিক দামবদ্ধ চিকুরং সুস্মের চন্দ্রাননং,
শ্রীখণ্ডাগুরু চারুচিত্র বসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতম্।

নৃত্যাবেশ রসানুমোদ মধুরং কন্দর্প বেশোজ্জ্বলং,

চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজ জনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে ॥

ধ্যানান্তে প্রেমে গদ গদ হইয়া ভক্ত প্রণাম করেন :—

আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।

তস্মৈ মহাপ্রেমরস প্রদায়, চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥

যস্যৈব পাদাম্বুজ ভক্তিলভ্যঃ, প্রেমাভিধানঃ পরম পুমর্থঃ।

তস্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥

নমস্ত্রিকাল সত্যায় জগন্নাথ সুতায় চ।

সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ ॥

আর প্রাণ ভরিয়া ভক্ত প্রেমে জয় ধ্বনী করেন :—

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।

জীবগণ প্রতিকর শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ( চৈঃ ভাঃ )

ভক্ত তখন গৌর নাম প্রেম, লীলা ও সেবানন্দে আত্মহারা হইয়া যান। গৌর-হরি নামের এতই মাধুর্য্য যে, জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ মাত্রেই ভক্তের অশ্রু, কম্প পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।

হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥

*　　*　　*

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,

তারে মুঞি যাই বলিহারি।

গৃহে বা বনেতে থাকে,　　হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে

নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।

*　　*　　*

গৌরশবদ গৌর সম্পদ, যাহার হিয়ায় জাগে।
নরহরি দাস, অনুগত ভাষ চরণে শরণ মাগে ॥

* * *

প্রেমানন্দ কহে মন, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এক ঠাঁই গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥

গৌরভক্ত মহাজনগণ প্রেম ভরে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন :—

জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥
সর্ব্ব অবতার সার করুণা নিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যার দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাহা বিনা কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়।
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥
গৌরনাম হরিনাম একই যে হয়।
ভাগবত বাক্য এই কভু মিথ্যা নয় ॥
কর কর ওরে মন নাম সংকীর্ত্তন।
পাপ তাপ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ॥ ( শ্রীগৌর শতনাম )

শ্রীভগবানের অন্য নামাদিতে অপরাধের বিচার আছে। নাম গ্রহণ করিলেও প্রেম হবে না অপরাধী জীবের। কিন্তু :—

গৌর নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম নিলে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥
অতএব পুনঃ কহি ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ ( চৈঃ চঃ )

প্রেমদাতা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ রায় অভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ অর্থাৎ বিলাস দেহ। যথা—শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে ঠাকুর লোচন দাসের বাণী—

অভিন্ন চৈতন্য বন্দো ঠাকুর অবধুত।
শ্রীনিত্যানন্দ বন্দো রোহিণীর পুত॥

নীলাচল ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপনে কত মর্ম্ম কথা কহিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড় দেশে পাঠাইলেন এবং অবিচারে আচণ্ডালে প্রেম-ভক্তি দান করিবার আদেশ করিলেন। আর বলিলেন, "আমা হইতে না হবে যাহা, তোমা হইতে হবে তাহা, প্রেমদাতা পরম দয়াল।" দুই ভ্রাতার গুপ্ত পরামর্শের অভিপ্রায়, নিত্যানন্দের প্রচার কার্য্য দেখিয়া ভক্তগণ ধরিয়া ফেলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥

*　　*　　*

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেম ভক্তি করিহ প্রকাশে॥

সর্ব্বযুগ সার ধন্য কলিযুগ, কারণ এহেন যুগে ভব-পারের কাণ্ডারী হইলেন, পরম দয়াল প্রেমদাতা নিতাইচাঁদ। প্রেমের ভাণ্ডারী নিতাই,

গৌড়দেশ প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন, আর যাকে তাকে ব্রজের প্রেম বিলাইতে লাগিলেন। যথা প্রাচীন পদে—

"ধর নাও সে কিশোরীর প্রেম, নিতাই ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়॥
প্রেমে, শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।
প্রেমে দুকুল ভেঙ্গে ঢেউ লাগিছে গোরাচাঁদের পায়॥

সেই গুপ্ত পরামর্শের ফল শ্রীশ্রীগৌর নাম প্রেম ও ভজন প্রচার করিতে লাগিলেন শ্রীনিত্যানন্দ, প্রেমময় ভক্তবৃন্দ সঙ্গে। তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবত-কার লিখিয়াছেন—

সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ মুখে অন্য॥
রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য-প্রীতি॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য অবতার॥

শ্রীঅনন্ত, বলরাম, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মণ শেষশায়ী নারায়ণাদির সম্মিলিত প্রেম-ময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গাগ্রজ বিশ্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের মহিমা বেদ পুরাণ, স্মৃতি, আগম, নিগম, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির অতীত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলেন—

নিতাই পদকমল, কোটী চন্দ্র সুশীতল,
সে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

নিতাইপ্রেমে আত্মহারা গোরারায় কি করিতেছেন? যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
গৃহ্লীয়াৎ যবনী পাণিং বিশেদ্বাশৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥
মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র॥

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ প্রিয়তম, অভিন্নদেহ, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, গৌরনাম প্রেম ও ভজন প্রচারের হইলেন গুরু। শ্রীগৌরভক্ত মহাজন পদকর্ত্তাগণ নিত্যানন্দের আচার ও প্রচার কাহিনী সংক্ষেপে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ॥
যেনা লয়, তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি॥ (প্রাচীন পদ)

অন্যত্র— অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিছেন বিলাইয়া॥

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলায় লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সে-ই ভবে এল আর গেল॥

মহামন্ত্র হরিনাম সহ গৌর নাম, প্রেম ও ভজন দানকারী নিত্যানন্দ সঙ্গে, গৌরচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া, যেন জন্মে জন্মে মহাজনের ভাষায় গাহিতে পারি—

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
অসার সংসার সুখে দিয়া যেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু॥

অবশেষে শাস্ত্রদর্শী মহারসিক শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—

অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

*　　*　　*　　*

অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ।

—০—

## গান

কোথা তুমি ওহে পরমেশ!
বুধগণ বলে তুমি
বিরাজিত সব ঠাঁই—
সে জ্ঞানের নাই মম লেশ॥
ওহে অন্তরযামী
তুমি যে জগতস্বামী
এস ধরি নটবর বেশ।—
কোথা তুমি ওহে পরমেশ!
দেখা যদি নাহি দাও
হেসে কথা নাহি কও
দুখের ত হবে নাকো শেষ।
কোথা তুমি ওহে পরমেশ!

সেবক
শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# শ্রীল বেদগর্ভ আচার্য্য ঠাকুরের শ্রীপাট

"কৈয়ড় গ্রামেতে বেদগর্ভ পরকাশ।"

( অভিরাম দাসের পাট পর্য্যটন )

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রায়না থানার অধীনে শ্রীল বেদগর্ভ ঠাকুরের শ্রীপাট কৈয়ড় গ্রাম। ইহা বর্দ্ধমান সহর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। B. D. R. লাইট রেলে কৈয়ড় ষ্টেশন আছে, ষ্টেশন হইতে শ্রীপাট বা মূল শ্রীমন্দির ৩।৪ মিনিটের পথ। কলিকাতা হইতে দর্শনে যাইতে হইলে E. I. R. বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামিয়া বড় নদী বা দামোদর পার হইয়াই মোটর সার্ভিসে B. D. R. সেহারা বাজার ষ্টেসন, ঐ সেহারা বাজারের পরই কৈয়ড় ষ্টেশন।

শ্রীল বেদগর্ভ ঠাকুর, শ্রীশ্রীঅভিরাম গোস্বামীর যে ২৫॥০ জন মর্ম্মী ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে একতম ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কৈয়ড় গ্রামকেই মনোনিত করিয়া ঐ স্থানেই শ্রীপাট করেন। এবং শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করতঃ বৃন্দাবনের অনুরূপে সেবা প্রকাশ করেন। ইঁহার বংশধর গোস্বামী প্রভুগণ অদ্যাপিহ ঐ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের শিষ্য শাখাও বিস্তর।

গত ১৩৩৫ শ্রাবণ মাসে শ্রীঝুলন যাত্রা সময়ে পুঁথি অন্বেষণে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এ অধমের শ্রীপাট দর্শনের সৌভাগ্য হয়। অধিকন্তু ঝুলনপর্ব্বই শ্রীপাটের প্রধান পর্ব্ব বা বার্ষিক উৎসব। এ জন্য বহু দূরাগত ভক্তের দর্শন ও শ্রীচরণ-রজপ্রাপ্তির মহা মহা সৌভাগ্যও লাভ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের অতি নিকটে নাতিদীর্ঘ একটী ভগ্ন মন্দির দেখিলাম, উহাই প্রাচীন মন্দির। বর্ত্তমানের মন্দিরটীও প্রাচীন। সংস্কারাভাবে ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। মন্দিরশীর্ষে একখানি প্রস্তর ফলক আছে শুনিতে পাইয়া বংশ শরান সংযোগে এ স্থূলবপুকেও বহু কষ্টে উপরে তুলিয়া ছিলাম। উক্ত প্রস্তর ফলকে সন তারিখ কিছুই পাইলাম না। অনুমান ২শত বৎসরের প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে ;—

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র
জয়তি। শ্রীরাধিকে চ
শ্রীমদন মোহন চ শ্রীজয়তি
শ্রী অভিরাম মালিনী জয়তি।
শ্রীমদন মোহন চ জয়তি

মন্দির অভ্যন্তরে সিংহাসন মধ্যে দক্ষিণে শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ, তৎ বামেই শ্রীশ্রীবিজয়গোপাল জীউ নামক শ্রীশ্রীগোবিন্দ বিগ্রহদ্বয় বিরাজ করিতেছেন। তৎভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দ্দন প্রভৃতি শ্রীশিলা ও ধাতুময় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিও আছেন। শ্রীশ্রীমদনগোপালের বা শ্রীশ্রীবিজয় গোপালের বামে শ্রীমতী নাই। এইরূপ ভাবেই পূর্ব্বাপর সেবা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীবিগ্রহের সেবা ঐশ্বর্য্য ভাবে না হইয়া মাধুর্য্য বা আপ্তবৎ ভাবে হয় দেখিয়া কাঙালের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল। পল্লীগ্রামে আমাদের সাধারণ খাদ্য মুড়ি,—দেখিলাম মুড়ি ও মুড়াকি দিয়া প্রভুর বাল্যভোগ হইয়াছে।

মন্দিরের সম্মুখেই একটী আটচালা,—উহাতে নাট-মন্দিরের কার্য্য সমাধা হয়। শ্রীপাটের জনৈক শিষ্য শীঘ্রই এই আটচালাটীকে সংস্কার করিয়া দিবেন বলিয়া বাসনা করিয়াছেন। আটচালার নিকটেই একটী প্রাচীন বকুলবৃক্ষ রাশি রাশি কুসুমভারে শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক সৌরভান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এই বৃক্ষটীতে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনিলাম। রাধাকুণ্ড প্রভৃতি নামে ২।১টী পুষ্করিণীও আছে।

ইহা ব্যতিরেকে এই গোস্বামী প্রভুদের আরও ২টী শ্রীমন্দির আছে; উহা শ্রীশ্রীবলদেবের বাটী বলিয়া খ্যাত। শুনিলাম বেদগর্ভ ঠাকুরের বংশধর দিগের মধ্যে বিষয় বণ্টনের সময় ২টী ভাগ হয়, একদিকে কেবল মাত্র শ্রীবিগ্রহ ও অন্যদিকে সমুদয় সম্পত্তি। যাঁহারা সম্পত্তি গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরই ঐ শ্রীবলদেব জীউ। উহা ও প্রাচীন মন্দির। শ্রীঝুলনে বার্ষিক উৎসব হয়। বলদেব মন্দিরের গোস্বামী শ্রীপাদ করুণাময় কাব্যতীর্থ ও সেবায়েত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় হওয়ায় তাঁহারা শ্রীপাটের ও বেদগর্ভ প্রভুর বিস্তৃত বিবরণ, বংশ তালিকা প্রভৃতি আমাকে প্রদান করিবেন বলিলেন। (এখনও প্রাপ্ত হই নাই।)

শ্রীগোপাল মন্দিরের গোস্বামীগণের মধ্যে শ্রীপাদ তিনকড়ি গোস্বামী প্রভুই বর্দ্ধিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। শ্রীপাদ জ্যোতির্ম্ময় গোস্বামী প্রভুর সহিত পরিচয় করিয়া জানিতে পারিলাম তাঁহার গৃহে বহু বৈষ্ণব পুঁথি রক্ষিত আছে। তিনি অন্য এক সময়ে আমাকে ঐ সকল পুঁথি দর্শন করাইবেন বলিলেন। "অভিরাম পটল" নামক একখানি অপ্রকাশিত পুঁথি তিনি তাঁহার শিষ্য হিতবাদীর প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত নটবর দাস দ্বারা মুদ্রিত করিবার ঠিক্ করিয়াছেন বলিলেন। এ দেশে

অনেক স্থানেই পুঁথি আছে, এবং পুঁথির প্রতি মহাশয়কে নিত্যই ফুল জল চাপাইয়া পুঁথিত্ব লোপ হইয়া পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইতেছে দেখিলাম।

এই গ্রামে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় বা মাষ্টার মহাশয় নামে এক পরম ভাগবত ছিলেন। বৎসরাধিক কাল হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। সাধারণে তাঁহার সাত্ত্বিক ভাবাবলী বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে উন্মাদ-গ্রস্থ বলিয়াই অভিহিত করিতেন। গ্রামবাসী ২।১টী শিক্ষিত ভক্তের মুখে তাঁহার অপরূপ কাহিনী শ্রবণ করতঃ পরিতৃপ্ত হইলাম। প্রকৃতই তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী গীত সংগ্রহ করিয়াছি। আগামীবারে প্রকাশ করিব। এই গ্রামে আরও কয়েকটী মহা ভক্তের সাক্ষাৎ ও পদরেণু প্রাপ্তির মহা সৌভাগ্য হইয়াছিল।

ঝুলন উৎসবান্তে শেষরাত্রে গোপাল মন্দিরে একটী দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। যাঁহারা বিষয় না লইয়া কেবল শ্রীশ্রীগোপালকেই লইয়াছিলেন, সেই প্রভুপাদের বংশধরগণ সকলেই একত্রিত হইয়া নাট-মন্দিরে শ্রীশ্রীমদনগোপালকে বক্ষে করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছেন—আর গাহিতেছেন—"ধন আমাদের মদনগোপাল, প্রাণ আমাদের মদন গোপাল" ইত্যাদি।

পরিশেষে একটী বিসদৃশ আচার দর্শনে প্রাণে বড়ই বেদনা হইল। শ্রীশ্রীগোপাল জীউর মহাপ্রসাদ ভোজন সময়ে প্রভুপাদগণ তৎসঙ্গে মৎস্য ভোজন করেন। শুনিলাম যাঁহার পালা পড়িবে তাঁহাকে মৎস্য সংগ্রহ করিতেই হইবে। নতুবা ব্রাহ্মণ ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয়জয়কার দিনে এই আচরণটীকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবার জন্য আমরা কৈয়ড়ের ভক্তিভাজন গোস্বামী প্রভুদের শ্রীচরণে অনুনয় জ্ঞাপন করিতেছি। ছোট মুখে বাধ্য হইয়া বড় কথা বলিতে হইল, প্রভুপাদগণ ক্ষমা করিবেন। ইতি

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# চয়ন

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক, কর্ম্মী ও ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বসু বি-এ, "সাধনা" পত্রিকায় শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন নামে একটী প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন, উক্ত প্রবন্ধে তিনি শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য দিয়াছেন ভক্তের পাঠকগণকে আমরা তাহা উপহার দিলাম। ঐ মন্দিরের সংশ্লিষ্ট শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের প্রিয় শিষ্য স্বধামগত সাধু নিত্যানন্দ দাসের অক্ষয় কীর্ত্তি সেবাশ্রম ও মাতৃ-মন্দির অতি সুন্দর ভাবে কার্য্য করিতেছেন। বারান্তরে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশবাবু লিখিয়াছেন—"তারপর নূতন প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরবাড়ী গুলির মধ্যে নিত্যধামগত শ্রীরাধারমণ চরণদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত আশ্রম। এ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে বিশেষ ক'রে লেখা দরকার; কারণ, এ আশ্রমটির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যান্য নূতন প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কোনটিতেই তাহা নাই। ধীরে ধীরে তাহা বলিতেছি।

এই আশ্রম সেবাশ্রম বা বাগানবাড়ী ব'লে প্রসিদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাবে যিনি অনেক সময় আবিষ্ট থাকতেন, সেই চরণদাসবাবাজী মহাশয় বা উড়িষ্যায় যিনি বড় বাবাজী-মহাশয় বলিয়া পরিচিত তাঁর সুশিক্ষিত ও সুপরীক্ষিত তিন শিষ্যের মুখে, বুকে ও বৈরাগ্যে নিজেকে রেখে যেদিন তিনি নিত্যধামে চলে গেলেন, সে দিনের সেই দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তিন দিক্‌পাল এই আশ্রম গঠনে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্বেই আলোচনা ক'রেছি—রূপের সঙ্গে ভাবের একটা নিত্য-সম্বন্ধ আছে। নারীর মূর্ত্তি সেবার মূর্ত্তি—স্নেহ বাৎসল্য তার বসন ও আভরণ, ভক্তি বা সেবা তার প্রাণ। বড় বাবাজী-মহাশয় এই অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার ক'রে এক অপরূপ বাৎসল্যময়ী মূর্ত্তি ক'রে এই ললিতাসখীকে গ'ড়ে আশ্রমের ভিত্তি গেড়ে গেছেন, আর অবিরাম নয়নের জলে ভাসা, নিরভিমান ব্যাকুল আর্ত্তিভরা প্রেমিক পুরুষ, কণ্ঠে যাঁর সুধা ক্ষরে, করুণ কীর্ত্তনে যাঁর ক্রূর সরল হয়, অহঙ্কারী অভিমান ভোলে, সেই রামদাস বাবাজীকে এর সেবক-সংগ্রহে পোষণ, পালনের ভার দিয়ে গেছেন, আর ঐ বৈরাগ্যের পরম উজ্জ্বল গুরুভক্তির পরমকাষ্ঠা বৃদ্ধ কোমল গোবিন্দ দাদাকে এর প্রবেশদ্বারে ভোগবিলাসের পথরোধ ক'রে প্রহরায় রেখে গেছেন।

এ আশ্রম পণ্যশালা নয়, প্রেম এখানে বিকায় না, এখানে বিলায়—বিতরিত হয়।

এখানের আদর্শ অভিমানশূন্য নিতাইচাঁদের প্রেম বিতরণ। ঠাকুর তাঁরই পাশে, আচণ্ডালে প্রেম দেওয়ায় শচীর নিমাই। কৃষ্ণের রসিকশেখরতা এখানে ধ্যানের আস্বাদনের বস্তু, আর তাঁর পরম কারুণ্য শ্রীনিতাইচাঁদের ভাণ্ডার থেকে সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করাই ইহাদের কার্য্য। গৌড়ের হৃদয়দেবতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কাজ এঁরা নিয়েছেন ব'লে যে, শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীপ্রভুদের সংবাদ রাখেন না তা নয়। সার্দ্ধ চারিশত বৎসর পরে, প্রেমের ভরে "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি" তার পুনরভিনয় দেখ্‌বার যদি কারও সাধ থাকে, জাতি আর বংশের দারুণ আভিজাত্য মানুষ কেমন করিয়া ভুলিতে পারে, ভজনের ও বিষয় ত্যাগের কঠোর অহঙ্কারের গ্রন্থি কি করিয়া খুলিয়া মানুষ দৈন্যসম্পদে সুন্দর মধুর হয়, তা যদি কেউ দেখ্‌তে চান, তাহ'লে চরণদাস বাবাজীর

গঠিত ও প্রবর্তিত, রামদাস বাবাজীর চোখের জলে সিঞ্চিত ও বর্দ্ধিত, ললিতাসখীর প্রেম-সেবায় পুষ্ট ও গোবিন্দদাস বাবাজীর বৈরাগ্যের আদর্শে রক্ষিত এই "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম প্রচারকারী বাঙ্গালীর চিরবৈশিষ্ট্য মহতী উদারতাসম্পন্ন নবদ্বীপের এই আশ্রমে বড় বাবাজীর স্মৃতিপূজা উৎসবে একবার যোগদান করিবেন।

এখানে বড় বাবাজীর দীর্ঘ বিগ্রহ ও পট বর্তমান, বলাগড়ের গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন গৌরনিতাই বিগ্রহ এবং বৃন্দাবনকুঞ্জের রাধাকৃষ্ণ আছেন। সবই সুন্দর দর্শন। বলাগড় হইতে ঐ বিগ্রহদ্বয় কিরূপে এখানে আসিয়াছেন সে এক বিস্তৃত অধ্যায়। সেখানে নিয়মিত সেবা হইতেছিল না। সে সেবককে আমি বিশেষরূপে বহুদিন হইতেই জানি এবং সেখানকার শ্রীযুক্ত রাখাল সরকার নামক ভদ্রলোকের মুখে—অকস্মাৎ এক দীর্ঘ নৌকা কোথা হইতে আসিয়া বিগ্রহ নবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়,—সে সমস্ত শুনিয়াছি। বাস্তবিক কথা এই যে, হৃদয় শুদ্ধ হ'লে তার আকর্ষণে ঠাকুর যেথাই কেন থাকুন না, না এসে থাকতে পারেন না। আশ্রম-মন্দিরের পবিত্রতা, সেবকের আর্ত্তি দেখে ঠাকুর নিজেই এসে হাজির হ'ল। চাই কেবল তাঁকে পাবার জন্য পবিত্রতা, সাধনা ও ব্যাকুলতা।

এঁরা বৈষ্ণব, সকল বৈষ্ণবের ন্যায় আমার প্রাণের বন্ধু, এ ছাড়া এঁদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক বা সংশ্রব নাই। কিন্তু এঁদের সঙ্ঘগঠনের যে নীরব সাধনা লক্ষ্য করিতেছি, বাঙ্গালা বা বাঙ্গালার বাহিরে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া, পত্রিকা ছাপাইয়া আর পরপক্ষকে গালাগালি দিয়া যাঁহারা দলবৃদ্ধি করিতেছেন, এ দুয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান রহিয়াছে। ইঁহাদের সাধনা ভারতীয় প্রচারের পন্থা, গৌরনিতাই-নির্দ্দিষ্ট প্রেমে হৃদয় জয়; আর অপর স্থানের সাধনা পাশ্চাত্য, advertisement দিয়া এবং

দৃপ্ত জ্ঞানাভিমানের নিষ্ঠুর অস্ত্রে অপরের দোষ-দর্শনরূপ হীনতা জাগাইয়া দেওয়া। ইঁহাদের পথ—নিজে কাঁদিয়া পথের কাঙ্গাল সাজিয়া কাঁদাইয়া বাহুর আলিঙ্গনে প্রাণ-মন কাড়িয়া শ্রীগৌরচরণে নিবেদন করা, অপরের পথ দাম্ভিকতা মাখা মুখ লইয়া রঙ্গীন বেশভূষার পারিপাট্য লইয়া সকলের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া এবং রম্য, হর্ম্ম্য, তাড়িৎ পাখা, মোটর গাড়ী প্রভৃতি আধুনিক কালের বড় বড় ভোগ্যসামগ্রীর প্রলোভন দেখাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়ের ন্যায় প্রথমের মধ্যে তেমন জাকজমক নাই সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় বৈধমার্গের ন্যায় কেবল বাহ্য আচরণ, স্বার্থসাধনা ও বড় জোর শুধু কর্ত্তব্য বুদ্ধিযুক্ত কিন্তু প্রথম রাগমার্গের ন্যায় প্রেম-অনুরাগের মধু গন্ধে ভরা, বিধিনিষেধের তীব্র কোলাহল সেখানে জ্বালার সৃষ্টি করে না।

শ্রীচৈতন্যের দিগ্বিজয়ের ধারা ও শ্রীনিতাইচাঁদের প্রেম-প্রচারের পন্থা যাঁরা লক্ষ্য ক'রেছেন, তাঁরা দেখেছেন—অহঙ্কার-অভিমান, জ্ঞানগরিমা সেখান থেকে চির-নির্ব্বাসিত। তাই ব'লে কি সার্ব্বভৌম বিজয়কারীর জ্ঞান ছিল না, প্রকাশানন্দের প্রবোধদাতার কি ধৈর্য্যসম্ভারের কোন চ্যুতি হ'য়েছিল—কোন নিন্দা করার প্রয়োজন হয়েছিল কি? হৃদয়জয়ের পন্থা প্রেম আর অশ্রু গালাগালি নয়, লাঠি নয়। লাঠি দিয়ে শাসনে রাখা যায়, কিন্তু বাগে পেলেই আবার ফোঁস ক'রে উঠ্‌বে।

আর এককথা—শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের প্রচারের পন্থা। শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত ধর্ম্মের সত্যগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে, যাঁরা এই সম্প্রদায়ের স্তম্ভ গেড়ে গেলেন, তাঁদের জীবনেও দেখুন, জ্ঞানভক্তির পবিত্র সঙ্গমে কি মধুর, কি সুন্দর। আছে কি সেখানে অভিমান-অহঙ্কারের দম্ভভরা কটু-বাণী বা কশাঘাত? আছে কি সেখানে পরব্রণ-অন্বেষণ-রূপ মক্ষিকাবৃত্তি?

কিন্তু হায়! আজ সে আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষায় পুষ্ট দেশ-বাসীর হৃদয় থেকে মুছে যাচ্ছে। তাদের অন্ধ অনুকরণ ক'রে ধর্ম্মজগতেও

ধর্ম্মের নামে ভোগ-বিলাসের তাণ্ডব নৃত্য দেখা দিয়াছে—অবশ্য রাজনৈতিক পরাধীনতা যে এর মূল কারণ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরাধীন-জাতির দাসসুলভ মনোবৃত্তিতে সুস্থবুদ্ধির উদয় হওয়া কঠিন। হিংসা, দ্বেষ দলাদলি প্রভৃতি সমস্তই পরাধীনতার সন্তান-সন্ততি।

যাক্, নবদ্বীপের এই আশ্রমে বিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তও আছেন, তাঁদের মুখে বৈষ্ণবদর্শন ও অন্যান্য দর্শনের মীমাংসা সিদ্ধান্ত শুনবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছে, তাঁরা এ কথা ভাল ক'রেই জানেন।

---

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

# প্রেমানন্দ-সংবাদ

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা—তখন বৈশাখ মাস, মধ্যাহ্ন কাল, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ-প্রখর মার্ত্তণ্ড আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া জীবকুলকে উত্তপ্ত করিতে উদ্যুক্ত। যদিও মধ্যে মধ্যে মৃদুমন্দ গতিতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে জীবের শান্তি হইতেছে না, বরং সূর্য্য-কিরণ-জনিত অসহ্য উত্তাপ জানাইয়া জীবগণকে অধিকতররূপে কষ্টই প্রদান করিতেছে। রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায় ইতঃস্তত বিচরণাক্ষম পক্ষিকুল অপেক্ষাকৃত সুশীতল বৃক্ষশাখায় পত্রান্তরালে বসিয়া ধীরে ধীরে কাতরকণ্ঠে আপন আপন অসহ্য বেদনা জানাইয়া যেন সেই সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরির নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতেছে। বিরাটকায় বৃক্ষরাজি সাধু পুরুষের ন্যায় নিজে প্রখর উত্তাপে উত্তাপিত হইয়াও ধীরভাবে আশ্রিতজনের কথঞ্চিৎ শান্তি সাধনে তৎপর। কামনা-সক্ত মানবনিচয় এই নিদারুণ উত্তাপে উত্তাপিত হইয়াও নিজ নিজ কামনা পূরণের জন্য আপনাপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে ছুটিতেছে, অত্যন্ত পিপাসায় কাতর ব্যক্তির ন্যায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোগপিপাসু নরনারী আকুল প্রাণে ব্যাকুল হইয়া ভোগের আশায় ছুটিতেছে। দারুণ গ্রীষ্ম-তাপে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর, অবসন্ন দেহ তথাপি আশা পূরণের জন্য পাগল হইয়া

ছুটিয়াছে। সকলেই উত্তপ্ত, সকলেই ব্যস্ত, সকলেই হতশ্বাস কাহারও মুখে শান্তির স্নানির্ম্মল চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। পরস্পর পরস্পরকে আপন আপন দুঃখের বিষয় জানাইয়া যদিও কথঞ্চিৎ শান্তি উপভোগ করিতেছে, কিন্তু সেও ক্ষণস্থায়ী ; পরক্ষণেই আবার শত গুণ দুঃখ আসিয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিতেছে। কেহ বা বৃক্ষতলায় বসিয়া, কেহ বা ভগ্ন অট্টালিকার ছায়ায় বসিয়া আবার কেহ বা দারুণ গ্রীষ্ম-তাপে তাপিত হইয়া পথ চলিতে চলিতে কোথায় যাইব, কোথায় গেলে অভাব দূর হইবে, যন্ত্রণার অবসান হইবে, চিরশান্তি লাভে জীবন ধন্য করিতে পারিব, এইরূপ নানা ভাবনায় অধীর। কি গৃহে, কি প্রান্তরে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কি আশ্রয়ে, কি নিরাশ্রয়ে, সকলেই প্রখর মার্ত্তণ্ড-তাপে উত্তপ্ত—ব্যথিত—ক্লিষ্ট।

প্রকৃতিদেবী যখন এইরূপ ভাবে জীবগণকে লইয়া নানা ভাবের খেলা খেলিতেছেন,সেই সময় জনৈক তত্ত্বদর্শী সাধু পুরুষ গুন্ গুন্ স্বরে আপন মনে নিম্নলিখিত গানটী গাহিতে গাহিতে একটি বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন।

"ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ
উঠ্‌ছে এই দিল্-দরিয়ায়।
কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা
মনে মনে মন-কলা খায় ;—
কখন পাতসা উজির, কোটাল নাজির,
কখনও ফকির হ'য়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখনও কাঙ্গাল,
কখন অট্টালিকা গাছের তলায় ;—
ওরে তোর মনের মাঝে হাসি-কান্না
ঘর-কন্না এই সমুদায়॥

ওরে ভাই! মনের কথা, যথা তথা,

বল্লে পরে লোকে ক্ষেপায়;—

এ ক্ষেপা কে নয় রে ভাই মনের কথা

বল্লে পরে সব জানা যায়॥

পাগল কয় যে জন মোরে, পাগল ক'রে

মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়,—

যদি সেই পাগল করা পড়ে ধরা

(তবে) পাগল হওয়া সফল যে হয়॥

মহাপুরুষ আপন মনে এই গানটী গাহিয়া কিছু সময় নীরব রহিলেন, পরে আবার প্রাণের আবেগে অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হায় হায়! সংসারে সকলেরই হাহাকার, সকলেরই অভাব, সকলেই কি যেন এক বহুমূল্য রত্ন হারাইয়া দিবানিশি তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত।" আবার কিছু সময় পরে বলিতে লাগিলেন,—"ইহারা কেন ব্যস্ত? কিসের অভাবে ইহাদের এত যন্ত্রণা? যে বস্তু লাভ করিলে, যাহার দয়া হইলে জগতের যাবতীয় জীব সর্ব্বদা সদানন্দে থাকিতে পারে, সকল অভাব দূর করিতে সমর্থ হয়, ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সন্ধান জানে না, বা জানিতে চাহে না; নতুবা কি আশ্চর্য্য যে, যাহার কিছু নাই, সেও ব্যস্ত, আবার যাহার অতুলনীয় বৈভব, সেও ব্যস্ত; যাহার আপন বলিতে কেউ নাই, সেও অস্থির, আবার যাহার পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিজন-পরিবৃত সংসার সেও অস্থির। অনন্ত লীলাময়! ধন্য তোমার লীলা।"

মায়াময় সংসারের এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সরল দয়ার্দ্রচিত্ত মহাপুরুষের প্রাণ ব্যাকুল হইল। তিনি প্রাণের আবেগে সর্ব্বসন্তাপহারী শ্রীহরির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে করুণাময় দীনবন্ধু! এই সন্তপ্ত জীবগণের প্রাণে শান্তি দাও। নতুবা ইহারা বহু

জন্ম ঘুরিয়া, এমন সাধন-ভজনোপযোগী সুদুর্লভ মানব-দেহ পাইয়াও শান্তি পাইতেছে না, বা শান্তি লাভের জন্য যত্ন করিতেছে না। ইহাদের প্রাণে তীব্র বৈরাগ্য দাও, জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দাও; সেই সুপবিত্র আলোকে তোমার সর্ব্বব্যাপী ভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া জীবন ধন্য করুক। দয়াময়! ইহাদিগকে তোমার অমৃতোপম ভালবাসা বিশেষ ভাবে অনুভব করাইয়া দাও। কলিকবলিত দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়কিঙ্কর মৃতপ্রায় জীবের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টিপাত কর।"

এই ভাবে প্রাণবল্লভ শ্রীহরির নিকট জীবহিতৈষী সমাগত মহাপুরুষ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় সুমধুর "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পাগলবেশী এক যুবা পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। জীবের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান-হারা মহাপুরুষ প্রাণারাম সুমধুর 'হরি-বোল' ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সচকিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটী তরুণবয়স্ক যুবক উন্মাদের ন্যায় হাসিতেছে। পাগলবেশী যুবকটী মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে, মহাপুরুষ "আনন্দে থাক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। যুবকটীও কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া উপবেশন করিল।

কাহারও মুখে কথা নাই, দু'জনেই নীরব; যেন কতকালের সঞ্চিত আশা এতদিনে পূর্ণ হইল ভাবিয়া উভয়েই আনন্দে অধীর। কিছু সময় এই ভাবে গত হইলে মহাপুরুষ যুবকটীর আপাদ-মস্তক বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রখর রৌদ্রে ছুটিয়া আসিয়া সে নিতান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে যেন ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছে। প্রবল পবনবেগে দোদুল্যমান কদলীতরুর ন্যায় সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহভরে বলিলেন,—"বৎস! স্থির হও; রৌদ্রে তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে, একটু বিশ্রাম কর।

আচ্ছা বৎস! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায়ই বা যাইবে? আর তোমাকে এরূপ চঞ্চলই বা দেখিতেছি কেন?”

মহাপুরুষের কথা শুনিয়া যুবকটী বিস্ময়ে হাসিতে হাসিতে বলিল,—“হে মহাশয়! আমি যাহা ভাবিতেছি, যাহা জানি না এবং যাহা জানিবার জন্য এত চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছি, আপনি আমাকে প্রথমেই সেইপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখুন মহাশয়! আমি যে কে এবং কোথা হইতে যে আসিয়াছি আর কোথায়ই যে যাইব,তাহার কিছুই আমি জানি না। অনেক ভদ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা কেহই আমার কথার উত্তর দেন নাই, বরং আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। বিশেষ আগ্রহের সহিত যদি কাহাকেও দুইচারি বার জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়া বলেন,—‘ব্যাটা পাগল! আমার ঐ দুই বছরের ছেলেটীকে জিজ্ঞাসা কর, সেও তোর কথার জবাব দিবে। আর তুই ব্যাটা বুড়ো ধাড়ি, তুই এই সামান্য কথাটা বল্‌তে পারিস্‌না। আবার কেউ বলেন,—ব্যাটা চোর নাকি? মহাশয়! এরূপ কত লাঞ্ছনা কত কষ্ট ভোগ করিয়া এবং কত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া কত লোকের কাছেই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। তবু বুঝিতে পারিলাম না বা কেউ বলিতে পারিল না যে, আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, আর কোথাই বা যাইব। দূর হইতে আপনাকে দেখিয়া আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবার আশায় বড়ই ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। এখন আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন যে, ‘আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, আর কোথায়ই বা যাইব?”

পাগলবেশী যুবকটির প্রশ্নের ভঙ্গি ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া ইহার অন্তরের ভাব বুঝিতে আর মহাপুরুষের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে বিশেষ

আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিগদগদ কণ্ঠে ভগবদুদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"দয়াময়! ধন্য তোমার দয়া, ধন্য তোমার লীলা। আমি এইমাত্র ভাবিতেছিলাম যে, মানবগণকে তত্ত্বোপদেশ প্রদানের জন্য গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাহির হইয়াছি। কিন্তু ঠিক করিতে পারি নাই যে, কেমন করিয়া, কাহাকে অবলম্বন করিয়া যতটুকু শিখিয়াছি, যতটুকু বুঝিয়াছি, সাধু-গুরুমুখে যতটুকু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিব। হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি আমার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মনের বাসনা পূর্ণ করিলে। এই যুবকটীকে যে ভাবের দেখিতেছি এবং প্রথম হইতেই ইহার যেরূপ প্রশ্নের অবতারণা তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এ যুবক সাধারণ নয়, প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্যই ইহার অত্যন্ত অনুরাগ। কাজে কাজে ইহাকে কোন বিষয় উপদেশ দিলে এ ব্যক্তি নানা দেশ বিদেশে, ছোট বড় উত্তম অধম সকলকেই বলিয়া বেড়াইবে। অবশ্য সকলের প্রাণে একেবারে ধর্মভাব না জাগিলেও ক্রমান্বয়ে দুই চারিজন করিয়া শুনিতে শুনিতে কালে আবার মানবগণ নিজ নিজ প্রকৃত অভাব বুঝিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে যত্নবান হইতে পারিবে। তখন অল্প আয়াসেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। হে অন্তর্যামিন! অন্তরের ভাব বুঝিয়া বাসনা পূরণের জন্য যেমন সংযোগ করিয়া দিয়াছ, এক্ষণে এই যুবকের প্রশ্নের অনুযায়ী যথাযথ উত্তর প্রদানের শক্তি দিয়া তত্ত্ব প্রচার দ্বারা জগতের কিছুমাত্রও উপকার যাহাতে করিতে পারি তাহা কর।" এই বলিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রকাশ্যে যুবকটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ওগো! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, আগে বল দেখি, তোমার নাম কি?

যুবকটী এতক্ষণ একদৃষ্টে মহাপুরুষের ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ নাম কি জিজ্ঞাসা করায় ধীরভাবে করযোড়ে বলিতে লাগিল,—

"মহাশয়! আমি অতিশয় চঞ্চল বিশেষতঃ কিছুদিন হইতে আমার মনটা, কেমন কয়েকটী বিষয় জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। যেখানে সাধু-সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শুনি, সেইখানেই যাইয়া উপস্থিত হই। কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহাদের নিকট বড় বেশী কিছু লাভ হয় নাই। বাহিরে যে ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতাম, দু'পাঁচ দিন পরেই তাহা দূর হইয়া তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িত। কাজেই অন্তরে বাহিরে বিভিন্ন রকমের ভাব দর্শনে আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখন বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া নানারূপ ক্ষোভে, দুঃখে অন্যত্র চলিয়া যাইতাম। আমার এইরূপ ভাব দেখিয়া সাধারণে আমাকে 'পাগল' বলিয়া ডাকে। আমিও কেমন নিজের নাম, ধাম, কুল, গোত্রের পরিচয় দিতে ভালবাসি না আর তত ইচ্ছাও হয় না। কাজেই তাহাদের ডাকেই সাড়া দিয়া থাকি। এই সকল কারণে পাগল বলিয়াই আমি বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট পরিচিত। আপনিও আমাকে এ যাত্রায় ঐ পাগল বলিয়াই জানিবেন। পরে যদি আপনার কৃপায় চিত্ত স্থির হইয়া যায় ও নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিতে পারি, তবে তখন ভাল দেখিয়া একটা নাম রাখিয়া দিবেন। এক্ষণে আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন যে, **আমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছি, আর কোথায়ই বা যাইব?** এ বিষয় জানিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।"

যুবকটীর কথা শুনিয়া মহাপুরুষ বলিলেন "তুমি পাগলই বটে, কিন্তু

সাধারণ জীব যেমন পাগল তেমন নয়, সুতরাং আমি তোমাকে 'রসিক পাগল' বলিয়াই ডাকিব।"

আমাদিগের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ! আপনারাও এখন সাধু পুরুষটীকে 'প্রেমানন্দ' ও যুবকটীকে 'রসিক পাগল' বলিয়া জানিয়া রাখুন, প্রয়োজন হইলে উহাদিগের প্রকৃত পরিচয় ও নাম যথাকালে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। কিছু সময় দুই জনেই নীরব থাকিলে পরে যেভাবে কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল তাহা আমরা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম পাঠকগণ আস্বাদন করুন।

প্রেমানন্দ।—ওহে রসিকচাঁদ! একটু স্থির হও; তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটী কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রথমে তাহার যথাযথ উত্তর দাও; কোনরূপ সঙ্কোচ করিওনা, ক্রমে তোমার সকল প্রশ্নেরই মীমাংসা হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ বল, তুমি কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছ কি না, আর কোন্ ভাষাতেই বা তোমার বিশেষ অধিকার আছে?

রসিকচাঁদ।—মহাশয়! শাস্ত্রাদি কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে কেবল পাখীর ন্যায় বোল মুখস্থই হইয়াছে, শাস্ত্রের প্রকৃত ভাব কিছু বুঝিও নাই, আর সেরূপ বেশ মনের মত বুঝাইবার লোকও পাই নাই যে, একটু বুঝাইয়া দেয়; তাই সে ভাবের পড়াশুনা ছাড়িয়া বর্ত্তমানে এই পাগলামো ধরিয়াছি। মনে স্থির করিয়াছি যে, যদি প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া যথার্থ প্রাণের অভাব মিটাইতে পারে, এমন লোক পাই, তবেই আবার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিব, নতুবা কেবল পাখীর ন্যায় বোল মুখস্থ করিয়া কি হইবে!

প্রেমানন্দ।—আচ্ছা বৎস! তোমার মনের ভাব বুঝিলাম। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাস্ত্র বলেন—অখণ্ড

সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতেই জীব আসিয়াছে। তিনিই জীবের আদি। নিখিল্ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আবার তাহাদিগকে তিনিই পালন করিতেছেন, সেই পরমপিতাপরমেশ্বরেই আবার সকল বিলীন হইবে। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম সচিচদানন্দঘন ভগবান হইতেই তুমি আসিয়াছ, আবার কালে সেইখানেই যাইবে। যতদিন এই প্রকৃত গন্তব্য পথ ঠিক করিয়া না লওয়া যায়, ততদিনই জীবনের ঘোরা ফেরা। সদ্‌গুরুর কৃপায় নির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান জানিতে পারিলে আর তাহার পতনের ভয় থাকে না। পরমেশ্বরই যে আদি, আর তাঁহা হইতেই যে সকলে আসিয়াছ এবং শেষে যে তাঁহাতেই লয় হইবে ইহা সকল শাস্ত্রেই বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বলিতে গেলে অনেক বিস্তার হইয়া পড়িবে এবং বহু সময় সাপেক্ষ বলিয়া তোমাকে এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি. প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে যথা সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। এখন বোধহয় বুঝিয়াছ যে, তুমি সেই আনন্দময় পরমেশ্বরেরই অংশ আর সেই শান্তিময় ধাম হইতেই তুমি আসিয়াছ, এবং বেশ বুঝিয়া বিচার করিয়া মহাজনগণের আচরিত প্রকৃত পথে চলিতে পারিলে আবার সেইখানেই যাইবে। তবে বৎস! আসিবার সময় বেশ আসিয়াছ, যাইবার সমই অধিকতর সাবধানে যাইতে হইবে। কেন না, সেখানে যাইবার পথ প্রায়ই ভুল হইয়া যায়, আমরা সাধারণতঃ যে পথে যাতায়াত করি সে পথে সেখানে যাওয়া যায় না। কাজে কাজেই যাহারা সেই পথের পথিক্ তাঁহাদের নিকট হইতে সঠিক পথের পরিচয় জানিয়া অতি সতর্কতা সহকারে চলিতে হইবে। যদি ঠিকভাবে পুর্ব্ব পুর্ব্ব পথপ্রদর্শক ঋষিগণের উপদেশ মত চলিতে পার তবেই ঠিক গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারিবে; নতুবা পথহারা পথিকের ন্যায় কেবল অপথে কুপথে ঘুরিয়া দিন গত হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দেখ—

নদীর তীর হইতে যেমন একটি কীট নদীর আবর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া অবিরত

ঘুরিতে থাকে—একবার জলের উপর উঠে, একবার আবর্ত্তে পড়িয়া নীচে যায় আবার উঠিয়া কিছু দূরে যাইতে না যাইতে আবার আবর্ত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নীচে চলিয়া যায়; এইরূপ বারবার উঠা-নামা করিতে করিতে যদি কোন সাধু পুরুষের নয়নগোচর হয়, তখন তিনি যদি দয়া করিয়া তাহাকে তুলিয়া দেন তাহাহইলে যেমন সে নিরাপদ স্থানে গমন করিয়া সুখে বাস করিতে থাকে, সেইরূপ আনন্দময় কল্পবৃক্ষরূপী শ্রীভগবান হইতে জীব আসিয়া অসৎসঙ্গে অসদালাপাদি করিয়া সংসার সাগরের অনন্ত আবর্ত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মের পর জন্ম, আবার ভোগ, আবার জন্ম এইরূপ পুনঃপুনঃভ্রমণ করিতে থাকে, পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবলে ইতিমধ্যে যদি কোনও মহতের দর্শন হয়, তবে ঐ দয়াল সাধু পুরুষ নিজ শক্তিবলে এই ঘোর সংসার-সাগর-নিমগ্ন ব্যথিত জীবকে যেমন তুলিয়া লয়েন, অমনি সে স্থির হয় এবং শান্তিময় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সন্নিধানে গমন করিয়া পরম সুখে থাকে। তাহার আর সংসারাবর্ত্তে ঘোরা ফেরা থাকে না। তাইবলি রসিক চাঁদ! তুমি দেশ বিদেশে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে কি হইবে? যাঁহারা এ বিষয়ে ঠিক বুঝিতে না পারিয়াছেন, তাঁহারা তোমার প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া দিবেন? এক্ষণে একটু স্থিরচিত্তে বিশেষ-ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখ দেখি, তুমি বুঝিয়াছ কি না যে, কোথা হইতে আসিয়াছ,আর কোথায়ই বা যাইবে?

রসিক।—মহাশয়! এক কথায়ত বেশ বুঝাইলেন আমিও বুঝিলাম যে, আমি সেই আনন্দময় পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের অংশ, তাঁহা হইতেই আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই আবার যাইয়া মিলিত হওয়া উচিত। অন্যথা যাহা করি-তেছি, সকলই বৃথা। (করযোড়ে ব্যাকুলভাবে) গুরুদেব! আপনার কথায় কেবল যে আমার এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল, অথবা আমি যে আর দৌড়াইয়া অন্যত্র যাইব, তাহা মনে করিবেন না। এই প্রশ্নের উত্তরের

সহিত আপনার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আর মনে মনে ইহাই স্থির বিশ্বাস হইতেছে যে, আমার মনের সকল সন্দেহই আপনার কৃপায় দূর হইবে। হয় পাগলামো বাড়িবে, না হয় বেশ পণ্ডিত হইয়া যাইব। আচ্ছা গুরুদেব! এই যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীভগবান্, ইনি কোথায় থাকেন, আর কেমন করিয়াই বা তাঁহার নিকট যাইতে হয়?

প্রেমা।—(সহাস্যে) ওরে পাগলা! তিনি যে বিভু, বিশ্বব্যাপী,—স্থাবর-জঙ্গম, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদি সকল বস্তুতেই যে তিনি বর্ত্তমান। "ব্যাপ্নোতি ইতিবিষ্ণুঃ" জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন বলিয়াই যে তাঁহার নাম বিষ্ণু। তাঁহার বর্ত্তমানতা নাই এরূপ স্থান, এরূপ বস্তু ত কোন দিন হয় নাই বা হইবারও নয়। তিনি বিশ্বের আধাররূপে বিরাজ করিতেছেন। জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বত্রই তিনি সর্ব্বদা বর্ত্তমান। তিনিই জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং স উ
প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।"

অর্থাৎ শব্দাভিব্যঞ্জক কর্ণেরও কর্ণ (অর্থাৎ শ্রবণশক্তি) মনেরও মন, বাক্যের বাক্‌শক্তি, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু, তাঁহাকে জানিয়াই ধীমানগণ দেহাবসানে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বৎস! তিনি সর্ব্বময়, তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানেই আছেন, তাঁহার অভাব কোথায়ও নাই।

রসিক।—প্রভো! তবে যে এত কঠোর পরিশ্রমে বহু বহু অর্থব্যয়ে লোক নানা দেশ-বিদেশ হইতে কেহ বা কাশী, কেহ বা গয়া, কেহ বা বৃন্দাবনাদি তীর্থে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, ইহা কেন? আমিও আগে মনে করিতাম, আমাকে যদি কেহ একবার বলিয়া দেয় যে, আমার যাইবার স্থানই বা কোথা আর কোথা হইতেই বা আসিয়াছি, তবে যেমন করিয়া হউক, একবার ভগবান্‌কে দেখিতে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিব।

তখন জানিতাম না যে, ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, তিনি কোনও স্থানে সীমা-বদ্ধভাবে আবদ্ধ নাই এবং তিনিই আমার আদি এবং অন্ত। এমন কি, যখন আপনার নিকট প্রথম শুনিলাম যে, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র আশ্রয়, তখনই মনে হইয়াছিল যে, ঐ সকল যাত্রিদিগের, সঙ্গে এখনই তীর্থযাত্রা করি। আমার ধারণা ছিল যে, ভগবান্ কেবল তীর্থেই আছেন, অন্যত্র নাই।

প্রেমা।—বৎস! যাঁহারা তীর্থে যান, তাঁহাদিগের মনের ভাব অন্য রকম। তিনি যে কেবল তীর্থেই আছেন, অন্যত্র নাই, এ ধারণা অতিশয় ভ্রান্তিমূলক। তিনি সর্ব্বেশ্বর—সকল স্থানেই তাঁহার সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি কেবল তীর্থে আবদ্ধ আছেন, ইহা বলিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্বে দোষারোপ করা হয়। তবে তীর্থাদিতে গমনেরও বিশেষ কারণ আছে। এক্ষণে একটু বিশ্রাম কর পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।”

রসিক।—প্রভো! আমার ভয় হইতেছে যে, আপনি চলিয়া যান, আমি বিশ্রাম করিতে যাইব না, আপনি বলুন আমি সাধমিটাইয়া আপনার উপদেশামৃত পান করি।

প্রেমা।—নারে পাগলা না, আমি এখন কোথাও যাব না। গঙ্গার উপর এমন গাছতলা, এমন নির্জ্জন স্থান; আর তোমার মত এমন ভক্তকে পাইয়া কি আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা হয়? এখন আমার নিজের কিছু গুরুরউপদেশমত ক্রিয়া করিতে হইবে, তুমি এখন যাও, রাত্রে সুবিধা হইলে আবার আসিও, কাথাবার্ত্তা হইবে।”

প্রেমানন্দের আদেশক্রমে রসিকচাঁদ আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রেমানন্দও ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।—

( ওহে ) হরি,—কি গুণ আছে তব নামে।
নিলে ঐ নাম, প্রাণে পড়ে টান,
নাম নিতে নিতে, বাসনা হয় চিতে,
দেখিতে তোমায় নয়নে, ॥
ঐ নামের গুণ একি চমৎকার,
নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার,
তখন, ভাবি এ সংসার সকলি অসার
নামে মোহ-ঘুম ভাঙ্গে ॥
কোন্ দ্রব্য দিয়ে গ'ড়েছ এ নাম,
নাম নিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছজ্ঞান,
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, নিতে চায় না চিত্ত,
অপদার্থ সব হয় মনে ;—
হরিনাম কেবল সত্য সত্য সত্য,
হরিনাম কেবল পরম পদার্থ,
ঐপদার্থ বিনে সকলি অনিত্য,
মাহাত্ম্য তার কে জানে ॥
নামে কেন হরে মনের বিকার,
নামে কেন হয় আনন্দ অপার,
হয় অনুমান করুণানিদান,
( বুঝি ) নামের সঙ্গে মিশে র'য়েছে ;—
মনে হয় জীবে তরাবার তরে,
নামরজ্জু ফেলে রেখেছে সংসারে,
সেই রজ্জু যেজন ধ'রেছে সজোরে,
সেই তো তরে জীবনে ॥

নাম-রজ্জু হৃদে বাঁধ রে বাঁধ রে,
ছিড়্‌বে না সে শত জন্ম জন্মান্তরে,
সে এম্‌নি শক্ত রসি অক্ষয় অবিনাশী,
( তাতে ) ভয় রবে না পতনে ॥

প্রেমানন্দের প্রেম-কণ্ঠে প্রেমের স্রোত একেবারে কুল-কুল ধ্বনিতে বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, পূর্ব্বকথিত ঐ বটবৃক্ষমূলেই পূর্ব্ব হইতে অবস্থানের বন্দোবস্ত ঠিক করা হইয়াছিল। কাজেই তিনি সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তাঁহার নিজ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেমানন্দের নিকট হইতে বিশ্রাম করিবার জন্য বিদায় লইয়া রসিক-চাঁদ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর রাত্র ৯টা না বাজিতে বাজিতেই প্রেমানন্দের সেই বটবৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া অন্য কোন কথ নাই, যেন পূর্ব্বকথিত প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য রসিকচাঁদের প্রাণ কি এক রকমের হইয়া গিয়াছে। উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণে যেন কি এক অননুভূত অভাব বোধ হইতেছে। তাই আসিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়াই বলিলেন, প্রভো! আপনি বলিয়াছেন তীর্থগমনেরও বিশেষ আবশ্যক আছে, এক্ষণে দয়া করিয়া সে বিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

প্রেমা—বৎস! তোমার আগ্রহে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতেছি নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমে আমি তোমাকে সাধারণ একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তীর্থ সম্বন্ধে কিছু ধারণা বদ্‌লাইয়া দিব। সাধারণতঃ যে ভাবে তোমাদের তীর্থের ধারণা আছে আমাদের কিন্তু সেরূপ ধারণা নাই। প্রথমে মনে কর তোমার শরীরে একটা কোনও বদ্‌গ্যাস জন্মাই-য়াছে তাহাদ্বারা তোমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে, যেসকল জিনিস

ব্যবহারে তোমার দেহ সুস্থ ও সবল হয় সে সকল জিনিসে তোমার অরুচি হয়, কিন্তু যাহা ব্যবহারে দেহ অধিক অসুস্থ ও দুর্ব্বল হয় তাহাতে জন্মায় রুচি। এই সুপথ্যে বা সুখাদ্যে অরুচি এবং অখাদ্যে ও কুপথ্যে যে রুচি ইহার নিবারণ জন্য সাধারণতঃ তোমরা ডাক্তার কবিরাজের আশ্রয় লও। কিন্তু নিরন্তর বিষয়ের চিন্তা করিয়া, পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া মনের মধ্যেও যখন এইরূপ একটা বদ্‌গ্যাস জন্মায়, তখন যে বিষয়ের আলোচনায় মন নির্ম্মল হয়, যাহার বিষয় চিন্তাদ্বারা মনের আনন্দ বৃদ্ধি হয় এমন যে ভগবানের নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন তাহাতে ভয়ানক অরুচি জন্মায়। যদিও মধ্যে মধ্যে জোর করিয়া কেহ ভগবদ্বিষয় তোমাকে শুনাইতে আসে তুমি নানা ওজর আপত্তি দেখাইয়া তাহা শুনিতে চাওনা।

এই যে, ভগবদ্বিষয়ের আলোচনায় অরুচি ইহার নিবৃত্তি হয় তীর্থাদি ভ্রমণে। তারপর আরও এক মহা লাভ তীর্থে হয়। তীর্থে সাধু মহাত্মারা বাস করেন; তাঁহাদিগের দর্শনে, তাঁহাদিগের সঙ্গগুণে দেহ মন প্রাণ পবিত্র হয়। আর শ্রীভগবান যুগে যুগে জীবের ধর্ম্মরক্ষার্থে এবং ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য এক এক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া এক এক রকম লীলা করিয়াছেন। সেই সেই লীলাস্থলী দর্শনে স্বভাবতঃই প্রাণ পবিত্র হয় হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয় ও তাঁহাকে ডাকিবার, তাঁহাকে ভাবিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। বিষয়াসক্ত মায়াকিঙ্কর জীবের ঘরে বসিয়া সহনশক্তি বিবেকশক্তি আসে না, কিন্তু তীর্থভ্রমণে, তীর্থমাহাত্ম্যে ঐ সকল গুণ লাভ হয়। তীর্থভ্রমণ দ্বারা মনস্থির হইলে তীর্থবাসী সাধু মহাপুরুষগণের কৃপায় সহজেই শ্রীভগবানের আরাধনায় সফলমনোরথ হইতে পারে। এই প্রকার নানা ভাবে ভক্তির উদ্দীপনা হইবে বলিয়াই তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। নতুবা শ্রীভগবান তীর্থেও আছেন অন্যত্রও আছেন।

রসিক।—প্রভো! আপনার কথা শুনিয়া একটা প্রশ্ন মনে হইল, যদি অভয় দেন তবে বলি?

প্রেমা।—বৎস! স্বচ্ছন্দে বল, তোমার প্রশ্নে আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইব না, যে সময় যে প্রশ্ন মনে উদয় হইবে তুমি নির্ভয়ে বলিবে শ্রীগুরুর কৃপায় যতদূর জানি তোমাকে বলিব।

রসিক।—আচ্ছা, আমরা যাহাকে তীর্থ বলি—যেমন কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি, এগুলিওত অন্যান্য স্থানেরই মত? তবে তীর্থের অত মাহাত্ম্য কেন?

প্রেম।—বৎস! এই বিষয় তোমাকে একটু বিশেষ করিয়া বলিব। দেখ, লৌকিক দৃষ্টিতে তীর্থ অন্যান্য স্থানের মত এক রকমেরই মাটী দিয়া রচিত হইলেও তীর্থের একটু বিশেষত্ব আছে। ধর তোমার এই শরীরটা, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্তইত একই রকমের দ্রব্যে অর্থাৎ রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, তবে ইহার সকল অঙ্গ সমান নয় কেন? কোনটাকে উত্তমাঙ্গ, কোনটাকে অধমাঙ্গ বলে কেন? তেমনি এই পৃথিবীর সকল স্থানই এক মাটীতে প্রস্তুত কিন্তু তাহারও সকল স্থান সমান নয়। শরীরের যেমন উত্তমাঙ্গ মস্তক, যাহাকিছু ভাল জিনিষ তাহা যেমন মস্তকেই থাকে তেমনি পৃথিবীর উত্তমাঙ্গ হইল "তীর্থ।" যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সার তাহা তীর্থেই অবস্থান করে। সাধারণতঃ চর্ম্মচক্ষে তাহা অন্যান্য স্থানের ন্যায় এক দেখিলেও তাহা সামান্য ভূমি নয়; তীর্থ চিণ্ময়ভূমি। শ্রীভগবান যে ধাতুতে গড়া তাঁহার লীলাক্ষেত্রও সেই ধাতুতে গড়া, আর শ্রীভগবানও যেমন অচিন্ত্য শক্তিতে পরিপূর্ণ তাঁহার বিহারভূমিও সেইরূপ অচিন্ত্য শক্তিতে পরিপুরিত। সেই জন্য তীর্থে যাইয়া কেবল সেখানকার জল হাওয়া, কারিগরী বা কোথায় কিরূপ খাবার-দাবার সুবিধা অসুবিধা, কোথায় কোন জিনিষ ভাল পাওয়া

যায় না যায় এ সব দেখিয়া আসিলে তীর্থ করা হয় না। তীর্থে "তীর্থ-বুদ্ধি" লইয়া যাইতে হয়। তীর্থে যাইয়া আমরা তীর্থ, বুদ্ধি করি না বলিয়াই তীর্থের শক্তি কিছু দেখিতে বা বুঝিতে পারি না। শ্রীমথুরাধামের মহিমাবর্ণন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—

"অয়ং মাথুর-ভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোহপ্যথাদ্ভুতঃ।
স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চস্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—"হে মথুরাভূমি! আমার নিকট আপাতঃ দৃষ্টিতে তুমি চতুঃসীমাবদ্ধ সামান্য পরিচ্ছিন্নভূমি হইলেও তোমারশক্তি মহাঅদ্ভুত। শ্রীকৃষ্ণের লীলা অনুসারে তুমি কখনও বিস্তৃত কখনও সঙ্কুচিত হইয়া থাক।"

বৎস! এটী যে শুধু কথার কথা তাহা নয়। এখনও শ্রীবৃন্দাবনাদি অনেকস্থলে ভগবানের অনেক লীলাস্থল দেখিলে ইহা প্রকৃত বলিয়া মনে হইবে। মোটকথা, তীর্থে যাওয়ার পূর্ব্বে বিশ্বাস লইয়া যাইতে হয় এবং তীর্থে যাইয়াও শুধু বাহিরের ফাঁকা দৃশ্য দেখিয়া শুনিয়া হৈচৈ করিয়া এটা ওটা পাঁচটা খেলনা পুতুল কিনিয়া চলিয়া আসিলে হয় না।

রসিক।—প্রভো! তীর্থে গিয়া কিরূপ ভাবে থাকিতে হয়, আর তীর্থ হইতে বাড়িতে আসিয়াই বা কি করিতে হয়—কি ভাবে থাকিতে হয় দয়া করিয়া সেই বিষয় এইবার একটু বলুন?

প্রেমা।—বৎস! যে যে তীর্থে শ্রীভগবান্ যে যে লীলা করিয়াছেন, সেই সেই তীর্থে যাইয়া তাহারই ভাবনা করিতে হয়। সাধু পুরুষদিগের সঙ্গ অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হয় এবং যেখানে যেরূপ ক্রিয়াদির নিয়ম আছে, ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রানুমোদিতভাবে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তীর্থ হইতে বাড়ীতে ফিরিবার সময়ও সেই লীলাস্থলীর পবিত্র ভাবসকল হৃদয়ে লইয়া, মহাপুরুষদিগের উপদেশা-

বলী চিন্তা করিতে করিতে আসিতে হয়। এইরূপ ভাবপূর্ণ হৃদয়ে আসিলে আর পূর্ব্বের মত সংসারে আসক্তিভাব থাকিতে পারে না; তখন স্থির ধীর হইয়া ইষ্টদেবের ভাবনায় যাহাতে জীবন সর্ব্বদা পবিত্র থাকে, যাহাতে সেই ভগবৎ-তত্ত্ব বিশেষরূপে ধারণা করিতে পারা যায় তাহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে সততই প্রবৃত্তি হয়। তীর্থ-ভ্রমণের গুণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুসংস্কার-লব্ধ ভাবসকল দূর হইয়া চিত্ত সুনির্ম্মল হয়। তাই শাস্ত্রকারগণ ও সিদ্ধ মহাত্মাগণ ইহাকে তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত ফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

রসিক।—গুরুদেব! আপনার কথায় যে আমার মনে নানারূপ প্রশ্নের উদয় হইতেছে? আমার যেন সকলই গোলমাল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন যে কি করিব, কি বলিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।

প্রেমা।—বৎস! নির্ভয়ে, প্রাণ খুলিয়া তোমার যাহা যাহা সন্দেহ হইতেছে, আমাকে বল। আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যাহা জানিয়াছি, তোমাকে অবশ্যই তাহা বলিব।

রসিক।—প্রভো! পাগল বলিয়াই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, অনেকে আমাকে ভলবাসেন। তাই নানা প্রকার লোকের সঙ্গে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হয়। সেদিন এক বাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখি, মহা ধূম ব্যাপার। প্রকৃত ব্যাপার কি, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া অগ্রসর হইলাম; দেখি—বাবু বসিয়া গড়্‌গড়ায় তামাক টানিতে-ছেন, চতুর্দ্দিকে পাড়াপ্রতিবাসী বহু লোক মণ্ডলী করিয়া বসিয়া নানা প্রকারের হাসি-ঠাট্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, কোথায় কতদিন ছিলেন, কোথাকার জলবায়ু ভাল, কোন্ স্থানের পাণ্ডারা কিরূপ ব্যবহার করে, কোথায় কোন্ জিনিব পাওয়া

যায় ইত্যাদি। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, বাবু সস্ত্রীক প্রায় দুই মাস নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গুরুদেব! কৈ, আপনার কথিত নিয়মের ত কোন কিছুই দেখিলাম না? ভগবানের নাম গুণ-লীলাদির ত কোনই খোঁজ খবর পাইলাম না? কৈ, কাহারও মুখে ত কোন তীর্থের বা কোন মহাত্মার কথাও শুনিলাম না? একটু কৌতূহলা-বিষ্ট হইয়া আমার একটী পরিচিত বন্ধুর সহিত বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, সে আরও আশ্চর্য্য। সেখানে আশ্ পাশের পাড়ার যত স্ত্রীলোক সব একেবারে একঠাঁই, তন্মধ্যে প্রাচীনার সংখ্যাই কিছু বেশী। আর গিন্নিমা অর্থাৎ যিনি তীর্থ ঘুরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলাম, কয়েকটা প্যাট্‌রা খুলিয়া নানা রকম দ্রব্য দান করিতে বসিয়াছেন। একজনের হাতে একটী ঘুন্‌সী তাগা দিয়া বলিলেন, "এই নাও কাশীর চিহ্ন।" কাহাকেও একটী ঘটী দিয়া বলিলেন, "এই নাও গয়ার চিহ্ন।" এইরূপে কাহাকেও একটী মাটির পুতুল, কাহাকেও বা একটী ছেলেদের চুশকাটী, আবার কাহাকেও বা একটা মাটীর হনুমান্ দিয়া যে তীর্থ হইতে তাহা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার নাম বলিয়া দিতেছেন। উপাস্থত স্ত্রীলোকদিগের মধ্য হইতে একজন বল্লেন, "হ্যা মা! আমাদের ছেড়ে এই দুই মাস গিয়া কাশী প্রয়াগাদি ঘুরে এলে, আমাদের মন যেন সর্ব্বদাই কেমন কেমন করিত। হ্যা মা! কি ক'রে ভুলে ছিলে?" গিন্নি-মা অমনি, ব'লে উঠ্‌লেন "হ্যা গো রামের মা! যেখানেই যাই না কেন, তোদের কি ভুলে থাকতে পারি? যেখানে থাকতুম্ সেইখানেই তোদের কথা মনে হ'তো। বিশ্বনাথের মন্দিরে ব'সে সকলে পূজা ক'চ্ছে তাদের দেখাদেখি আমিও গিয়ে বসতুম্ কিন্তু ব'সে ব'সে কেবল ভাবতুম তোর ছোট খোকাটী কেমন আছে, রায়েদের মেজ বউয়ের মেয়েটী বড় হ'য়েছে তার বিয়ের কি হ'ল। আমার ন'-

বউয়ের জন্য নেকলেস্ গড়াতে দিয়ে গিয়েছিলাম তার কতদূর হ'ল। তোদের জন্য মা সর্ব্বদাই চিন্তা কত্তুম, আমি তোদের ভুলব আর তোরা আমায় ভুল্‌বি এও কি কখন সম্ভব হয় গা? যেখানেই যাই, সেইখানেই থালা, ঘটি, বাটি, খেলনা প্রভৃতি কি কিন্‌ব, কাকে কি দিব এই সব ভাবনা; বল্‌তে কি মা, রাত্তিরেও কদিন তোদের স্বপ্ন দেখেছি, তোদের কি ভোলা যায়?"

গুরুদেব! তীর্থ হ'তে বাড়ী ফিরে এসেত এই ভাবের ব্যবহার কত্তেই দেখলুম; কিন্তু আপনি যে সম্পূর্ণ নূতনভাবের কথা বল্লেন। তীর্থ হইতে বাড়ীতে অসিয়া ত খুব কম লোককেই ধর্ম্মালোচনা করিতে দেখি, লাভের মধ্যে গল্প বেড়ে যায় মাত্র। এইসকল ভেবে ভেবেই কেমন আমার মাথাটা গোলমাল হইয়াছে, তাই লোকে আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। আমারও এখন আর তেমন লোকের সঙ্গে বেশী মিশ্‌তে কেমন ইচ্ছা হয় না।

প্রেমা—(হাসিতে হাসিতে) রসিক চাঁদ! এ অতি সত্য কথা, তবে তুমি যে ভাবের কথা বল্লে সকলেই যে সেইভাবের তাহা নয়, তবে অধিকাংশ এই রূপই বটে? তোমার কথায় আমার একটি পুরাতন গান মনে পড়িল। কোন রসিক ভক্ত বোধহয় এই ভাবের কোন দৃশ্য দেখিয়াই প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

"আমার কাদা মাথাই সার হ'ল।
ধর্ম্ম-মাছ ধরব ব'লে নাম্‌লাম বিলে
আমার ভক্তি-জাল ফেঁসে গেল॥
জালফেলে সাধ ক'রে উঠাইলাম ধীরে ধীরে
(তীরে) তুলে দেখি শামুক গুগ্‌লি উঠেছে কতকগুলো॥

আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছি বা বলিব, সকলই শাস্ত্রের কথা,

—নূতন মনগড়া কিছু বলি নাই বা বলিবও না। তবে যাহারা শাস্ত্র বোঝে না বা আলোচনা করে না তাহাদের নিকটেই এই সকল নূতন বলিয়া বোধ হয়। এখন তোমার অন্য কি সন্দেহ আছে বল।

রসিক।—গুরুদেব! পূর্ব্বে আপনি বলিলেন, তীর্থে সাধু মহাত্মারা বাস করেন, তাঁহাদের সঙ্গগুণে দেহ-মন পবিত্র হয়, ভগবদ্বিষয়ে আলোচনার অরুচি দূর হয়। এবিষয় কিরূপ তাহা একটু বিস্তৃত ভাবে উপদেশ করুন।

প্রেমা।—বৎস! তীর্থে যাইয়া কি করিতে হইবে তাহাতো তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মোটকথা তীর্থে যাইয়া শুধু চুপ্ চাপ্ বসিয়া থাকিলে বা শুধু বেড়াইয়া বেড়াইলে হইবে না। তীর্থের সেবা করা চাই। সে সেবা আর কিছু নয়—যথা—শাস্ত্র তীর্থের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন, পুণ্য-জলে অবগাহন, দান শ্রাদ্ধ তর্পন প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি যে করিতে হইবে তাহা শুধু লোক দেখান করিলে চলিবে না, তীর্থে তীর্থ-বুদ্ধি লইয়া অকপট বিশ্বাসে আন্তরিকতার সহিত করিতে হইবে এই সকল করিলে ইহার ফলে তীর্থের কৃপা হইবে। আর সেই কৃপারফলেই তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদক সাধু সজ্জনগণের সঙ্গলাভ ঘটিবে।

রসিক।—সাধু-সজ্জনগণ যে তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদক এ বিষয় ঠিক বুঝিলাম না, দয়া করিয়া একটু বিস্তৃতভাবে বলুন।

প্রেমা।—পাপনাশী তীর্থ মলিনজনের সংসর্গে তাহাদিগের রাশী রাশী পাপে ক্রমশঃ পবিত্রকারিণী শক্তি হারাইয়া ফেলেন, সেই শক্তি পুনরায় বৃদ্ধি করিতে সাধু সজ্জনগণ তীর্থে আসেন। সাধুরা অনুক্ষণ সর্ব্বপাপ নাশন শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া সেই শ্রীহরির গুণেই তাঁহাদের এই অসাধারণ পাপ নাশন ক্ষমতা হয়। তাহার ফলে তাঁহারা

তীর্থেরও পাপ নাশ করিতে সক্ষম হন। শ্রীমদ্ভাগবত এই সজ্জন সাধুগণকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—

"তীর্থীকুর্ব্বন্তী তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা,"

সাধুর সহিত অতি অল্প কাল অবস্থানেও অতি শ্রেয়ঃস্কর ফল লাভ হইয়া থাকে "সদ্বৃত্ত সন্নিকর্ষোহি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে।" তাহা হইলে মোটের উপর বোধহয় এখন বুঝিতে পারিলে যে, সাধুরা তীর্থের তীর্থত্ব সম্পাদক কিরূপ ভাবে হইলেন।

রসিক।—প্রভু, এক কথার উত্তর পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমার আবার আর এক প্রশ্ন মনে উঠিতেছে। আচ্ছা, এই যে সাধুর কথা আপনি বলিলেন, আজ কাল যে সকল গেরুয়া বসন পরা বা মস্তকে জটা প্রভৃতি দেখি ইহারাই কি আপনার কথিত সাধু?

প্রেমা।—বৎস! তাহা ঠিক বলা যায় না, কোন্ ঘটে যে কি আছে, কোন্ মূর্ত্তিতে যে ভগবান কোন্ ভাবে কি কার্য্য করিতেছেন তাহা সাধারণতঃ বুঝা যায় না। তবে সাধারণতঃ এক শ্রেণীর সাধু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা, যে বিষয়ী-সংসর্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও ভীষণ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গেই থাকিতে ভালবাসেন এবং সর্ব্বদাই অমুক রাজা, অমুক বড় লোক আমার শিষ্য ইত্যাদি বলিয়া নিজের বড়াই করিয়া বেড়ান। বাহ্যিক সাজ পোষাক দেখিয়া বা আচার ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের চিনিবার উপায় থাকে না। ইহারা নামে সাধু কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিষয়ী। এরূপ লোকের নিকটে না যাইয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ করিয়া তফাতে তফাতে থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান কপিলদেব নিজ জননী দেবহূতিকে যখন সাধুসঙ্গের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন তখন দেবহূতি

সাধুর লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে কপিলদেব জননীকে বলিয়াছিলেন —

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধু ভূষণাঃ॥ ভাঃ ৩।২৫।২১

মা! তাঁহাকেই সাধু বলিয়া জানিবেন, যিনি তিতিক্ষা সম্পন্ন (শীত-উষ্ণ, ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সহনশীল) কারুণিক (করুণায় বিগলিত চিত্ত) দেহধারি মাত্রেরই সুহৃদ (প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া সকল জীবেরই উপকারী) শত্রু শূন্য (অন্তরে হিংসা বৃত্তি না থাকায় বৈর-ত্যাগী) সমগুণাবলম্বী (অন্তরের তরঙ্গ বিহীন) শাস্ত্রানুসারে সদাচারাদি সাধন নিরত এবং সাধুভূষণ অর্থাৎ সৎ স্বভাব ভূষিত অথবা সজ্জন-সঙ্গী। পুনরায় আরও বলিয়াছেন—

ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্ত কর্ম্মাণস্ত্যক্ত স্বজন বান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গত চেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
(ভাঃ—৩।২৫।২২।২৪)

যাঁহারা অনন্য ভাবেতে আমাকে (ভগবানকে) ভক্তি করে, আমার জন্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এমন কি সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করে আমার লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করে, মোটকথা আমাতে যাহারা চিত্ত অর্পণ করে। আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপে তাহারা কখনও উত্তপ্ত হয় না। এই সকল সাধুগণ সর্ব্বসঙ্গ শূন্য, ইহাঁদের সঙ্গগুণে অসৎসঙ্গ জন্য দোষ

সমস্ত নিবারণ হয়। শঙ্করাচার্য্যও এই সাধুগণের মহিমা বলিতে যাইয়া তারস্বরে বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

রসিক।—প্রভো! কৃতার্থ হইলাম, জীবনে অনেক স্থান ঘুরিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু এমন শান্তি কেউ দিতে পারে নাই; দয়া করিয়া আমার সকল সন্দেহগুলিই এইভাবে মিটাইয়া দিতে হইবে। যখন আপনার ন্যায় উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি তখন আমার একটী সন্দেহ থাকিতেও আপনার সঙ্গ ছাড়িব না।

প্রেমা।—বৎস, আমিত তোমাকে অতি সংক্ষেপেই দু'চার কথা বলিলাম, অনন্ত শাস্ত্র অনন্ত ভাবে এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। আমার নিকট হইতে এই ভাবে উত্তর পাইলে যদি তোমার আনন্দ হয় তবে তাহাই হইবে। এ বিষয় আমার কোন আপত্তি নাই। ভগবদিচ্ছায়—যখন তোমার সহিত আলাপ হইয়াছে, তখন ক্রমে ক্রমে সকল প্রশ্নেরই যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করিব। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সময়মত আসিও সৎপ্রসঙ্গ করা যাইবে। তোমার ভাব দেখিয়া, গল্পচ্ছলে অনেক কথাই হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রসিকচাঁদ আপন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন,—

"আমায় দাও হে শিখায়ে বুঝায়ে।
আমি বৃথা ঘুরে মরি, ওহে দয়াল হরি,
তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে॥"

এই ভাবে গান করিতে করিতে ক্রমে সদর রাস্তা পার হইয়া চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষরাজি-শোভিত বনমধ্যস্থ অতি অপ্রশস্থ রাস্তা দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত নিস্তব্ধ—যেন সকলেই ইহ-সংসারের অনিত্যতা

উপলব্ধি করিয়া কোন এক অজানিত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। সাড়া নাই, শব্দ নাই; রসিকচাঁদ ধীরে ধীরে যাইয়া আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে মহাপুরুষ ও রসিকচাঁদকে বিদায় দিয়া, তাঁহার সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে, ভাব-গদগদ স্বরে মহাকবি জয়দেবের সুধা-মধুর গীতগোবিন্দের পদাবলী গান আরম্ভ করিলেন।—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি, গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর-পরিসর-মর্দ্দন-চঞ্চল-করযুগশালী॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে ননু তে তনু-সঙ্গত পবন-চলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলতিপত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখিকুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥
উরসি মুরারেরুপহিত হারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতি-বিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে॥
বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধানম্॥
হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্॥
শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্॥

আহা! একে জয়দেবের পদাবলী, তাহার উপর আবার ভাবুক. প্রেমবিভোর প্রেমানন্দের কণ্ঠস্বর! যেন স্বর্গ হইতে কলসে কলসে সুধা ঢালিয়া দিতেছে! নির্জ্জন বটবৃক্ষমূল প্রেমানন্দের গানের পর আরও নির্জ্জন হইল. প্রেমানন্দের নয়ন হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় ধারা বহিয়া পড়িতেছে। ভয় হয়, ভাবুক প্রেমানন্দের সুখের বর্ণণা করিতে গিয়া—কোন্ সুখে তাঁহার দু'নয়নে শত ধারা বহিতেছে, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া হয় ত কেন, নিশ্চয়ই আমি তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিতে না পারায় সকল্ গোল করিয়া ফেলিব। তাই এইখানেই অন্য রাত্রের মত লেখনী বন্ধ করিলাম।

পাঠকগণ! আপনারা একবার আপন আপন প্রাণে প্রেমানন্দের অবস্থা চিন্তা করুন। আমি সে অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিয়া আপনাদের করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

[ ২ ]

ভাববিভোর মহাপুরুষ কি ভাবে যে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, তাহা বর্ণনে যে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। কারণ, ভাবুক ভক্তের প্রাণের ভাব ভাবুক না হইলে—ভক্ত না হইলে বুঝিবে কিরূপে? আমি ভাবুকও নয়, ভক্তও নয়; কাজেই সে বিষয়ের সন্ধান বড় দিতে পারিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, রসিক-কবিকুল-শিরোমণি জয়দেবের কবিতার রসাস্বাদনে প্রেমানন্দের সে রাত্রি ভোর হইয়াগিয়াছিল। মহাপুরুষ প্রাতঃ কৃত্য সমাপনান্তে বসিয়া জপ করিতেছেন। ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল, তথাপি রসিকচাঁদ আসিলেন না। প্রেমানন্দ বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া স্নান আহ্নিক ও আহারাদি সমাপন করিলেন। বেলা যখন ৩টা, তখন প্রেমানন্দ গান ধরিয়াছেন—

(হরি) তোমারি মতন, এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার।
ওহে জীবন-বল্লভ,—নাথ, তুমি আমার আমিও তোমার ॥
অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর
ভুলিয়া তোমারে ক'রেছি অন্তর
দেখা দাও—দেখা দাও—
আর থেক না অন্তরে প্রেমাধার ॥
ভালবাসা দিয়ে পুরাও মন আশা
ঘুচে যাক্ দীনের বিষয় পিপাসা
নাসহে—দুরাশা—
তোমায় ভালবেসে জুড়াক্ প্রাণ আমার ॥
দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে
প্রাণে প্রাণে আমায় কত ভালবেসে
(তুমি) ছাড়িয়ে—থাক না—
তবু ভালবাসা বুঝি না তোমার ॥
দিয়েছ শকতি বলিতে করিতে
খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে
দেখিতে—শুনিতে,—
নাথ, তোমা বিনা বল নাই আমার ॥
দীনবন্ধু হরি দীনজন-ত্রাতা
তোমা বিনা কে আর জানে মনোব্যথা,
(তুমি) যা করাও (আমি) তাই করি—
তুমি হরি সর্ব্বমূলাধার ॥

প্রেমানন্দ গদগদ কণ্ঠে গাহিতেছেন, দু'নয়নে শতধারে প্রেমাশ্রু পতিত হইতেছে, এমন সময় কোথা হইতে হাসিতে হাসিতে রসিকচাঁদ আসিয়া

উপস্থিত। প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“গুরুদেব! আপনার আদেশ-মত গতকল্য বিশ্রাম করিতে যাইয়া বড়ই এক মজার কাণ্ড দেখিলাম। আমিও প্রায় মজিতেছিলাম, কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে উত্তীর্ণ হইয়াছি। বিশ্রাম ত খুব অল্পই হইয়াছে। এক্ষণে আমার পূর্ব্বকথিত প্রশ্ন চাপা থাকুক, সে মীমাংসা পরে হইবে। এখন দয়া করিয়া বলুন আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি? আর যেখানে সেখানে যার তার খাইলে ধর্ম্ম হয় কি না?”

প্রেমা!—“বৎস, হঠাৎ এমম কথা কেন বলিতেছ? বোধহয় কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, সরলভাবে আমাকে সকল খুলিয়া বল।”

রসিক।—“প্রভো! গত কল্য বাবুদের ছুটির দিন ছিল। প্রীতিপ্রফুল্ল-চিত্তে বহু লোক একত্রে মিলিয়া একটী বাগানে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী খাইতেছিলেন। আসনের বিচার নাই, খাদ্যের ও উচ্ছিষ্টেরও বিচার নাই—জাতি ত বোঝাই কঠিন। সকলেরই গায়ে জামা, বাম হস্তে মুখমালিন্য মুছিবার জন্য নানাপ্রকারের বস্ত্রখণ্ড। মুখে চুরুট, চুলের ভাবভঙ্গি সকলেরই একরূপ। বাহ্যিক ব্যবহারে বা পোষাক পরিচ্ছদে সকলকেই একজাতি বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যে আমার পূর্ব্বপরিচিত দু'একটী বাবুও ছিলেন, তাঁহারা আমাকে দেখিয়া খুব গর্ব্বভরে বলিলেন, “ওরে পাগলা! ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জীবনটাকে এই সকল রসাল ভোগ হইতে আর কতকাল বঞ্চিত রাখ্‌বি? খাবার সহিত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ? এখন আয়! আগে কিছু খাবি আয়। আগে পেট ভরিয়া খা, পরে ধর্ম্ম কর্‌বি।” আমি ঐ সকল বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহারা সব কি জাতি এবং এই সকল খাদ্য কে রন্ধন করিয়াছে, তাহা না জানিয়া আমি খাইব কেমন করিয়া? আমি যে ব্রাহ্মণ-সন্তান। আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া আমাকে বলিল, “বাপু হে,

জাতিটাতি আমাদের এখানে পাবে না, আর পাইলেও আমরা তা মানি না, আমাদের দলে সকল রকম জাতিই আছে। আর খাবারদাবার কে তৈয়ার করিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সে সব বায়না ছাড়িয়া, এখন যদি খাবার ইচ্ছা থাকে, তবে আইস, নচেৎ নিজের পথ দেখ।” গুরুদেব! এই সব শুনিয়া আমি আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। আজ আপনার নিকট আসিবার সময় পথেই সেই বাগান বাড়ী দেখিয়া সেখানে যাইয়া দেখি যে, গতকল্যকার দু'একটী বাবুভাই সেইখানেই বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতেছে, আর মদ খাইতেছে। আমাকে দেখিয়াই একজন ছুটে এসে আমাকে ধরিয়া টানাটানি। আমি প্রথমতঃ মিষ্টবাক্যে, শেষে অল্প অল্প মিষ্ট-কটুবাক্য প্রয়োগে একটু যোড় করিয়াই তাহাদের কবল হইতে নিস্কৃতি পাইয়া, সন্দিগ্ধ চিত্তে আপনার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিন যে, এ সব কি? খাবারের সহিত ধর্ম্মের ও জাতির সম্বন্ধ আছে কি না? আর যেখানে সেখানে যা-তা খাইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করা চলে কি না?”

প্রেমা।—“রসিকচাঁদ, তোমার কথায় আমার হাসিও পায়, দুঃখও হয়। যেরূপ দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতেছি যে, নিজের মনগড়া কিছু কিছু নূতন নূতন শাস্ত্র বাহির করিতে না পারিলে আর চলিবে না।”

এই বলিয়া প্রেমানন্দ করযোড়ে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাতর ভাবে বলিলেন,—“হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে ধর্ম্মময়! আর্য্যজাতির—সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এত অবনতি হইল।” আবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রসিকচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“বৎস! আর বলিবার কিছু নাই। এখন দেখিতে পাইতেছি যে, ধর্ম্ম কেবলমাত্র নামেই বর্ত্তমান আছে, কাজে প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ আজকাল অতি অল্পই দেখা যায়। প্রকৃত ধর্ম্ম যে কি,

আর কি প্রকারেই যে তাহা আচরণ করিতে হয়, তাহা অনেকেই জানে না বা জানিবার জন্য চেষ্টাও করে না। কেবল পশুর মত পেট ভরিয়া যা-তা খাওয়া এবং অলীক আমোদ-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করাকেই এমন দুর্লভ জীবনের কর্ত্তব্য এবং সভ্যতার চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। ধর্ম্ম কি, তাহা জানিলে এবং ধর্ম্মালোচনা করিলে ও ধর্ম্মকথা শুনিলে তবেই ত বুঝিতে পারিবে যে, ধর্ম্মের সহিত কিসের কি সম্বন্ধ আছে? বৎস! তুমি যে উঁহাদিগের আগ্রহে আহার না করিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ, এ অতি উত্তমই করিয়াছ। অনেকে অনেক সময় যে সঙ্গে থাকে, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া বা গুরুজনের অনুমতি না লইয়া, লোভের বশীভূত হইয়া, আপন কর্ত্তব্য স্থির না করিয়াই দলে মিশিয়া যায়। ভবিষ্যতে কি যে হইবে তাহা ভাবিয়া দেখে না। এই সকল কারণেই আজকাল সনাতন আর্য্যধর্ম্মের এত অবনতি দেখিতেছ। বৎস! তোমাকে একটী বিষয়ে বলিয়া রাখি—এটি বেশ মনে রাখিবে। যখনই যাহা কিছু তোমার ব্যবহার-বিরুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখনই সেই স্রোতে গা ভাসান না দিয়া কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে। রিপুর বশে মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া অধঃপাতে যাইতেছে; "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" এই কথাটী অতি সত্য। লোভের বশীভূত হইয়া ক্ষণিক সুখের জন্য ইহ-পরকালের অমূল্য ধর্ম্ম-ধনকে যে বিসর্জ্জন দেয়, সে অতিমূর্খ। কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যই এই মনুষ্য-দেহ লাভ হয় নাই। ইন্দ্রিয়লালসার চরিতার্থতা অন্যান্য পশ্বাদি যোনিতেও হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মালোচনা বা সৎসঙ্গ দ্বারা আত্মার উন্নতি বিধান একমাত্র এই মনুষ্য-দেহ ভিন্ন অন্য দেহে সম্ভব নহে। আহার-নিদ্রাদি পশু-পক্ষীতেও আছে, মনুষ্যেও আছে; সুতরাং সে জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়—কেবল ধর্ম্মের জন্যই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র-কারগণ তাই বলিয়াছেন,—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

সুতরাং বিশেষভাবে বিচার করিয়া না চলিলে দু'দিন পরে আবার সেই ঘৃণ্য পশ্বাদি দেহই পাইতে হইবে।

বৎস! আহার সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে আহার তিন প্রকার। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলেই আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার বিনাশের ন্যায় রজঃ ও তমঃপ্রবৃত্তি হ্রাস হইয়া প্রাণে পবিত্র ভাবের উদয় হয়। যাঁহারা যথার্থ ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা জীবনকে পবিত্র করিয়া রাখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা বরং উপবাসী থাকিবেন, না খাইয়া জীবনপাত করিবেন, তথাপি হৃদয়ের সত্ত্বগুণ-বিলোপক রাজস বা তামস বস্তু আহার করিবেন না। আহারই যে চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের একমাত্র মূল কারণ, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ঐ শুন শাস্ত্র বলিতেছেন—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ আহার দ্বারাই সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি জন্মে। আহারের সহিত ধর্ম্মের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্ম কি তাহা জানে না বা ধর্ম্মপথে চলে না, সেই ঘোর অহঙ্কারী তামসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরাই বলিয়া থাকে যে, আহারের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। বৎস! শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, ভগবল্লাভ সত্ত্বগুণের বিকাশ না হইলে হয় না, আর সেই সত্ত্বগুণের বিকাশ একমাত্র পবিত্র সাত্ত্বিক আহার ও সদালোচনা দ্বারাই হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক আহারে জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পায়, দেহের বল, চিত্তের প্রসন্নতা, শান্তিময় ভাব একমাত্র সত্ত্বগুণের বিকাশেই হইয়া থাকে। সুতরাং সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে প্রস্তুত সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করিবে। অজ্ঞাত-কুলশীলের হাতে বা রজস্তমোভাবাপন্ন ব্যক্তির হাতে আহার নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হাতে আহার করিলে, সেই রোগ সহজেই দেহে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। বৎস! ইহা বেশ জানিয়া রাখ যে, সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি, রাজসিক আহারে রজোগুণ বৃদ্ধি এবং তামসিক আহারে তমোগুণ বৃদ্ধি হইবেই হইবে। কোন্ গুণের কিরূপ ফল এবং তাহা দ্বারা কি প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে তোমাকে সব বলিব। পুনরায় তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যেন বেশ মনে থাকে যে, আহার-বিহারের দোষে বা গুণেই ধর্ম্মের হানি বা বৃদ্ধি হয়।

তুমি যে বাবুদিগের কথা বলিলে, উহারা এখন অলীক আমোদের নেশায় মত্ত। যখন ঐ মত্ততা ঘুচিয়া যাইবে, তখন এই মনুষ্যত্বের হানিজনিত ঘোর অনুতাপে, রোগাদির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, আপন আপন ভুল বুঝিতে পারিয়া শেষে কত অনুতাপ করিবে, দেখিতে পাইবে।

রসিক।—দেব! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত না হই। আর যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তদনুরূপ উপদেশ দিন। আপনার এই সকল অমৃতময় উপদেশাবলী শ্রবণে আমার ধারণা হইতেছে যে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বোধ হয় সাত্ত্বিক আহার-বিহারের বলেই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ভগবদুপাসনায় রত থাকিতে সমর্থ হইতেন।

প্রেমা।—"রসিকচাঁদ! বোধহয় কেন, ইহা অতি সত্য কথা। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সত্ত্বগুণপ্রধান আহারের বলেও তদুদ্ভূত সাত্ত্বিক তপস্যার বলেই দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, অদ্ভুত অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন।

আহারের দোষে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, আর ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়াই সাধন ভজনের ব্যাঘাৎ ঘটাইয়া, মনুষ্যকে আপন কর্ত্তব্য ভুলাইয়া, পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দেয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, খাদ্য দ্রব্যের গুণে শরীর সুস্থ থাকে, আবার খাদ্য বস্তুর দোষেই নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেয়। মৎস্য-মাংসভোজী ব্যক্তি বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চেষ্টা করে না যে, ঐ সকল দ্রব্য ভোজনে ঐ সকল জীবের কুপ্রবৃত্তি ও দেহস্থিত রোগাদি কি প্রকারে দেহে অল্পে অল্পে সংক্রামিত হয়। আজকালকার মৎস্য-মাংসাদি ভোজনপরায়ণ লোক অপেক্ষা প্রাচীন ফলমূলাহারী আর্য্য-সন্তানগণ সবল ও দীর্ঘ জীবী ছিলেন। সর্ব্বদাই রুগ্ন ও ভগ্নাবস্থায় ইহাদিগের ন্যায় ঔষধের সেবাপরায়ণ ছিলেন না। কাজে কাজেই আহারই যে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, আহারের দোষ-গুণেই যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজন ও দমন হইয়া থাকে ইহা বোধহয় বেশ ভালরূপেই বুঝিলে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ অবিহিতও অবিশুদ্ধ আহার-বিহার বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য"

রসিক।—"প্রভো! আশীর্ব্বাদ করুন, এবার যেমন প্রলোভনের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছি, ভবিষ্যতেও যেন ঐরূপ স্থির থাকিয়া আপনার আদেশ পালন করিতে পারি।"

এই বলিয়া রসিকচাঁদ করযোড়ে, ভাব-বিগলিত কণ্ঠে অতি ব্যাকুলতার সহিত গাহিলেন।—

(আমায়) দাও অচল অটল বিশ্বাস ভকতি
রতি মতি রাঙ্গা চরণে।
(আমার) চঞ্চলচিত কর প্রশমিত
করুণা-বারি সিঞ্চনে॥

খুলে দাও আঁখি অন্ধ
( আমার ) ঘুচে যাক্ মনের দ্বন্দ্ব
( আমি ) তোমায় হেরি হরি আছ বিশ্ব-ভরি
অপ্রাকৃত প্রেম-নয়নে।
আমার দুর্ব্বল চিতে শকতি
তুমি দাও নাথ দিবারাতি
(যেন) সুখেতে দুঃখেতে পারি হে ডাকিতে
( তোমায় ) ভাবিতে জীবনে মরণে॥
নাশ অভাব কুভাব কামনা
আর নূতন বাসনা দিও না
একবার দিয়ে দরশন হে প্রাণরমণ।
জুড়াও তাপিত জীবনে॥
আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো
তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো
আমি চলি তব পথে না পড়ি ভ্রমেতে
গহন সংসার-কাননে॥
আমার জাগাও আকুল পিপাসা
তোমায় দেখিবারে হৃদে লালসা
তোমার ভাবে ভুলে যাই আপনা হারাই
( নাম) শ্রবণ মনন কীর্ত্তনে॥
এই নিবেদন তব কাছে
আর যে কটা দিন বাকী আছে
(যেন) মন প্রাণ খুলে গৌর-হরি ব'লে
কাটাই আনন্দ জীবনে॥

রসিকচাঁদ ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতেছেন, আর প্রেমানন্দ তালে তালে করতালি দিতেছেন। ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে রসিকচাঁদ কতই বলিতেছেন; কিন্তু বিধি তাহাতে বাদ সাধিলেন,—তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমে রুদ্ধ হইয়া গেল, ভাবে বিহ্বল হইয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় প্রেমানন্দের পদতলে পড়িয়া গেলেন। প্রেমানন্দও ত তাঁহার গুরু বটে। তিনিও বিভোর হইয়াছিলেন। কাজেই ভাবের উচ্ছ্বাসে প্রেম-তরঙ্গ বেশ একটু প্রবলতর বেগ ধারণ করিল। ভাবুক পাঠকগণ আপনারা আপন আপন অন্তরে ইহা অনুভব করিয়া আনন্দ লাভ করুন। আমার কলুষিত লেখনীতে আর সে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাদিগের প্রাণে ব্যথা দিতে চাহি না। সে ভাব প্রকাশে আমার ক্ষুদ্র লেখনী সম্পূর্ণ অসক্ত।

কিছু সময় এই ভাবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া প্রেমানন্দ রসিকচাঁদকে তুলিয়া বক্ষে লইলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "বৎস! স্থির হও। ভগবদুপাসনার সময় উপস্থিত। যাও, যথাসময় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ কর গিয়ে। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, যেন বৃথা সময়ক্ষেপ না হয়। এক্ষণে নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন কর গিয়ে; তারপর সুবিধা হইলে আসিও; আবার সদালোচনা করা যাইবে।" প্রেমানন্দের আদেশে রসিকচাঁদ প্রস্থান করিলে প্রেমানন্দও "প্রভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" এই বলিয়া বৃক্ষমূল হইতে গঙ্গার ঘাটে অবতরণ করিলেন।

[ ৩ ]

শুক্লা প্রতিপদ, রাত্রি চারিদণ্ড গত, মহাপুরুষ সেই পূর্ব্ববর্ণিত গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। জীবকুল যেমনই সমস্ত দিন প্রখর মার্ত্তণ্ড-তাপে কষ্ট অনুভব করিতেছিল তেমনই এখন পবনদেবের কৃপায় শান্তি অনুভব করিতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে রজত ধবল মনোমুগ্ধকর চন্দ্রকিরণ বটবৃক্ষমূলে পতিত হইয়া ধ্যান নিমগ্ন মহাপুরুষের প্রফুল্ল বদনকমলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতেছে, পথের জনকোলাহল ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, হঠাৎ অদূরে কে যেন মধুর স্বরে গাহিল ;—

"তাঁরে পেলাম কই।

আমি দিবানিশি ঘুরে ঘুরে যার তরে পাগল হই ॥"

ক্রমে স্বর নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রেমানন্দের ধ্যান ভঙ্গ করিল এবং সেই সুধামধুর বীণাঝঙ্কার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, মহাপুরুষ এদিক ওদিক চাহিলেন, দেখিলেন, পূর্ব্ব-পরিচিত সেই রসিকচাঁদ আসিতেছে। প্রেমানন্দ আনন্দভরে হরিবোল ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ক্রমে রসিকচাঁদ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে বসিয়া করযোড়ে তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রেমানন্দ বলিলেন, "বৎস! বেশ আনন্দ পাইতেছ ত ?"

রসিক :—"আজ্ঞা হ্যাঁ প্রভু! আপনার ন্যায় সদানন্দময় পুরুষের সঙ্গ পাইয়াও যদি আনন্দ না পাইব, তবে আমার নিতান্তই অদৃষ্ট মন্দ বলিতে হইবে।" রসিকচাঁদ এইভাবে নিজ দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—গুরুদেব! আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেশ দ্বারা বেশ বুঝিয়াছি যে, সাধুসঙ্গ ভিন্ন আর উন্নতির উপায় নাই, কিন্তু আপনার কথিত লক্ষণসম্পন্ন সাধু যতক্ষণ না পাওয়া যাইবে ততক্ষণ কিরূপভাবে থাকিতে হইবে দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।

প্রেমা।—বৎস! পূর্ব্ব কথিত লক্ষণযুক্ত মনুষ্যই যে কেবল সাধু, আর তাহার সঙ্গেই যে সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া যাইবে অন্য কোন প্রকারে পাওয়া যাইবে না তাহা কখনও মনে করিও না। সৎগ্রন্থ পাঠ, পাঁচজনে বসিয়া একত্র সৎবিষয়ের কথোপকথন, সৎবিষয়ের চিন্তা প্রভৃতি বহু প্রকারেই সাধুসঙ্গের ফল পাওয়া যায়। সুতরাং বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যে সকলগ্রন্থে সৎবিষয়ের আলোচনা আছে, যাহা পাঠে সাধুভক্তগণের জীবন-বৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী অবগত হওয়া যায় তাহা পাঠ করিবে, এইরূপভাবে আচরণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গের প্রবল ইচ্ছা হইলে ভগবানই সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিয়া থাকেন। তবে বেশ নিবিষ্টচিত্তে এ সকল বিষয়ের আলোচনা চাই, নতুবা শান্তি পাইবেন না। কেবল হুড় হুড় করিয়া গ্রন্থ পাঠ করিয়া গেলে অথবা তোতা পাখীর মত কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া রাখিলে কিছুই হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপদেশগুলি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম না হয়, ততক্ষণ শ্রদ্ধার সহিত উহা পাঠ করিতে হইবে এবং বেশ নিষ্ঠার সহিত তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে।

অনেকে পুস্তকের অক্ষরে চোখ বুলাইয়া রাখিয়া দেয়, মনে করে পড়া হইল, কিন্তু যেটী পড়িবে সেটী যদি মর্ম্মে মর্ম্মে বেশ ভালরূপ অনুভব করিতে না পারিলে তবে সে পড়া কোন কাজেরই হয় না।

কোনও বস্তু আহার করিয়া পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন তাহার কোন ফল পাওয়া যায় না, তদ্রূপ শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনুষ্ঠান না করিলে—উপদেশ মত কার্য্য করিয়া কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে পাঠের কোনই ফল হয় না। অনুষ্ঠানের অভাবে অনেক শাস্ত্র পাঠককেও "শাস্ত্রপাঠে আনন্দ নাই" এইরূপ অযৌক্তিক কথা বলিতে শুনা যায়। তাহাদিগকে কোনও শাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটী কথারও যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না, এই সকলের একমাত্র কারণ কেবল পাঠোপযোগী অনুষ্ঠানের

অভাব। তাই বলি রসিকচাঁদ! কেবল শাস্ত্রে সদুপদেশ আছে, সৎকথা আছে বলিয়া উহা স্পর্শ করিলেই সুখ পাইবে না, শাস্ত্রবাক্যরূপ সাধুসঙ্গ অহরহঃ করা চাই। যদি তাহ করিতে পার তবেই শাস্ত্রের প্রকৃত পবিত্রভাব সকল হৃদয়ে উদয় হইয়া হৃদয়স্থিত যাবতীয় অভাব, অন্ধকার দুর হইয়া প্রকৃত আনন্দ লাভে প্রাণ মন প্রফুল্ল হইবে। আমার কয়েকটী বন্ধুকে দেখিয়াছি, তাঁহারা দেশবিদেশ ভ্রমণ না করিয়াও কেবল শাস্ত্রপাঠরূপ সাধুসঙ্গের বলে অতিসুন্দররূপে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছেন। অতএব সাধুপুরুষগণের উপদেশাবলী সহ সদ্গ্রন্থ পাঠ করিবে। গৃহে বসিয়া বিনা ক্লেশে সাধুসঙ্গ-জনিত ফললাভের ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

রসিক।—গুরুদেব! গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসকদিগের মধ্যে প্রায়ই পরস্পর বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? উপাসনা ও মূর্ত্তি ভেদ হইলেও আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেশদ্বারা সকলেরই আরাধ্যদেব যেন এক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ব্যবহারে সাধারণের ভাব ঠিক বিপরিত লক্ষিত হয় কেন? পরস্পর পরস্পরের প্রতি যেন খড়্গহস্ত। আমি সেদিন কোনও একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তথায় দু'একবার হরিনাম করায় এবং আমার গলায় তুলসীর মালা দেখিয়া বাড়ীর কর্ত্তা তো আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট, তিনি একটু রুক্ষস্বরেই আমাকে বলিলেন—"ওহে বাবাজি! আমরা হরিভজার দল নই, তুমি হরিবোলাদের কাছে যাও; আমার এখানে তোমার সুবিধা হইবে না।" তাঁহার হাবভাব ও পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া যেন বোধ হইল তিনি শাক্ত। কারণ তাঁহার পরিধানে রক্ত বস্ত্র, কণ্ঠে বড় বড় রুদ্রাক্ষমালা, কপালে সিন্দুরের উর্দ্ধ ফোঁটা। তাঁহার এইরূপ উক্তি শুনিয়া আমি বড়ই সংশয়যুক্ত হইয়াছি। যাঁহারা শাক্ত, তাঁহাদের কি হরিনাম করিতে বা

যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহাদিগকে কি শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নাম শ্রবণ বা উচ্চারণও করিতে নাই? পরস্পর এরূপ দলাদলি এবং পরস্পর একে অন্যের উপাস্য দেবতার প্রতি নানাবিধ কুৎসিত দোষের আরোপ করিয়া নিন্দাবাদ করে কেন? ইহার অর্থ কি?

প্রেমা।—বৎস! এ অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়াছ, আমি ওরূপ অসংখ্য অসংখ্য ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আবার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এমন উচ্চ সাধকের দর্শনও ভাগ্যে ঘটিয়াছে যে, সম্প্রদায়-বিশেষের উপর বিদ্বেষ বা দেবতা-বিশেষের উপর দোষারোপের ধার তাঁহারা মোটেই ধারেন না। তাঁহাদের সঙ্গ ও তাঁহাদের উপদেশ যে কত মধুময় তাহা যাঁহাদের ভাগ্যে হইয়াছে তাঁহারাই বলিতে পারেন। তুমি যেভাবের কথা বলিলে ঐ ভাব সাধারণতঃ অল্প-জ্ঞানবিশিষ্ট শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্খদের ভিতরেই দেখিতে পাইবে। প্রকৃত ভগবত্তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ সকল ক্ষুদ্রতা একেবারেই নাই। কেবল সৌর শক্তাদি পঞ্চোপাসক কেন, উন্নত হিন্দু-সাধক ও উন্নত মুসলমান বা অন্য জাতীয় সাধকদিগের ভিতরেও পরস্পর ভেদভাব লক্ষিত হয় না। যাহারা ধর্ম্মের ও উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম জানে না; কেবল বাহ্য বেশভূষাদি আড়ম্বর লইয়াই ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যেই ঐরূপ দলাদলি দেখিতে পাইবে। কোনও উচ্চ পর্ব্বত অথবা উচ্চ প্রাসাদের উপর উঠিলে যেমন নিম্নস্থিত উচ্চ-নীচ সকল পদার্থই সমতল দেখায়, সেইরূপ সাধন-মার্গে উন্নত হইয়া সাধক যত ঊর্দ্ধে উঠিবে—প্রকৃত স্বরূপ-তত্ত্ব যত উপলব্ধি হইবে ততই ভেদভাব, দলাদলি কমিবে। তুমি শাক্ত, আমি বৈষ্ণব, অমুকে শৈব ইত্যাকারভাব বিদূরিত হইবে। উচ্চস্তরে আরূঢ় সাধক, সকলেই যে সেই একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ পরম পিতা পরমেশ্বরের উপাসক তাহা বেশ বুঝিতে পারেন। প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধি

হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞ সাধক বুঝিতে পারেন যে, সকলেই সেই পরম মঙ্গলময় বিশ্বপাতাকে ডাকিতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক, গম্যস্থান এক, আরাধ্য বস্তু এক, বাহিরে কেবল প্রকার ভেদ মাত্র। একটী জাগতিক দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর।

মনেকর কোনও গ্রামে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন দিক দিয়া বহু পথ আছে তোমরা কয়েকটী বন্ধু এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া গন্তব্য গ্রামাভিমুখে চলিতে লাগিলে ক্রমে নানাদিক হইতে আসিয়া যেমন সকলেই সেই নির্দ্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হইবে, তদ্রূপ নানা প্রণালীভেদে যে যে কোনও পথ ধরিয়াই সাধনা করুক না কেন যদি প্রকৃত লক্ষ্য সেই পরম পিতাপরমেশ্বরেই থাকে তবে কেহবা বিলম্বে কেহবা শীঘ্র সেস্থানে যাইয়া পৌঁছাইবে। প্রথমতঃ কথা হইতেছে এই যে, পথ বুঝিয়া চলা চাই, প্রকৃত পথ জ্ঞাত আছেন, এমন ব্যক্তির নিকট পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমন বলিয়া দিতে পারিবেন অন্যে কি সেরূপ বলিতে পারেন? তাহা যেমন পারেন না, সেইরূপ সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে যাঁহারা জানিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ ধামের পথ যাঁহারা জ্ঞাত আছেন এইরূপ সদ্‌গুরু লাভ করিয়া প্রকৃত পথের তত্ত্ব জানিয়া লইতে হইবে। এই নিয়মটী যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ার জন্যই এইরূপ নানা প্রকার বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়। যাঁহারা সদ্‌গুরু লাভ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোকে বিভিন্ন পথাবলম্বী হইলেও তাঁহাদিগের গন্তব্যস্থানের সন্ধান বুঝিয়া লইতে পারেন তাহাদের ভিতরে বিদ্বেষভাব তো থাকেই না, অধিকন্তু আপন সঙ্গীজ্ঞানে সকলকে ভালবাসিয়া থাকেন। আর যাহারা নামমাত্র উপাসনার ভাণ করিয়া বেড়ায়, যথার্থ গম্যস্থানের স্বরূপ বোঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করে না, তাহারাই ওরূপ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ও নিন্দুক হয়।

বৎস! বাড়ীর কর্ত্তাকে কেহ বাবা, কেহ দাদা, কেহ কাকা, কেহ

মামা, কেহবা প্রভু ইত্যাদি নানাভাবে সম্বোধন করিতেছে। কিন্তু সেই কর্ত্তা, যেমন একই থাকেন ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধনের সহিত যেমন ভিন্ন আকার ধারণ করেন না; কেবল সম্বোধনকারির সহিত যথাযথভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীভগবানও সাধকের মনোভিলাষ পূরণের জন্য তাহার বাঞ্ছামতে সাধককে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন মাত্র; নতুবা প্রকৃত শাক্তে ও প্রকৃত বৈষ্ণবে কোনই প্রভেদ নাই। যে শাক্ত সে-ই বৈষ্ণব, যে বৈষ্ণব সে-ই শাক্ত, যে শ্যাম, সেই শ্যামা, আবার যে শ্যামা সেই শ্যাম। একটী ভক্ত এক সময় প্রাণের আবেগে গান করিয়াছিলেন ;—

"হরি কোন্‌টী তোমার আসল নাম তাই সুধাই তোমারে।
তোমায় যে যা বলে তাতেই মিলে চিন্‌তে নারি ব্যবহারে॥"

আবার অন্য ভক্ত গাহিয়াছেন,—

"সংসারে পরমারাধ্য সেই সে এক জনা।
( ও সে ) নিরাকার সচ্চিদানন্দ, তারে কেউ চেনে কেউ চেনে না॥
বৈষ্ণবে কয় বিষ্ণু হরি, শৈবে কয় শিব জটাধারী, শাক্তে শঙ্করী ;—
সে কি পুরুষ নারি, চিন্‌তে নারি, যুক্তিশাস্ত্রে মেলে না॥
চরণ নাই সে চল্‌তে দক্ষ, নয়ন নাই সে করে লক্ষ্য, স্থূলাদি সূক্ষ্ম ;—
( ও তার ) বদন নাই সে বলে বাক্য অলক্ষ্যতার নিশানা॥"

সংসারে একমাত্র আরাধ্যই তিনি, তবে তিনি কি পুরুষ না প্রকৃতি, হরি না হর, শঙ্কর না শঙ্করী তাহা ঠিক কে বলিতে পারে? তবে এইটী জানিয়া রাখ যে, "তিনিই সব, তাঁহাতেই সব।" তাই বলি বৎস! যদি প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইতে ইচ্ছা থাকে, যদি ভাব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও, ভক্তির প্রভাবে যদি হৃদয় নির্ম্মল করিয়া মানব জনম সার্থক করিতে সাধ থাকে তবে নিন্দাবাদ ছাড়িয়া, দেবতা বা সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষভাব একেবারে ভুলিয়া ইষ্ট সাধনায় রত হও, নতুবা শান্তি

পাইবার আশা একেবারেই নাই। নিশ্চয় জানিও যে, মূর্ত্তিভেদে সাধকের নিকট নানাভাবে প্রকাশ হইলেও শ্রীভগবান্ এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মনে রাখিও না।

রসিক।—প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় ক্রমান্বয় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে। বহুস্থানে বহু লোকের সঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু কৈ কেহইত এরূপ ভাবের কথা বলে নাই, বরং উপাসকগণের বিদ্বেষ ভাবই যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। প্রভো! দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ দানে আমাকে কৃতার্থ করুন।

প্রেমা।—বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর। কলির প্রথম সন্ধ্যায় যখন এইরূপ ভাবে জীবগণ মোহান্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান একেবারে হারাইয়াছিল, সেই সময় দয়াময় ভগবান আমাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া, যে সহজ পন্থা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাকে ক্রমান্বয় বলিব, এক্ষণে তোমার প্রশ্নের অনুকূল একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর ;—

কোনও নগরে কতকগুলি অন্ধ বাস করিত, একদিন কোনও কৌতুকপ্রিয় ধনীযুবক একটী হাতী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং অন্ধদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—ওহে, তোমরা হাতী দেখিবে? অন্ধগণ এই কথা শুনিয়া আপনাপন অন্ধতার বিষয় ভুলিয়া দ্রুতপদে ধনিযুবকের সঙ্গে হাতী দেখিতে চলিল। কিন্তু যাইয়া কিছু দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অল্পমাত্র জ্ঞান হইল যে, তাহারা দর্শনেন্দ্রিয় হীন। তথাপি হাতী দেখিতে হইবে, তাই তাহারা যাহার যতদূর ক্ষমতা হাতীটীর গায়ে হাত বুলাইয়া হাতী দর্শনের সাধ মিটাইল। পরে যখন ধনীযুবক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোমরা কেমন হাতী দেখিলে," তখন অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া অন্ধগণ একে একে আপনাপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

একজন বলিল—"মহাশয়! হাতটী ঠিক একটী স্তম্ভের মত," অপরে বলিল, "না মহাশয়! হাতীটী একটী দীর্ঘদণ্ড চামরের ন্যায়", অপর একজন উহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়! উহাদের বিশ্বাস করিবেন না, হাতীটী ঠিক একটী জলের জালার মত," আর একজন বলিল, "হাতীটী ঠিক কুলার মত"। এইভাবে যে হাতীর যে অঙ্গে হাত দিয়াছিল সে সেই অঙ্গেরই বর্ণনা আরম্ভ করিল এবং মনে করিল হাতীটী এইরূপই। এইভাবে পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইলে সকলেই আপনাপন দলপুষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, যাহারা আসিয়া দলে যোগ দিতে লাগিল। তাহারাও অন্ধ সুতরাং হাতীর প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব, পরস্পর পরস্পরের নিন্দা কুৎসা আরম্ভ করিল। বৎস! বেশ বুঝিয়া দেখ যে, ইহাদের মধ্যে কিন্তু প্রকৃত হাতীটার তত্ত্ব কেহই অবগত নয়। যাহা হউক—এইভাবে অযথা বিবাদে দুঃখিত হইয়া কোনও এক যোগীপুরুষ উহাদিগকে বলিলেন, "ওহে, তোমরা বৃথা কলহ করিও না, আমি যোগবলে কিছু সময়ের জন্য তোমাদিগের দর্শন শক্তি দিতেছি, তোমরা হাতী দেখিয়া লও।" এই বলিয়া মহাপুরুষ যখন তাহাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া দিলেন তখন মহাপুরুষেযর কৃপায় সকলে চক্ষু পাইয়া হাতীটার প্রকৃতরূপ প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাইয়া এবং সকলেই আপনাপন অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া বিশেষরূপ লজ্জিত ও ভেদ-জ্ঞান শূন্য হইল এবং পূর্ব্বকৃত বিবাদের জন্য পরস্পর পরস্পরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিল, ইতিপূর্ব্বে আমরা কেহই প্রকৃত হাতী দেখি নাই, কেবল এক একজন হাতির এক এক অঙ্গের আকৃতি অনুভব করিয়াছিলাম মাত্র। এক্ষণে পূর্ণাবয়ব দেখিয়া বুঝিলাম যে, আমাদিগের পূর্ব্বানুভূতি ঠিক নয়, এক্ষণে আমাদের বিদ্বেষভাব বা পরস্পর ভেদভাব আর নাই।" প্রিয় বৎস! উপাসক দলের বাদ বিসংবাদও ঠিক এইরূপ, যতদিন না পূর্ণ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিয়া স্থাবর জঙ্গম

আদি সকল পদার্থে তাঁহার অস্তিত্ব দর্শন করিতে পারে ততদিনই সাধক অন্ধ থাকে এবং অভিমান বশতঃ আপন আপন মতেরই শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা করিয়া অন্যের নিন্দা, কুৎসা করিয়া থাকে। তারপর যখন মহতের কৃপায় সাধন ভজনের দ্বারা জ্ঞানের আলো হৃদয়ে প্রকাশ পায় তখন আর ভেদ বুদ্ধি, ঝগড়া মারামারি, নিন্দা কুৎসা থাকে না, তখন সে যথার্থই—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

এবং তখন সাধক বলিতে থাকেন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণাং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

বৎস! শাস্ত্র বলিয়াছেন—শ্রীভগবৎতত্ত্ব অবগত হইলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অজ্ঞান) সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। সকল সন্দেহ দূর হইয়া এমন কি কর্ম্মপাশও শিথিল হইয়া যায়। সাধক তখন সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়া শান্তশিষ্ট ও আত্মারাম ভাবে সকলকে আনন্দদানে কৃতার্থ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব কবি একস্থানে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝল মল।
সেই দেখে, যার আঁখি হয় নিরমল॥"

রসিক।—গুরুদেব! তিনি যদি এক, তবে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন কেন? একমূর্ত্তি থাকিলে তো আর কাহারও মতভেদ হইয়া এত গোলযোগ হইত না? আমার মনে হয়, নানাভাবে, নানা মূর্ত্তিতে, কখন পুরুষ, কখনও প্রকৃতিভাবে প্রকাশ হইয়াই তো এত গোলযোগ?

প্রেমা।—রসিকচাঁদ! এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অনেক কথা

বলিতে হইবে, আজ তত সময় হইবে না, তবে শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে বলিয়া রাখি সময়ান্তরে বিশেষভাবে বলিব।

সকল জীবের প্রকৃতি একরূপ নহে। সকলেরই পাঞ্চভৌতিক দেহ বটে, কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং এই প্রকৃতিবশতঃই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ নিখিল জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্য দেশ, কাল, পাত্র ও জীবের প্রকৃতি অনুযায়ী লীলামূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন এবং ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আবির্ভাব-মূর্ত্তি ও লীলা অবলম্বনেই সেই অধরাকে ধরা যায়, নতুবা তাঁহাকে ধরে কার সাধ্য! এটী বোধহয় সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, ঐ অসীম, অনাদি, অনন্ত, পরব্রহ্মের ঐ যে নানারূপ, নানালীলা, নানাপ্রকার উপাসনা,—উহা কেবল জীব তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া কৃতার্থ হইবে সেইজন্যই।

বৎস! তিনি যদি সত্ত্বগুণ প্রধান লীলারসময় বিগ্রহ ধারণ না করিতেন তবে সেই অবাঙমনসোগোচরকে ধারণা করিতে জীব সমর্থ হইত না। আর সকলের প্রবৃত্তিও যখন একরূপ নয়, তখন সকলে যে একভাবে এক মূর্ত্তির ধারণা করিবে তাহাও অসম্ভব,তাই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান জীবের কল্যাণের নিমিত্ত নানামূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইবেন। শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতায় তিনি নিজে বলিয়াছেন ;—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

**রসিক।—দেব!** প্রাণে যাহা সন্দেহ হয়, সকলগুলিই আপনার নিকট বলিতেছি, অবশ্য ইহাতে আমার মূর্খতারই পরিচয় হইতেছে, তাহা হউক;

যখন আপনাকে পাইয়াছি তখন সকল সন্দেহই মিটাইয়া লওয়া উচিত মনে করি। আচ্ছা—শ্রীভগবান যখন জীবকে এতই ভালবাসেন, জীবের জন্য যদি তিনি এত কষ্টই স্বীকার করেন তখন জীব—বিশেষতঃ মনুষ্য এমনভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে কেন? আর তাহাকে দেখিতেই বা পায়না কেন?

প্রেমা।—বৎস! সত্যসত্যই সেই চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবান্ জীবকে ভালবাসেন; তাঁহার ভালবাসা না থাকিলে জীব মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে পারে না, তথাপি যে মানুষ তাহাকে দেখিতে পায় না কেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে অনেকটা বলা হইয়াছে, পুনর্ব্বার বলিতেছি শ্রবণ কর, কেবল বাহিরে মানুষের সাজে সাজিয়া মানুষ বলিয়া পরিচয় দিলে হইবে না, প্রকৃতিও যথার্থ মানুষের মত হওয়া চাই। যাহার অন্তরে বাহিরে মনুষ্যত্ব থাকে সে-ই প্রকৃত মানুষ। নতুবা যাত্রার দলে রাজার পোষাক পরিধান করিয়া অভিনয়ান্তে যেমন পোষাকাভ্যন্তরস্থ নিজ স্বরূপাবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে তদ্রূপ যাহারা বাহিরে মনুষ্যের পোষাক পরিধান করিয়া অন্তরে পশুভাবের পোষণ করিয়া থাকে তাহারাই অহঙ্কারের ঠুলি চক্ষুতে দিয়া দয়াসিন্ধু শ্রীভগবানের অপার অসীম মহিমা কিছুই বুঝিতে পারে না।

বৎস! এই দেহ গেহাদি যে অতিশয় মোহজনক ও ক্ষণস্থায়ী, ইহার মমতায় যে প্রকৃত সুখ কখনই হইতে পারে না, সে বিষয়ে কথঞ্চিত আলোচনা হইয়াছে আরও সময়ান্তরে করা যাইবে। এক্ষণে এইটুকু জানিয়া রাখ যে, সদাচার ও সদালাপের অভাবেই মানুষ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেনা। আচার রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই কর্ত্তব্য। স্বচ্ছমল বিহীন দর্পণে যেমন সহজেই প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ আচারগুণে চিত্ত-দর্পণ সুমার্জ্জিত হইয়া কামনা বাসনাদি মলবিহীন হইলে, সহজেই তাহাতে শ্রীভগবানের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন হইয়া থাকে। চিত্তশুদ্ধ না হইলে পশুবৎ অন্তঃকরণে ধর্ম্মের প্রতিবিম্ব

পতিত হয় না, ইহা স্থির জানিবে। সাধারণতঃ যে সমস্ত আচারহীন অহঙ্কার ব্যক্তি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কেবল লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করে উহারা ধার্ম্মিক নয়, আর উহাদের আচরণকেও ঠিক ধর্ম্ম বলা যায় না।

রসিক।—গুরুদেব! আপনার কথিত বিষয়গুলি ক্রমে ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি বটে, কিন্তু মনে মনে বহু প্রশ্নের উদয় হইতেছে। দেখুন, মন বড়ই চঞ্চল, মনকে স্থির করিবার উপায় কি? একটি বিষয় ভাবিতে যাই অন্য অভাবনীয় শত শত ভাবনা আসিয়া পড়ে, সহজে কিরূপে চিত্তস্থির হয় তাহার একটি উপায় আগে বলিয়া দিন।

প্রেমা।—রসিক চাঁদ! ঠিক বলিয়াছ "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ" মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মুক্তির একমাত্র কারণ। মনস্থির না হইলে সকল কার্য্যই বিফল, বিশেষতঃ মন যদি স্থির, একাগ্র ও নিশ্চিন্ত না হয় তাহা হইলে ঈশ্বরোপাসনায় ফল পাওয়া যায় না গুরুদত্ত মন্ত্র জপ ও জপের প্রতিপাদ্য বিষয় যথাসাধ্য ভাবে ভাবনা করিতে থাক, জপ করিতে করিতেই চিত্ত ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিবে। নিয়ম করিয়া জপ করা বিশেষ প্রয়োজন। দেখ বৎস! দুর্দ্দান্ত মত্ত মাতঙ্গকেও শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তাহার প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও সে অন্যত্র গমনাগমন করিতে পারে না। দুর্জ্জয় মন-মাতঙ্গকেও যদি ঐরূপ নিয়মের শৃঙ্খলে বান্ধিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে সেও তোমার বিনা অনুমতিতে, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা তাহা করিতে পারিবে না। খুব জপ করিতে থাক দেখিবে আপনিই চিত্তস্থির হইয়া আসিবে। মনস্থির না করিয়া কেবল দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

রসিক।—প্রভো! অনেকের নিকট শুনিতে পাই যে, "ভগবানকে ডাকিব, যতবার ইচ্ছা জপ করিব তাহার আবার সংখ্যা বা নিয়মের প্রয়োজন কি?" ইহা কি তবে ঠিক নয়?

প্রেমা।—বৎস! এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। নিয়ম ব্যতিত কিছুই হয় না জাগতিক ব্যাপারেও ত দেখিতে পাও যে, নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রমে কত গোলযোগ হয়? নিয়মিত জপ, নিয়মিত উপাসনা, নিয়মিত আহার বিহারে নিশ্চয়ই মনস্থির হইবে, অনিয়মিত কার্য্য, অসদালোচনা, অসৎসঙ্গ প্রভৃতিই মনের চঞ্চলতার প্রধান কারণ। পরমভক্ত হরিদাস ঠাকুর ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠার সহিত জপ করিয়াই তিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন। নিয়মিত জপ শেষ না হইলে কোন কার্য্য করিতেন না বলিয়াই বহু চেষ্টা দ্বারাও বারবিলাসিনী তাঁহার মন টলাইতে পারে নাই! পরম ভাগবত হরিদাস প্রতিদিন শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করতঃ তিন লক্ষ নাম জপ করিতেন। দুর্ম্মুখ পাষণ্ডগণ তাঁহার ঐ নিয়মভঙ্গ করিতে কত চেষ্টা, কত যে কুব্যবহার করিয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু তিনি কিছুতেই নিয়মের বহির্ভূত হয়েন নাই। নিয়মের প্রভাবেই তাঁহার চিত্ত অচল, অটল, স্থির, নিয়মের বশীভূত থাকিয়াই তিনি অত কষ্ট সহিষ্ণু ও অপ্রমত্ত ছিলেন। নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া জপ কর মন স্থির হইবে। অদ্য রাত্র অধিক হইয়াছে এক্ষণে বিশ্রাম করিতে যাও, আবার সময়ান্তরে আসিও এ সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে।

রসিক চাঁদ মহাপুরুষের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামাভ্যন্তরে আশ্রমাভিমুখে চলিল। মহাপুরুষ তখন সেই গভীর নিশিথে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভাববিহ্বলিত কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।—

ওহে কালা! এ কি লীলা, তোমার লীলা-খেলা বুঝাবে কবে।
(আমি) অন্ধ যেমন তেমন হ'য়ে আর কতদিন রইব ভবে॥

এইটুকু গাহিয়া আর গাহিতে পারিলেন না, ভাবে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে দেহ নিস্পন্দ, চক্ষু মুদ্রিত—মহাপুরুষ ঘোর সমাধিমগ্ন হইলেন। পাঠকগণ আজ বিশ্রাম করুণ কাল প্রাতেই সাক্ষাৎ হইবে।

[ ৪ ]

সমস্ত রাত্র কি ভাবে কাটিল জানি না, কিন্তু প্রভাত হইতে না হইতেই আবার প্রেমানন্দের সহিত রসিকচাঁদের মিলন হইল।

অতি প্রত্যুষ অর্থাৎ তখনও নৈশান্ধকার একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তবে "যাই যাই" করিয়া কেবল বিদায় প্রার্থনা করিতেছে মাত্র। এমন সময় রসিকচাঁদ মহাপুরুষের নিকট গমন করিতেছে। প্রথমতঃ তাহার জানিবার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই প্রবল হইয়াছিল, তাহার উপর আবার উপযুক্ত উপদেষ্টা প্রাপ্ত হইয়া হুতাসনে হব্যাহুতির ন্যায় যথার্থই তাহার জ্ঞান লিপ্সা প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই; রসিকচাঁদ যেন অন্য কাজ কর্ম্ম একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনের সাধ সর্ব্বদাই মহাপুরুষের নিকটে থাকে, মহাপুরুষের অমিয়-মাখা উপদেশাবলী শ্রবণ করে। তাই সে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া উধাও প্রাণে ছুটিয়াছে।

ধীর-সমীরে উষার সুশীতল বায়ে যখন জীবকুল সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে সুখে শুইয়া আছে, পক্ষীকুল আপনাপন কুলা হইতে বাহির হইবে কিনা যখন ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছে না, প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনে হইতেছে প্রকৃতিদেবীও যেন স্থির ধীর-ভাবে পরমারাধ্য জগৎপতিকে আরাধনা করিতেছেন; সেই সময় সেই জন-পরিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া ধীরপদে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে ভাঁয়রো সুরে রসিকচাঁদ গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"জাগ জাগ নগরবাসী নিশি অবসান রে।
শ্রীগুরু-গোবিন্দ ব'লে উঠরে কুতুহলে,
শীতল হবে মন প্রাণ রে॥
রাধামাধব জয় বলরে দুরাশয়
হবে চির শান্তির বিধান রে॥

রাধাগোবিন্দ নাম গাও সবে অবিরাম
পরিণামে পাবে পরিত্রাণ রে ॥
হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রবে হররে কৈতবে
ত্যজ যোষিৎশয্যা পান রে ॥
গোপী গোপাল গীতি প্রাতঃ পূজনকৃতি
( কর ) স্মরণ মায়ামুগ্ধ জীব রে ॥" ইত্যাদি।

গান করিতে করিতে রসিকচাঁদ চলিয়াছে। ক্রমশঃ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখে মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় উপবেশন করার কিছু সময় পরে মহাপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হইল। এত প্রত্যুষে রসিক চাঁদকে দেখিয়া মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—"পাগ্‌লা, তোর কি রাত্রে ঘুম হয় না? এইতো প্রহরেক রাত্র থাকিতে গেলি, এর মধ্যেই যে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলি, ব্যাপার কি বল্ দেখি?

রসিক।—গুরুদেব! বলিতে কি, আপনার দর্শনলাভ হওয়া অবধি আমার কেমন হইয়াছে, রাত্রে ঘুমাইতে পারি না, দিনে কার্য্য করিতে পারি না, কেবল মনে হয় কখন আপনার দর্শন পাইব, কখন আপনার সুধা-মধুর উপদেশ শুনিব। যখন আপনার নিকট বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করি তখন সংসার চিন্তা একেবারেই থাকে না, মন প্রাণ যেন তখন কি এক অভিনব শান্তিরসে ডুবিয়া যায়, জগৎ সংসার তখন মহা আনন্দময় বলিয়া বোধহয়, কিন্তু কেন জানি না, যেমন আপনার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাই অমনিই যেন কেমন এক ভাবের হইয়া সকল ভুলিয়া যাই। সাধন ভজনে বসিলেই যত ভাবনা, যত অলসতা আসিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ভাণ্ডটি পরিপূর্ণ করিয়া বসে, আর কিছুই করিতে পারি না; ক্রমে ক্রমে যেন সকল উপদেশ, সকল শিক্ষা ভুলিয়া যাইতে বসি।

গুরুদেব! আমার অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; কিসে আমার মঙ্গল হইবে, কিসে যে এই পরিণাম দুঃখময় কিন্তু আপাত সুখকর দ্রব্যের প্রলোভনে না মজিয়া নিত্য পরমানন্দ লাভের উপযোগী হইতে পারিব, তদনুযায়ী কিছু উপদেশদানে আমাকে কৃতার্থ করুন।

প্রেমা।—বৎস! শ্রীভগবানই যে একমাত্র ইহ পরকালে যথার্থ শান্তির নিদান, জীব যতক্ষণ না তাহা বুঝিতে পারে ততক্ষণই দুঃখ পায়। ততক্ষণই সুখ ভাবিয়া—শান্তি পাইবে বলিয়া নানাপ্রকার দ্রব্যে আসক্ত হয়। জীবের মন সর্ব্বদাই বিকল্পাত্মক ও সন্দেহ মূলক, কাজেই জীব সত্যের বিষয় সন্দিহান হইয়া ক্রমান্বয় সংসারাবর্ত্তে পতিত হইয়া অবিরত ঘুরিতে থাকে। এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ভাগ্যক্রমে সৎগুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে পারে তবেই তাঁহাদের অসীম কৃপা বলে সেই ঘূর্ণায়মান জীবের উদ্ধারের উপায় হয়। বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন;—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

শুভানুধ্যায়ী আর্য্যঋষিগণও ঐসকল জীবের উদ্ধারের জন্য বহু উপদেশাদি সম্বলিত নানাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। জীব নিতান্তই মায়ার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ভ্রমেও আচার্য্যগণের উপদেশানুযায়ী প্রকৃত পথের অনুসরণ করিবে না, সর্ব্বদাই পরচর্চ্চা অসদালাপ, অসৎসঙ্গ লইয়া থাকিবে, ইহাতে আর কি করিয়া সুখ পাইবে বল? পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণের প্রদর্শিত মতানুসারে উপাসনা করা চাই। উপাসনা না করিলে শান্তিসুখ পাওয়া সুদূর পরাহত।

রসিক।—প্রভো! উপাসনা কাহাকে বলে এবং উপাসনার সহিত আচার বিচারেরই বা প্রয়োজন কি, আর আচারই বা কাহাকে বলে দয়া করিয়া এ বিষয় আমাকে কিছু বলুন।

প্রেমা।—বৎস! গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ সাম্প্রদায়িক ভাবে যে যে পথাবলম্বী, যাহার যেমন বিশ্বাস এবং যাহার যেমন শিক্ষা সেই শিক্ষানুসারে পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, পতি, সখা, প্রভু প্রভৃতি যে কোনও ভাব অবলম্বন করিয়াই কেন হউক না, একান্ত প্রাণে অকপটভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যে চেষ্টা বা অনুষ্ঠান তাহার নামই উপাসনা। এই উপাসনার প্রধান সহচর আচার, বিচার ও নিয়ম। সুতরাং উপাসককে আচার বিচারাদির অধীন থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঠিক সাম্প্রদায়িক পঞ্চোপাসকের বিভিন্ন আচার বিচারাদি পৃথকভাবে বলিতে গেলে বহু সময়ের প্রয়োজন। সকল সম্প্রদায়েরই পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান পদ্ধতি বহু বহু গ্রন্থে রহিয়াছে, ক্রমে ঐ সকল আলোচনা করিলেই এ সকল তত্ত্ব অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। তবে মোটামুটি একটি কথা তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়া দিতেছি যে, যিনি যে প্রণালিতে, যে অবস্থায়, যে ভাবে, যে কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উপাসনা করিতে মনস্থ করিবেন তাঁহারই শাস্ত্রানুযায়ী সেই ভাবের প্রাচীন সাধকগণ যে ভাবে যে পথে চলিয়া গিয়াছেন সেই ভাবে সেই পথে তাঁহাদিগের পদাঙ্কানুসরণ করা উচিত। গীতায় ভগবান্ নিজে বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন অপরলোকেও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। ঐ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে কার্য্য করে অপর লোক তাহাই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবস্মৃতি হরিভক্তি বিলাসে উক্ত আছে,—

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধুনাঞ্চ যথাবৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে॥
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং যে ইচ্ছেদ্ গতি মাত্মনঃ॥

অর্থাৎ আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, আচারই মহতের চিহ্ন, আর সাধুব্যক্তির যাহা ব্যবহার তাহাই সদাচার। অতএব যিনি নিজের মঙ্গল এবং আত্মার উন্নতি প্রার্থনা করেন তাঁহাকে একান্তভাবে সদাচার-রত হওয়া শাস্ত্রমতে একান্ত আবশ্যক।

আচার বলিলে যদিও সদাচার ও অসদাচার উভয়কেই বুঝায় বটে, তথাপি যখন ভগবদারাধনার অনুকূল আচারের কথা বলা হইতেছে তখন সদাচারই বুঝিতে হইবে। সদাচারই ঈশ্বর উপাসনার দিকে জীবকে উন্মুখ করিয়া দেয়, সদাচারই চিত্তকে সুনির্ম্মল ও সত্ত্বগুণ প্রধান করিয়া থাকে। চিত্ত সরল ও সত্ত্বগুণ প্রধান না হইলে ঈশ্বর উপাসনা দূরে থাকুক, ঈশ্বর উপাসনার ভাব বা ইচ্ছাও আসিবে না। এক্ষণে বোধহয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সদাচার অবলম্বন ঈশ্বরোপাসনায় একান্ত প্রয়োজনীয়।

রসিক।—প্রভো ; যতই আপনার মুখে উপদেশ শ্রবণ করিতেছি ততই যেন আমার শুনিবার ও জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছে। সদাচার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন। জীব ক্রমেই আচার বিহীন হইতেছে। এই সকল অমোঘ উপদেশ নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

প্রেমা।—বৎস ! তোমার ভাব দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, তোমার দ্বারা যে জগতের অনেক মঙ্গল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আচার সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলিয়াছেন ;—

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচার পরিপালনং।
নহ্যাচার বিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ গৃহস্থের সর্ব্বদাই আচার প্রতিপালন করা উচিত, কারণ আচার-

হীন অসদাচারী ব্যক্তির ইহ পরকালে কখনই সুখ হয় না। এমন কি যজ্ঞ (ঈশ্বরার্চনা প্রভৃতি) দান ও তপস্যাদিও সে ব্যক্তির সুখের হয় না।

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
আচারাৎবর্দ্ধতেহ্যায়ুরাচারোহন্ত্যে লক্ষণম্‌ ॥

অর্থাৎ আচারই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের একমাত্র প্রদাতা। আচারের দ্বারা লোকের কীর্ত্তি এবং আয়ু বর্দ্ধিত হয়। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অশুভ লক্ষণ সকল দূর হইয়া যায়, এমন কি শাস্ত্রজ্ঞান সম্যক্‌রূপে না থাকিলেও কেবল মাত্র সদাচার দ্বারা মানুষ সুদুর্লভ ভাব সকল অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

রসিক।—দেব! সদাচার সম্বন্ধে নানা কথা শুনিলাম, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নির্ব্বিক্ষেপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত সদাচার প্রতিপালন করিতে পারি। না জানিয়া, না বুঝিয়া কত যে অসদাচার করিয়াছি তাহার আর সীমা নাই; এখন বেশ বুঝিতেছি ঐ সকল মন্দ ব্যবহারের জন্যই চিত্ত নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আপনা উপদেশ প্রতিপালন করিতে পারিব কি না এখন সেই চিন্তা।

প্রেমা।—রসিকচাঁদ! ঋষিবাক্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস থাকিলে আদেশ প্রতিপালনে শক্তি পাওয়া যায়। যদি বিশ্বাস থাকে এবং বিশ্বাসের সহিত ভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা থাকে তাহা হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে আর বিলম্ব হয় না, দৃঢ় বিশ্বাস রাখ আনন্দ পাইবে।

রসিক।—দেব! গুরুর প্রতি কিরূপ ভাব রাখা উচিত এবং তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

প্রেমা।—বৎস! এ বিষয়টী যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি বিস্তৃত ও কঠিন। তবে তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন তোমাকে

বলিতেছি, শ্রবণ কর। গুরুর নিকট সর্ব্বদা নত স্বভাবে থাকিতে হয়, গুরুর বাক্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ ও অবিচারে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। গুরুর আদেশে যুক্তি বা তর্ক করিতে নাই। (তাহা বলিয়া কোন বিষয় ধারণা না হইলে তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্নোত্তরে দোষ নাই।) গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি কখনও করিবে না, তাহাতে মহাপাপ হয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে নানা শাস্ত্র হইতে বচন তুলিয়া দেখাইয়াছেন—জীবোদ্ধারের জন্য সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ পরম-পুরুষই গুরুরূপে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হন, এই উক্তি বৃথা মনে করিওনা, ইহাতে মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়ও ভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানিয়াৎ"

গুরুর নিকট প্রগল্‌ভতা অর্থাৎ অতিশয় চপলতা করিবে না, অহঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া নিষ্কপট অন্তঃকরণে বিনীতভাবে সর্ব্বদাই ইষ্টদেবতত্ত্ব জানিতে উৎসুক থাকিবে। কেহ যদি গুরুর সম্মুখে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসাকরে, তবে গুরুর আদেশ লইয়া যথাসাধ্য অল্পাক্ষরে তাহার উত্তর প্রদান করিবে। কখনও গুরুর সম্মুখে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে যাইও না। এই প্রকারে সাধারণ নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারিলে বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালনে আর কষ্ট হয় না। গুরু-শুশ্রূষার দ্বারাই যে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভহয়, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ইহার বহু বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া সাধারণ মনুষ্যের সহিত তাঁহার তুলন করে অথবা উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া, আত্মভাব গোপন করিয়া, গুরুর সহিত ব্যবহার করে, তাহার কদাচই ভক্তি লাভ হয় না। গুরুতে

ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকিলে অন্তর্যামী শ্রীভগবান আপনা হইতেই সৎশিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

রসিক।—দেব! যাহাদের ভাগ্যে গুরুদেবের নিকট বহু সময় থাকা ঘটে না, তাহাদিগকে কিরূপভাবে থাকিতে হইবে, দাসকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সরল ভাবে তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

প্রেমা।—বৎস! হৃদয়ে গুরুমূর্ত্তির ধ্যান দ্বারা তাঁহার সঙ্গলাভ করা অতি উত্তম। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে গুরুর শ্রীমূর্ত্তি বা চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা ও মনের অভাব এবং আপন অজ্ঞতার বিষয় জানানও তত্ত্বলাভের অন্যতম উপায়। তোমাকে গুরুভক্তির একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল একলব্যের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কুরুকুলগুরু মহারথি দ্রোণাচার্য্য যখন অর্জ্জুন প্রভৃতিকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা-প্রদান করিতেছিলেন, সেই সময় নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিবার কামনা প্রকাশ করায়, দ্রোণাচার্য্য তাহার পরিচয় পাইয়া, বহু তিরস্কারের পর তাহাকে শিক্ষা দিতে অমত প্রকাশ করিলেন। তখন একলব্য দ্রোণাচার্য্যের বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ইনিই আমার গুরু! আমি যখন ইঁহার চরণে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তখন কিছুতেই আর অন্য গুরু করিব না। যদি নিতান্তই আমার প্রতি গুরুদেবের কৃপা না হয়, তবে আর আশ্রমেও ফিরিব না, এ ছার প্রাণও রাখিব না। এইরূপে দৃঢ়সংকল্প হইয়া গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ একাগ্রতা দ্বারা অতি অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ে এত শক্তির সঞ্চার হইল যে, ঐ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তিকেই সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য মনে করিয়া নিজে নিজেই বাণ চালনা আরম্ভ করিলেন,

হৃদয় হইতে অভিজ্ঞতা আসিয়া আপনা আপনিই শিক্ষাপ্রণালী স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। এইরূপভাবে একমাত্র নিষ্ঠা দ্বারাই ক্রমে তিনি সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ শিক্ষিত হইলেন।

এদিকে একদিন দ্রোণাচার্য্য স্বীয় প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুন প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়াচ্ছলে বনে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী কুকুর ছিল। উঁহারা বনে প্রবেশ করিলে কুকুরটী দিগ্‌বিদিক্ ছুটাছুটি করিতে করিতে যেখানে একাগ্রমনে একলব্য ধনুশ্চালনা শিক্ষা করিতেছিলেন, সেইখানে যাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহার একাগ্রতার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। একলব্য কুকুরের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া একটী বাণ দ্বারা তাহার কণ্ঠস্বর বন্ধ করিয়া দিলেন। কুকুর মুখসংলগ্ন শরের সহিত যেখানে শিষ্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া দ্রোণাচার্য্য ছিলেন, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্রোণাচার্য্য কুকুরের ঐ অবস্থা দর্শনে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"অর্জ্জুন! কুকুরের এই অবস্থা কে করিল, অনুসন্ধান কর। আমি এই বাণ-কৌশল কেবলমাত্র তোমাকেই প্রদান করিয়াছি, অন্য কাহারও ইহা জানিবার উপায় নাই। তুমিই বোধহয় ইহার শব্দ বন্ধ করিয়াছ।" অর্জ্জুন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "গুরো! আমি ইহার শব্দ বন্ধ করি নাই, তবে শীঘ্রই কে ইহা করিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে যেখানে একলব্য গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। একলব্য একমনে তথায় ধনুশ্চালনা শিক্ষা করিতে ছিলেন। কিছু সময় তাঁহারা তাঁহার অদ্ভুত কৌশল-সকল অবলোকন করিয়া বিস্ময়ের সহিত একলব্যকে তাঁহার শিক্ষাদাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। একলব্য অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, কুরুকুলগুরু দ্রোণাচার্য্য হইতেই আমি এই সকল বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছি। একলব্যের কথা শুনিয়া

দ্রোণাচার্য্য বিস্ময় সহকারে বলিলেন, কৈ ? আমি ত তোমাকে এই সকল বিদ্যা প্রদান করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" তখন একলব্য উভয়কে লইয়া কুটীরাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বলিলেন। তাঁহার নিকট এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া দ্রোণাচার্য্য তাঁহার একাগ্রতা ও গুরুনিষ্ঠার প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস ! তুমিই যথার্থ গুরুভক্ত। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শীঘ্রই ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হও।"

রসিকচাঁদ ! এক্ষণে বুঝিলেত যে, বিশ্বাসের সহিত যদি গুরুর প্রতি-মূর্ত্তির সাধনা ও ধ্যানাদি করা যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ সাধকের হৃদয়ের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, বিমল জ্ঞানালোক প্রকাশ করতঃ তাহার আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন ? নিষ্ঠার সহিত গুরুর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিলে তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব থাকে না।

রসিক।—দেব ! আমি ধন্য হইলাম, আমার ভাগ্যের সীমা নাই। যেরূপ সরলভাবে আপনি আমাকে গুরুতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহাতে আমার মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হইল। প্রভো ! আপনার দর্শনে এবং আপনার শ্রীমুখের উপদেশ শ্রবণে আমার প্রাণ এত প্রফুল্ল, মন এত উল্লসিত হইয়াছে যে, আজ আমার চিরঅভ্যস্ত ইষ্টমন্ত্র জপ কিংবা অন্য উপাসনাদিতেও আর মন লাগিতেছে না। আচ্ছা প্রভু, এ অবস্থায় কি করা উচিত, আমাকে বলুন।

প্রেমা।—বৎস ! শাস্ত্র বলেন, গুরুদর্শন হইলে সে দিন আর কোন উপাসনার আবশ্যক হয় না। এমন কি, গুরুকে লঙ্ঘন করিয়া কোন উপাসনা করিতে গেলেও অপরাধ হয়। বৎস ! বোধহয় তোমাকে পূর্ব্বে

বলিয়াছি যে, ইষ্টদেবের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি-বোধেই গুরুকে বুঝিতে হইবে। সুতরাং দূরগত ভাবিয়া যাঁহাকে জপ তপ দ্বারা ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে হয়, তিনি যদি নিকটে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আর তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক কি? যদি প্রাপ্য বস্তু লাভ করিয়াও পুনরায় পাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তবে প্রাপ্য বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও নিজের মূর্খতার পরিচয় দেওয়া হয় না কি? বৎস! যাহার গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি, যাহার গুরু-দর্শনে ইষ্টদর্শনসুখ উপলব্ধি হয়, সে-ই ধন্য! এবম্বিধ শিষ্যের তখন কেবল গুরুর আদেশ পালন ও প্রাণপনে গুরুসেবা ভিন্ন আর কিছুরই আবশ্যক থাকে না! গুরুগীতায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরো কৃপা॥

অর্থাৎ ধ্যানের মূল গুরুমূর্ত্তি, মন্ত্র জপ ও উপাসনাদি সকল ক্রিয়ারই ফল গুরুর প্রসন্নতা। অতএব গুরুদর্শন হইলেই সেদিন শুভ হয়। সকল তীর্থপ্রাপ্তি একমাত্র গুরুচরণ-স্পর্শেই হইয়া থাকে। এইস্থানে তোমাকে একটি কথা বলা আবশ্যক, যদি সর্ব্বদাই গুরুর সন্নিকটে থাকা হয় তবে কিন্তু এ নিয়ম চলে না। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে বিশেষ আলোচনা করিব।

আজ বেলা অধিক হইয়াছে, আহারাদি দ্বারা যাহাতে কৃষ্ণভজনের দেহ রক্ষা হয়, তাহা কর। যে দেহকে লইয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন করিলে পাপ হয়। মনে রাখিও "নরতনু ভজনের মূল।"

রসিকচাঁদ প্রেমানন্দের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রেমানন্দও কুটীরের মধ্যে গমন করিয়া নিজ-ভজনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল।

[ ৫ ]

শুক্লা নবমী তিথি। দিবাকর সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, উত্তপ্ত জগৎবাসীকে অপেক্ষাকৃত শান্তি প্রদানের মানসে শশধরকে কার্য্যভার অর্পণ করিয়া, বিশ্রামলাভের জন্য পশ্চিম গগনে গিরিকন্দরে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিন ইতঃস্তত ভ্রমণশীল বিহঙ্গমগণ নিজ প্রভুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ স্বরে বিশ্ববাসীকে প্রভুর বিদায়বার্ত্তা জ্ঞাপন করাইয়া নিজ নিজ কুলায় ফিরিতেছে! সরোবরে কুমুদাবলী আপনাপন প্রাণপতির শুভাগমনে যেন অন্তর্নিহিত কতদিনের চাপা হাঁসিকে প্রকাশ করিতে বসিয়াছে এবং মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলে আনন্দভরে হেলিয়া দুলিয়া পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। শিবাগণ আপনাপন আহার্য্য অন্বেষণের মহাসুযোগ উপস্থিত দেখিয়া, আনন্দে জাতীয় বুলি বলিয়া, বন হইতে বহির্গত হইয়া, ইতঃস্তত গমন করিতেছে। রাখাল বালকেরা মাঠ হইতে ধেনুগণ সমভিব্যহারে নিজ নিজ দ্রব্যসম্ভার স্কন্ধে লইয়া শ্রান্তদেহে গৃহে ফিরিতেছে। সকলেই যেন আর একটী নূতন কাজে নূতন রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এমন সময় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রসিকচাঁদ অতি সুমধুর কণ্ঠে ভাববিগলিত স্বরে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছেন,—

"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন॥
আয়ুঃসূর্য্য অস্ত যায় দেখিয়ে না দেখ তায়।
ভুলে আছ মোহ-মায়ায় হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান॥
যদি নিজ হিত চাও তাঁহারি শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি পাপ-সন্তাপ-নাশন॥"

কালোচিত ভাবে গানটী যেন সুধা বর্ষণ করিতেছিল। রসিকচাঁদ ক্রমে যে স্থানে প্রেমানন্দ উপবিষ্ট ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। আজ কিন্তু রসিকচাঁদ একলা নয়, সঙ্গে আর দুইটী যুবক, দুইটী যুবকই তাহার পূর্ব্বপরিচিত। তিন জনে আসিয়া নিঃশব্দে প্রেমানন্দের নিকটে বসিল। প্রেমানন্দও তখন সমাধিমগ্ন, বাহ্যিক বিষয়ে তাঁহার কোন রূপই অনুভব নাই। মনঃপ্রাণ একেবারেই পরমারাধ্য ইষ্টপদ-ধ্যান-নিরত, কাজেই উঁহাদের আগমন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রেমানন্দের বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখেন, রসিকচাঁদ ও অন্য দুইটী যুবক নিকটেই বসিয়া আছে। তাহারাও মহাপুরুষের বাহ্য-জ্ঞান-লাভ জানিয়া প্রণাম করিল। তখন প্রেমানন্দ স্বভাবসুলভ মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ইহারা কে? আর তোমরা কতক্ষণই বা এখানে আসিয়াছ?

রসিক! প্রভো! এই দুইটী যুবকই নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু। আমার নিকট আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আপনার চরণ দর্শন মানসে এখানে আসিয়াছে। আমরা তিন জনেই প্রায় এক ঘণ্টা হয় এখানে আসিয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন; শুনিয়া আমিও কৃতার্থ হই।

রসিকচাঁদ প্রেমানন্দের কথার উত্তর দিল বটে কিন্তু তাহা তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল কিনা সন্দেহ, কারণ সেই সময় প্রেমানন্দ যে কি ভাবে ছিলেন, তাহা লিখিবার নয়, দেখিবার—প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিবার। রসিককে প্রশ্ন করিয়াই পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু নয়নযুগলের প্রেমাশ্রু যেন শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অবিরত ঝরিতেছিল। প্রাণের ভাব আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রেমকণ্ঠে গাহিলেন—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

পরমদয়াল তুমি শুনেছি হে পুরাণে,
কর কৃপা করুণানিদান এ পতিত অধমে,
তো'সম নাস্তি পতিতপাবন, মো'সম নাস্তি পতিত জন,
(এবার) জানা যাবে হে কেমন তুমি পতিতপাবন আমা হ'তে ॥
ভূমিতে স্খলিতপদ হয় যদি কোন জন,
ভূমিতেই উঠে পুনঃ ভূমি তার অবলম্বন,
যদি হই হে অপরাধী, তথাপিও তুমি গতি,
করি হে পদে প্রণতি রক্ষ কৃষ্ণ নিজ গুণেতে ॥
হে ব্রজমোহন রাসরসিকবর,
গোপীজনবল্লভ মদন-দরপহর,
ব্রজ রাখালের প্রাণ, কালীয়দমন শ্যাম
( যেমনি ) ধ'রেছিলে গোবর্দ্ধন ব্রজবাসী বাঁচাইতে।
(তেমনি) ধর "ভক্তি"-গোবর্দ্ধন কালভয় বিনাশিতে ॥

গান শেষ হইল। প্রেমানন্দ ইষ্টোদ্দেশে প্রণাম করিয়া সস্নেহে পুনরায় রসিককে যুবকদ্বয়ের আগমনের কারণ ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিকচাঁদও পূর্ব্বের মত পরিচয়াদি দিলে প্রেমানন্দ বলিলেন, আমি কি উপদেশ দিব, তোমার যদি কিছু প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা কর ; তাহার উত্তর-ছলেইউহাদের উপদেশ দেওয়া হইবে।

রসিক।—গুরুদেব ! সেদিন গুরুতত্ত্বের উপদেশ পাইয়া সেই সম্বন্ধে আমার যাহা যাহা সন্দেহ মনে জাগিয়াছে তাহারই মীমাংসা জানিতে ইচ্ছা করি, যদিও আমার প্রশ্ন অসংলগ্ন এবং অসঙ্গত হয়, তথাপি আপনি যথা-যোগ্য উপদেশ দানে আমার সন্দেহ দূর করুন।

দেখুন, গুরুদর্শনে যদি অন্য কোন ক্রিয়া করিবার প্রয়োজন না থাকে, তবে আসনে বসিয়া প্রথমে গুরুপ্রণাম ও গুরুমন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়ে গুরু-

মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে, এই যে শাস্ত্রবাক্য ও সাধুপরম্পরা উপদেশ, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? হৃদয়ে গুরুদর্শন হইলেই ত কৃতার্থ, আবার উপাসনা কেন? এ বিষয় আমাকে উপদেশ দান করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

প্রেমা।—রসিক! নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। উপাসনার অঙ্গস্বরূপ যে গুরুধ্যান ও পূজা, সেটী বাহ্যিক গুরুপূজা হইতে স্বতন্ত্র। যেমন কোনও অপরিচিত স্থানে যাইতে হইলে পথের পরিচয় জ্ঞাত আছে, এইরূপ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইতে হয়, সেইরূপ ইষ্টদর্শনে যাইতে হইলে সে ধাম কোথায়, কোন্ পথে, কেমন করিয়াই বা যাইতে হয়, বিশেষতঃ পথে অনেক দুষ্ট লোক আছে, তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, পরের উপকার করে না, বরং পথিককে কুপথ দেখাইয়া বিপদে ফেলিয়া পথিকের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়। সেই সকল পথের প্রতিবন্ধক দূর করিবার নিমিত্ত ইষ্টদেব গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া সাধককে যথাযথ পথ দেখাইয়া সাধন-পথে নির্ব্বিঘ্নে গমনের সহায়তা করিয়া থাকেন। বৎস! তাঁহার তত্ত্ব তিনি বুঝাইয়া—জানাইয়া না দিলে অন্যে বুঝিতে বা জানিতে পারে না। তাই অজ্ঞান-অন্ধকারহারী, প্রকৃত পথপ্রদর্শক এবং দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন ও রিপু-কুলকে দমন করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে সাধককে রক্ষা করিবার একমাত্র অধীশ্বর গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ সাধনপথে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে না চলিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সাধনপথে চলিতে পারিলে ক্রমে মন নির্ম্মল ও রিপুকুল দমন হইয়া আইসে, এবং তাহা হইলেই—সেই অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। তখন গুরু ও ইষ্টে এক বোধ হইবে ও তাঁহার দর্শন পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে। বুঝিলে?

রসিক।—দেব! আপনার কথায় যাহার জ্ঞান না হইবে, আপনার এই সকল সদ্যুক্তিপূর্ণ উপদেশে যাহার সন্দেহ ভঞ্জন না হইবে, নিশ্চয়

তাহার জীবন বৃথা বলিয়া আমার মনে হয়। আপনার কৃপায় এটী বেশ বুঝিলাম, এক্ষণে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। যতদিন পর্য্যন্ত দীক্ষা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি করা কর্ত্তব্য? আর দীক্ষা গ্রহণ করা কি সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য?

প্রেমা।—বৎস! দীক্ষা গ্রহণ সকলেরই একান্ত প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের জীবনেরই এক একটা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে; এক একদিন গত হইতেছে আর তাহার জীবনের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইয়া এক এক দিন কম হইতেছে। কাজে কাজেই নির্দ্দিষ্ট দিন আসিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা জীব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কিছুই সঙ্গে যায় না। শেষের সেইদিন একমাত্র আপনাপন কর্ম্মফলই সহচররূপে সঙ্গে যায়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চরতঃ"। তাই সকলেরই যাহাতে কর্ম্মফল মঙ্গলজনক হয়, তাহার জন্য যত্ন লওয়া একান্ত আবশ্যক। জীবনের হিতসাধনের জন্য ধর্ম্মই একমাত্র সঙ্গের সাথী, এই ধর্ম্মই ইহকাল পরকালের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম্মাচরণদ্বারা একাগ্রতা লাভ করিয়া যথার্থ আনন্দানুভব করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ আবশ্যক। বৎস! আমি তোমাকে কুট যুক্তিতর্কের কথা বলিতেছি না। কেবলমাত্র শাস্ত্র-সঙ্গত একান্ত কর্ত্তব্য বিষয়েরই শিক্ষা দিতেছি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, অদীক্ষিত জীব প্রেতসদৃশ। তাহারা যাহা আহার করে, তাহা অপবিত্র, যাহা বলে, তাহা শাস্ত্রের কথা বা সত্য কথা হইলেও মদ্যভাণ্ডস্থিত দুগ্ধের ন্যায় দেবতার ও সৎলোকের অগ্রাহ্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির স্পৃষ্ট জলদ্বারা যজ্ঞাদি ক্রিয়া হয় না। ইহাই শাস্ত্রের কথা।

রসিক।—দেব! তাই যদি হয়, তবে যতদিন গুরু না মিলিবে, তত দিন কি করা উচিত এবং কিরূপ গুণসম্পন্ন গুরুর নিকটই বা দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত, তাহার যথাযথ আদেশ করুন।

প্রেমা।—বৎস! যতদিন শাস্ত্রানুমোদিত গুরু না পাওয়া যায়, ততদিন বিশুদ্ধভাবে ভক্তির সহিত ভগবানের নাম করিতে থাকিবে, তারকব্রহ্ম নাম জপে দীক্ষার অপেক্ষা করিতে হয় না। তারপর গুরু-সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রমাণ তুলিয়া দিতে গেলে অতিবিস্তৃত হইয়া পড়িবে; তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। বিস্তৃত প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে দেখিবে।

সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ক্রিয়াবান্ অথচ যাঁহার উপর নিজের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে। অন্যথা এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না, একজন বদ্ধ ব্যক্তি যেমন অন্য বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না, সাগর-তরঙ্গে নিমগ্ন, নিজের উদ্ধারে অসমর্থ ব্যক্তি যেমন অপর জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে তুলিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি অভাবুক, অশাস্ত্রজ্ঞ ও কদাচারী, সে কখনও অপর ভ্রান্তমত ভাবহীন অজ্ঞ লোকের উদ্ধার সাধন করিতে পারে না; ইহা স্থির জানিও। অতএব ক্রিয়াবান্, অলোভী, কুসঙ্গ রহিত ও শিষ্যের প্রতি দয়াবান গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করাই সঙ্গত। ঐরূপ উপযুক্ত গুরুর নিকট নিঃসন্দেহে মনের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া বলিবে। প্রথমতঃ সাধন ভজন সম্বন্ধে যাহাতে নিজের সন্দেহ আছে, তাহা দূর করিবার জন্য প্রশ্ন করিবে; পরে সে সকল সন্দেহ নিরসন হইলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আপনা আপনিই আসিবে। তখন তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

রসিক।—দেব! দীক্ষা গ্রহণের কি সময় অসময় নির্দ্দিষ্ট আছে?

প্রেমা।—বৎস! সকল বিষয়েরই একটা সময় অসময় নির্দ্দিষ্ট আছে। তবে প্রাণ যখন যথার্থ দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন যদি সেইরূপ উপযুক্ত মনের মতন গুরু লাভ হয়, তবে তখনই দীক্ষা গ্রহণ করা যায়। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নানাভাবে ইহাই বলিয়াছেন যে, প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল না হওয়া পর্য্যন্তই কালাকাল বিচার। প্রাণ ব্যাকুল

হইলে এবং পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন সদ্‌গুরু লাভ হইলে দিবারাত্র, তীর্থ-অতীর্থ, ভুক্ত-অভুক্ত যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বৎস! একটি সহজ দৃষ্টান্ত শুন। ঘরে যদি আগুন লাগে, তখন কি কেহ শুভদিন, শুভতিথি দেখিয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপনের চেষ্টা করে? না যেমন আগুন লাগিয়াছে বুঝা যায়, অমনি যে কোন প্রকারেই হউক, উহা নির্ব্বাপনের উপায় অবলম্বন করে? ত্রিতাপজ্বালায় জীবের হৃদয় সর্ব্বদাই ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে; ঘোর কুহকিনী অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ানিদ্রায় অচেতন বলিয়া জীব তাহা দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। একবার যদি মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, একবার যদি বিবেক বৈরাগ্যরূপ নেত্রদ্বয় উন্মীলিত হয়, আর কি সে জ্বালা সহ্য করিতে পারে? তখন তাহার প্রাণ ছটফট করিতে থাকে, তখন সে কোথায় শান্তিবারি, তাহার সন্ধানেই পাগল হয়; নিদ্রা ভাঙ্গিলেই জ্বালা বোধ হয়, নতুবা যত দিন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তত দিন কিছুই বোধ হয় না, কিছুই মানে না বা কোন প্রকারই শান্তির উপায় করে না। বৎস, গ্রামে যখন আগুন লাগার ভয় হয়, তখন অগুন লাগার পূর্ব্বেই যাহারা জলকুম্ভ সজ্জিত করিয়া করিয়া রাখে বা সর্ব্বদা খড় ভিজাইয়া সতর্ক হইয়া থাকে, তাহাদের ঘরে আর যেমন আগুন লাগে না বা লাগিলেও সঞ্চিত জলের দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ জীবের রোগ, জরা মৃত্যু প্রভৃতি যন্ত্রণা দর্শনে যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মে ভীত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই দীক্ষাদি গ্রহণ ও সদুপদেশাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে, ত্রিতাপজ্বালায় তাহাকে আর জ্বলিয়া পুড়িয়া কষ্ট পাইতে হয় না। আর যাহারা অন্যের দুঃখাদি দর্শনেও পরিণাম চিন্তা করে না বা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমার কিছুই হইবেনা ভাবিয়া, ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তাহাদেরই শেষে "হায় হায়, কি হইল" ইত্যাদি ভাবে অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। তাই

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সর্ব্বদাই উপদেশ দিয়াছেন যে, ঘরে আগুন না লাগিতে লাগিতে অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়গণ সুস্থ ও সবল থাকিতে থাকিতেই শান্তিময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর। সময় গত হইলে, জরামৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন আর কিছু করিতে পারিবে না।

রসিক।—গুরুদেব! দীক্ষা গ্রহণের বিষয় শুনিলাম। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিলেই কি জীব কৃতার্থ হয়, না আর কিছুর প্রয়োজন আছে?

প্রেমা।—বৎস! দীক্ষা গ্রহণ হইলে জীবের চক্ষুলাভ হইল। পরে যাহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু সেই বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই অনুসন্ধানের নামই উপাসনা। এই উপাসনার প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের, সকলের এক প্রকার নয়। তবে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সকলেরই লক্ষ্য এক। যেমন কোন স্থানে যাইতে হইলে কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কীতে, কেহ চলিয়া, কেহবা মাতৃক্রোড়ে আরোহণ করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়, সেইরূপ সকলের লক্ষ্যই এক সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানকে লাভ। তবে কেহ বা যোগ তপস্যা, কেহ বা ধ্যান-ধারনা, আবার কেহ বা নামকীর্ত্তনাদি সহজ উপায় দ্বারা অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। এ সকল উপাসনাপদ্ধতি নিজ নিজ গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শাস্ত্র প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে সকলকেই কিছু কিছু কার্য্য করিতে হইবে, কেবল দীক্ষা লইয়া বসিয়া থাকিলে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে না।

রসিক।— দেব! উপাসনা না করিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না?

প্রেমা।—না বৎস! গুরুদেব তাঁহাকে ডাকিবার প্রণালী এবং ডাকিলে কি ফল হয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু শিষ্য না ডাকিলে পাইবে না। পিপাসায় কাতর হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জল পান করিবার উপদেশ প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু যদি পিপাসার শান্তি করিতে হয়,

তবে তাঁহার উপদেশ মত জল পান করিতে হইবে, নতুবা যেমন জল জল করিয়া চিৎকার করিলে পিপাসার শান্তি হয় না, ক্ষুধায় কাতর হইলে যেমন আহার না করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ গুরুদেব উপদেশ দিয়াছেন যে, এইরূপ নিয়মে সাধন-ভজন করিলে প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি হইবে, তাপিত প্রাণে শান্তি পাইবে, কিন্তু শিষ্য উপদেশ-মত কার্য্য না করিলে চলিবে কেন? উপদেশানুসারে কার্য্য না করিলে গুরুদেব কি করিবেন? উপদেশানুসারে যেমন পিপাসিত ব্যক্তিকেই জল পান করিতে হইবে, গুরুদেবের উপদেশানুসারে সেইরূপ শিষ্যকেই সাধন করিতে হইবে। তবে গুরু, মধ্যে মধ্যে শিষ্যের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবেন এবং তদনুসারে উপদেশ প্রদান করিবেন ও আশীর্ব্বাদরূপ শক্তিসঞ্চার করিবেন।

রসিক।—দেব! এক একজনকে যে বলিতে শুনা যায়, "সাধন-ভজনের ভার গুরুকে দিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছি; তোমার আর ভাবনা নাই।" ইহার তাৎপর্য্য কি?

প্রেমা।—বাবা! এ বিষয়টী বড়ই হাস্যকর বিষয়। উহার তাৎপর্য্য সাধারণতঃ গুরুদেবের বার্ষিকটা কিছু বৃদ্ধি করা। অতিশয় অলস ও অল্প-বুদ্ধি বিশিষ্ট শিষ্য মনে করে, গুরুদেব বাড়ীতে আসিবেন আর বার্ষিক লইয়া যাইবেন, আমিই কেবল সাধন-ভজন করিব, তাহা হইবে না; গুরুদেবকে খাটাইয়া তবে টাকা দিব। এ দিকে এক শ্রেণীর গুরুও মনে করেন, আমি শিষ্যের জন্য প্রতিদিন পরিশ্রম করি, ইহা না বলিলে শিষ্যই বা আমাকে টাকা দিবে কেন? এইরূপ স্থলেই ঐরূপ নির্ভরতার ভাণ দেখা যায়। কিন্তু বৎস! ঠিক জানিও যে, একজনে আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, একজনের নিদ্রায় যেমন অন্যের নিদ্রাজনিত সুখ হয় না, সেইরূপ একের উপাসনায় অন্যের পাপক্ষয় হয় না, অন্যের আত্মার উন্নতি

হয় না। তবে একজন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে আসিলে অপর কেহ যদি তাহার সাহায্য করে, তবে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের কিছু ফলভাগী হয় মাত্র, পরন্তু নিজের পাপ, নিজের দুরদৃষ্ট দূর করিতে হইলে নিজের উপাসনা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। যাহারা মূর্খ, অলস-প্রকৃতি, তাহাদের গুরুভক্তি কেবল পরিশ্রম লাঘবের জন্য; যেমন কোন দিন প্রসাদে নিষ্ঠা নাই, কেবল উপবাসের দিন প্রসাদে নিষ্ঠা; তাহার কারণ, প্রসাদ পাইলে আর উপবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না।

রসিক।—গুরুদেব! একজনের দুঃখ যদি আর একজনের ক্রিয়া দ্বারা দূর না হয়, তবে রোগাদিনাশের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাহয় কেন? কোন কোন স্থলে ত উহাতে উপকারও হইতে দেখা যায়।

প্রেমা।—রসিকচাঁদ! দুঃখ অনেক প্রকারের আছে,—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। মনকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ, তাহার নাম আধ্যাত্মিক। আর অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ, তাহা আধি-দৈবিক এবং দেহাদিকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ, তাহা আধিভৌতিক। ঐ আধিদৈবিক ক্লেশ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহা অতি সাবধানে সুন্দররূপে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মানুসারে করা চাই এবং তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকা চাই। বৎস! ঐ যে বিশ্বাস ও নির্ভরতা, উহাই যে প্রধান উপাসনা! একের বিশ্বাসে অন্যের ফল হয় কি? কাজে কাজেই ঐ বিশ্বাস করাই নিজের উপাসনা করা হইল।

রসিক।—গুরুদেব! ধন্য হইলাম! এক্ষণে জপের নিয়ম কি, কি প্রকারে জপ করিতে হয়, তাহা বলুন। জপ করিতে হইলে কি মালার প্রয়োজন, না করেতে জপ করিলেই চলে?

প্রেমা।—বৎস! জপের প্রধান প্রধান কতকগুলি নিয়ক বলিতেছি; আনুষঙ্গিক আরও অনেক আছে, ক্রমে বলিব। শুদ্ধচিত্তে, স্থির আসনে

বসিয়া, অন্যচিন্তা-রহিত হইয়া, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে জপ করিতে হয়। মন্ত্র অতিদ্রুত বা অতি ধীরে উচ্চারণ করিতে নাই। অন্য ক্রিয়া হইতে জপই প্রধান বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। কারণ, জপ করিতে করিতে সর্ব্বদাই ইষ্টদর্শন পাওয়া যায়। যতদিন ইষ্টদর্শন না হয়, তত দিন বেশী বেশী জপ করিতে হয়। এই জপের সুবিধার জন্য এবং সংখ্যা রাখিবার জন্যই মালার প্রয়োজন। সংখ্যা করিয়া জপ করিতে হয়, অনির্দ্দিষ্টভাবে জপে ফলোদয় নাই বলিয়াই শাস্ত্র, মালা গ্রহণের বিধি দিয়াছেন। আবার মন একেবারে তদ্গত না হইলেও ফল হয় না; তজ্জন্য মনে মনে ইষ্টধ্যানও করিতে বলিয়াছেন। তবে মালা না হইলেই যে জপ হইতে পারে না, তাহা মনে করিও না। ক্রমে এমন অবস্থা আসে,যখন মালা বা কর-জপেরও সুযোগ থাকে না; তখন কেবল তদ্গত ভাবে মনে মনেই স্মরণ হইতে থাকে। তুলসীদাস এক স্থানে বলিয়াছেন,—

মালা জপে শলা * কর জপে ভাই
যো মন্ মন্‌মে জপে উন্‌কে বলিহারি যাই ॥

অর্থাৎ যাহারা প্রথমাধিকারী তাহারাই মালা জপে, আবার যাহারা করে জপ করে, তাহারাও মন্দ নহে, কিন্তু শেষ যাঁহারা মনে মনে তাঁহার রূপগুণ চিন্তা ও মন্ত্র স্মরণ করিতে থাকেন, তাঁহারাই ধন্য তাঁহারাই বলিহারি। জপের সাধারণ নিয়ম এই পর্য্যন্তই রহিল। প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজন হইলে মন্ত্রাদির আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে; বিশ্রাম করিতে যাও। বিশ্রামান্তে পুনর্ব্বার আলোচনা হইবে।

রসিকচাঁদ এবং অন্য দুইটী যুবক প্রেমানন্দকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া

* শলা অর্থাৎ গৃহী অর্থাৎ যাহারা প্রথম অধিকারী।

বিশ্রাম লাভের জন্য চলিয়া গেলেন। এ দিকে প্রেমানন্দও নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে শুনা গেল প্রেমানন্দ সুর করিয়া বলিতেছেন—

বন্দে শ্রীগুরু দেব কি চরণম্।
জ্ঞানাঞ্জন দেই অন্ধকি নয়ননম্॥
অন্ধ পট খোলে ধন্দ সব হরণম্।
মহিমা অপার না যাওত বর্ণনম্॥
গুরুসে পরমবন্ধু ভবসিন্ধু তারণম্।
দুর্ল্লভ নাম শুনাওত শ্রবণম্॥
অজ্ঞান তিমিরনাশি হৃদি প্রেম করণম্।
কহত "নয়নানন্দ" প্রেমানন্দে মগনম্॥

[ ৬ ]

আজ শুক্লা দ্বাদশী তিথি। যখন নিদ্রিত জগতের নৈশ-নিস্তব্ধতা এই বিপুল বিশ্বকে অধিকার করিয়া কেবলমাত্র দুই একটী জাগ্রত প্রাণে বিস্ময়-বিমিশ্র বিরাগময় চিন্তা-তরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছিল, যখন অসার সংসারের পরিণাম-চিত্র আঁকিয়া দিবার জন্য প্রাণের পরতে পরতে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বৈরাগ্যকে টানিয়া জাগাইতেছিল, তখন আমাদের রসিকচাঁদও জাগিয়াছেন। জাগিয়া দেখেন, সারাটা সংসার নীরব নিস্পন্দ, জীবজগৎ সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রাদেবীর শান্তিমাখা কোলে শায়িত। অবিশ্রান্ত গতিবিশিষ্ট কালস্রোত নীরবে এই নিখিল বিশ্বকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরপরিশ্রমে পরিশ্রান্ত নরনারী শান্তির শীতল ছায়ায় গা ঢালিয়া দিয়াছে, যেন এক উদ্বেগশূন্য সুখময় রাজ্যের বাতাস লাগিয়া জীবগণ মায়িক জগতের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। জাগ্রত জগতের

কল-কোলাহল আর কিছুই নাই, কেবলমাত্র ঝিঁ-ঝিঁ পোকাগুলি সমস্বরে যেন বিশ্বপতি ভগবানের সুমধুর করুণা-সঙ্গীতের একটানা তান তুলিয়া নিশীথিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে, নিশাপতি আপন রজত-ধবল সুস্নিগ্ধ কিরণজাল সম্বরণপূর্ব্বক এই নিস্তব্ধ—নিস্পন্দ—ঘুমন্ত সংসারটাকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের মুখে তুলিয়া দিয়া, ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। রসিকচাঁদও ধীরে ধীরে ইষ্টদেবের স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুমধুর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন,—

ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন অভয়-পদারবিন্দ রে।
দুলহ মানব-জনম সৎসঙ্গে তরহ এ ভব-সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখনে দিনযামিনী জাগি রে॥
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপলসুখ লব লাগি রে॥
এ রূপ যৌবন ভবন ধনজন ইথে কি আছে পরতীত রে।
(এ যে) কমলদলজল জীবন টলমল সেবহু হরিপদ নিতি রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন দাস্য রে।
পূজন সখিজন আত্মনিবেদন 'গোবিন্দদাস' অভিলাষী রে॥

ক্রমে প্রভাত হইল। রসিকচাঁদও আপন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক ভগবন্নাম করিতে করিতে প্রেমানন্দের আশ্রমে যাইবার জন্য বহির্গত হইলেন।

এ দিকে প্রেমানন্দ আপন প্রাতঃক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন, এমন সময় রসিকচাঁদ তথায় উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে গীতাপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রেমানন্দ স্বভাবসুলভ স্নেহ-

স্বরে রসিকচাঁদের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে, রসিকচাঁদ করযোড়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রসিক।—গুরুদেব! আজকাল অনেকেই সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে; সুতরাং জপ বা রীতিমত অর্চ্চনা করে না এবং যাহারা অর্চ্চনাদি করে, তাহাদিগকে নিন্দা করে এবং নিম্নাধিকারী বলিয়া অনেক সময় ঘৃণা করে। গুরুদেব! সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে কি কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা মানিতে হয় না?

প্রেমা।—বৎস রসিক! আজকালকার লোকের একেই ত ধর্ম্মজ্ঞান বা উপাসনার প্রবৃত্তি কম, তাহাতে আবার এই সন্ন্যাসী গুরু করা এক উপসর্গ হইয়াছে। প্রথমতঃ গৃহস্থের সন্ন্যাসী গুরু করা শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। তাহাতে আবার বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করা যে কত দূর অপরাধের কার্য্য, তাহা আর কি বলিব। আমি এ বিষয়ের তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে পারি না। হয় ত যিনি গুরু, তিনি উন্নত অবস্থায় পঁহুছিয়াছেন, তিনি বিধির অতীত হইতে পারেন, তাহা বলিয়া কি প্রথম প্রবর্ত্তক সাধককেও তাঁহারই চালে চলিতে হইবে? প্রথম অধিকারী নিয়মানুসারে কার্য না করিয়া কেবল সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াই যে বেদ-বিধির অতীত হয়া যাইবেন, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। আচ্ছা বৎস! ঐ সকল শিষ্যদের সম্বন্ধে আমি কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। বল দেখি, ঐ সকল শিষ্যদিগের মধ্যে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণের পরও স্ত্রীব্যবহার, পুত্র-মুখচুম্বন, চাকুরী, জাল জুয়াচুরী প্রভৃতি থাকে কি না?

রসিক।—গুরুদেব! আপনাকে আর কি বলিব। চাকুরী ও স্ত্রী-ব্যবহারাদি ছাড়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে দেখা যায়। আর সমাজের বা পুরুষানুক্রমে আচরিত ধর্ম্মের ভয় ত থাকেই না, কাজেই যথেচ্ছাচারিতায় প্রবৃত্ত হইয়া অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম সকল করিতে থাকে।

প্রেমা।—হরিবোল, হরিবোল। রসিকচাঁদ! বিধিটি লঙ্ঘন করা যেমন সহজ, আবিধি পরিত্যাগ করা তত সহজ নয়। ইহাতে ইন্দ্রিয়-সংযম চাই, মনের বল চাই, প্রাণের একাগ্রতা চাই। হায় হায়! কতকগুলি অনধিকারীর হাতে পড়িয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইতে বসিল। কবে যে সমাজের সহিত ধর্ম্মের মিলন হইবে, কবে যে অধার্ম্মিক অত্যাচারীর প্রত্যক্ষ ক্ষতি ও দুর্ভোগ দর্শনে সকলেই আপন আপন কুকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যগ্র হইবে, কবে যে অবৈধাচারীর মৌখিক বাক্যে বা অর্থ-বলকে অবলম্বন করিয়া সাধারণ সমাজ তাহার সহিত যোগ না দিয়া তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিতে দেখিব জানি না। এ দুর্যোগের দিনে আবার তুমি আমার নিকট নিয়মাবলী শুনিতে চাও! এ দুর্য্যোগের সময় নিয়ম-বাক্য,বিধি-ব্যবস্থা কেহই শুনিবে না,সকলেই তাহাতে অশ্রদ্ধা করিবে। তুমি কাহাকেও কোন বিধি ব্যবস্থায় কথা বলিয়া দুঃখ পাইবে মাত্র।

রসিক।—গুরুদেব! বলেন কি? আপনার ন্যায় নির্ব্বিকার, নিঃস্বার্থ-পর, জগৎহিতৈষী মহাত্মা যদি নিয়মাদি প্রচার না করিয়া নিজ সাধন-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন, তবে আর জগতের উপকার হইবে কি প্রকারে? দেব! আপনার চরণে আমি চিরবিক্রীত হইয়াছি। আমার আশা পূর্ণ করুন প্রথম হইতে প্রতি দিনের একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি ব্যক্ত করুন; সকলের না হউক অবশ্য একজন না একজনের প্রাণে লাগিবেই।

প্রেমা।—বৎস! জীবের দুরবস্থা দেখিয়া তোমার প্রাণ যখন এত ব্যাকুল হইয়াছে, তখন বেশ বুঝিতেছি যে, তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবজগতের অনেক কার্য্য সাধিত হইবে। তুমি স্থির হও; ক্রমে ক্রমে তোমাকে সকল কথাই বলিব।

রসিক।—দেব! আমি একদিন নদী পার হইবার সময় যে শিক্ষা পাইয়াছি, তদ্দ্বারা আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, মানুষ পাপপথে নামিবার

সময় যতশীঘ্র নামে, উঠিতে তত শীঘ্র পারে না—একটু একটু করিয়া উঠিতে হয়। দেখুন, পার হইবার সময় দাড়ী-মাঝিরা তামাক খাইবার উপলক্ষ্যে দাড় টানা যেমন বন্ধ করিল, অমনি স্রোতের টানে পড়িয়া নৌকাখানি গন্তব্য স্থান হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল ; পরে অতিকষ্টে উজান বাহিয়া, দাড় টানিতে টানিতে তবে ঘাটে আসিল। আমার মনে হয় যে, সাধন-পথের আধুনিক অবস্থাও ঠিক এইরূপ। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপালন জনিত অপরাধে মানুষ অনেক দূর নামিয়াছে। এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা না করিলে উঠিবে কি করিয়া ? তাই আপনার নিকট কাতর প্রার্থনা যে, যাহাতে এই কলুষিত ও মলিন- চিত্ত মানবের উদ্ধারের উপায় হয়, তাহা করুন।

প্রেমা।—বৎস ! তুমি যাহা বলিলে, অবস্থা ঠিক এইরূপই বটে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করিয়া, পাপকর্ম্মের স্রোতের টানে জীব এতদূর চলিয়া গিয়াছে যে, এক্ষণে প্রাণপণে অবিশ্রান্ত চেষ্টা না করিলে গন্তব্য স্থানে পৌছাইতে পারিবে না। যাহা হউক, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন প্রথম হইতেই বলিতেছি, শ্রবণ কর।

রসিক।—গুরুদেব ! একেবারে প্রথম হইতেই বলিবেন, আপনার বা আমার ভাবের উপর নির্ভর করিয়া বলিবেন না।

প্রেমা।— রসিক চাঁদ ! তোমার যত্নে ও প্রভুর ইচ্ছায় অনেক জীবেরই উপকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষতঃ সাধকের মন যখন জীবের জন্য ব্যাকুল হয়, শ্রীভগবান তখন নিশ্চয়ই জীবের প্রতি প্রসন্ন হন, সন্দেহ নাই। বৎস ! যাহারা সংসারী, সংসারের কাজ কর্ম্ম সম্পাদনের সঙ্গে-সঙ্গে যাহাদের ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাদের জন্য আমি শাস্ত্র হইতে কতিপয় নিয়ম তোমার নিকট বলিতেছি। যাহারা সংসার-ত্যাগী, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা আপনাপন উপদেষ্টা গুরুর নিকট হইতে নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। যাহারা সংসারী, তাহাদের জন্যই এক্ষণে

কিছু বলিবার প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গের পরেই ভক্তিভরে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিবে। তৎপরে আপন গুরুমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিবে। যথা,—

নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেব স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥
ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার-বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টং চ ত্বামহং শরণং গতঃ॥

রসিক।—প্রভো! দয়া করিয়া শ্লোকগুলির অর্থও বলিবেন।

প্রেমা।—বৎস! এ সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে করিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তবে তোমার ইচ্ছামত সংক্ষেপে বলিতেছি। গুরুদেবের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা-শ্লোকের অর্থ এই,—"আমার আরাধ্য দেবের স্বরূপভূত আমার শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করি, যাঁহার বাক্যরূপ অমৃতধারা আমার সংসাররূপ বিষ বিনাশ করিতেছে—অর্থাৎ আমি যাঁহার উপদেশে পরমানন্দ লাভের যোগ্য হইতেছি। হে গুরো জগন্নাথ! আমায় ত্রাণ কর, আমি আপন কর্ম্মানুসারে সংসারতাপে তাপিত হইয়া তোমার অভয়-পদে শরণ লইলাম।" এই ভাবে প্রার্থনার পর আত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করিতে হইবে। যথা,—

অহং কৃষ্ণো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥
ত্বমেবাহমহং ত্বঞ্চ সচ্চিন্মাত্র বপুর্ভবান্।
আবয়োরন্তরা কৃষ্ণ নশ্যত্বাজ্ঞাবলাৎ তব॥
অহং তীর্ণো ভবং ঘোরং কৃতাং কিঞ্চিন্নমেঽস্তি হি।
তথাপি দেহি মে নাথ হ্যাজ্ঞাং তব নিষেবনে॥

অর্থাৎ যদিও আমি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ জীব, আমার কোন-রূপ শোকাদি আসিতে পারে না, আমি সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ, নিত্য, মুক্তস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ বন্ধনাদি দুঃখরহিত, হে কৃষ্ণ! যদিও আমাতে তুমি, তোমাতে আমি, পরমার্থতঃ তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাই, তথাপি আমার সেরূপ দিব্যজ্ঞানলাভ না হওয়ায় নানাপ্রকার শোক, দুঃখ ও বন্ধনকারিণী যে অবিদ্যা, তাহাতে আমি অভিভূত রহিয়াছি অতএব আমায় আজ্ঞা দাও, শক্তি দাও এবং আমি তোমার দাসস্বরূপ, এই ভাব দাও। যেন তোমার সেবা করিয়া, তোমার স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ করিয়া সদানন্দ উপভোগ করিতে পারি।

রসিক।—প্রভো! বড়ই মধুর লাগিতেছে? আমাদের নিজের কাছে এমন অমূল্য জিনিষ থাকিতে আমরা পরের দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াই? হায়! হায়! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বলুন প্রভো! ইহার পর কি করিতে হইবে?

প্রেমা।—বৎস! আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আর্য্য ঋষিগণ যেসকল নিয়ম-পদ্ধতি করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা আচরণ করি না বলিয়াই এত দুঃখ পাই। যদি যথার্থ তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা যায়, তবে মানুষ যে এই জন্মেই দেবত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৎস! আত্ম-তত্ত্ব চিন্তনের পর কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা-শ্লোক আছে, সেইগুলি পাঠ করিবে। আমি এক একটী শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা বলিয়া যাইতেছি, নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। যথা,—

স্মৃতে সকল-কল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

অর্থাৎ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সকল রকম কল্যাণ লাভ হয়, আমি সেই মঙ্গলময়, সর্ব্বান্তর্য্যামী, নিত্যনিরঞ্জন শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমজ্জনাভং।
গ্রাহাভিভূত-বরবারণমুক্তিহেতুং
চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রম্‌॥

অর্থাৎ ভগবন্‌! আমি ঘোর সংসারসাগরে নিমগ্ন, তাহাতে আবার রিপুগণ আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিতেছে —তুমি পদ্মপলাশ-লোচন, তুমি ভবভয়হারী, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্রকে যেমন কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে, আমাকেও সেই ভাবে রক্ষা কর।

প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
নারায়ণপ্রবণবিপ্রপরায়ণস্য॥

অর্থাৎ হে দয়াময়! তুমি পরমপুরুষ, সর্ব্বজীবের জীবন ও জীবের একমাত্র গতি। ঘোর নরক হইতে জীবকে উদ্ধার করিতে তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। আমি অদ্য প্রাতে তোমায় কায়মনোবাক্যে আশ্রয় পূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং
প্রাক্‌সর্ব্বজন্মকৃতপাপভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশমকরোদ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

অর্থাৎ হে পতিতপাবন! তোমায় ডাকিলে আর জীবের ভয় থাকে না। তোমার কৃপায় জীবের পূর্ব্বসঞ্চিত অশেষ পাপ দূর হয়। তুমি গ্রাহের

(কুম্ভীরের) মুখ হইতে গজেন্দ্রকে যেমন রক্ষা করিয়াছিলে, পাপতাপ হইতে আমাকেও সেইরূপ রক্ষা কর।

ষড়ুৎসবাদিকং কর্ম্ম যৎত্বয়া প্রেরিতো হরে।
করিষ্যামি ত্বয়াজ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম॥

অর্থাৎ হে পাপহারিন্ হরে! আমি উৎসবাদি যাহা কিছু করিব, তাহার তুমিই একমাত্র চালক, তোমাকেই সে সকল অর্পণ করিলাম। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও, ইহাই আমার নিবেদন।

প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যৎ যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া॥

অর্থাৎ হে হৃষীকেশ! তুমিই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তুমিই আমাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছ। হে সর্ব্বেশ্বর! যেখানে যখন যে-কোন কার্য্য করিব, তুমিই তাহা করাইতেছ, সকলের মূলেই তুমি বর্ত্তমান, এই ধারণা যেন করিতে পারি। আমায় কৃপা কর।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

অর্থাৎ হে ত্রিলোকেশ্বর! হে জ্ঞানময়! হে চৈতন্যদাতা! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! তুমিই সকল কার্য্যের অধীশ্বর। তুমিই সুখ-সম্পদের প্রভু। আমার এই সংসারও তোমারই। আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া, তোমার আজ্ঞায় তোমার প্রীতির নিমিত্ত সংসার করিতে চলিলাম, দেখ' নাথ! যেন প্রতি কার্য্যে তোমার মঙ্গলময় আদেশ অনুভব করিতে পারি যেন অভিমানে মত্ত হইয়া সংসার করিতে যাইয়া তোমাকে ভুলিয়া না যাই। আমাকে ভাব দাও, শক্তি দাও।

সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেঽন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধাতিরস্কারকলিপ্রমাদপাপানি মা মাভিভবন্তু ভূমন্॥

অর্থাৎ হে অন্তর্য্যামিন্! হে নরনারায়ণ! তোমার আজ্ঞায় আমি সংসার করিতে চলিলাম। দেখ' নাথ! যেন স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও কলিগত পাপসমূহ আমাকে অভিভূত না করে। আমি নিজ শক্তিতে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিব না, তুমিই পাপ ও প্রলোভন হইতে আমাকে রক্ষা কর।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ শময় বিষয়রসতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয়, সংসারসাগরতঃ॥

অর্থাৎ হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার অহঙ্কার-ভাব দূর করিয়া দাও, মনের চাঞ্চল্য-ভাব নাশ কর। হৃদয়ের বিষয়-বাসনা প্রশমিত করিয়া দাও এবং সকল প্রাণীতে তোমার সত্ত্বা বর্ত্তমান জানিয়া দয়া করিবার শক্তি দাও। প্রভো! আমি আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না। আমাকে সংসার-সাগর হইতে ত্রাণ কর।

স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতম্॥

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! আমার স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মরণ, চিন্তন, স্তুতি, বাক্য ও আচরণ যাহা কিছু, সকলই যেন তোমার ভাবে হয়, এই আশীর্ব্বাদ কর।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

অর্থাৎ হে হৃষীকেশ! ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা জানি; কিন্তু করিতে পারি না। আর অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানি; কিন্তু মোহবশতঃ ছাড়িতে পারি না। দয়াময়! আমার কোন বিষয়েই কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ | ভক্তি | পৌষ
৫ম সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

# প্রাণের কথা

( ৪ )

বড়ই দুর্ব্বহ মোর জীবনের ভার,
চলে'ছি বহিয়া ল'য়ে তাই এ সংসারে ;
ব্যর্থ এই জীবনের কাহিনী আমার,
কে শুনিবে ? মনোব্যথা জানাইব কা'রে ?
ব্যথাহত ক্ষুব্ধ এই পরাণের মাঝে,
কেন এত ভাবরাশি এসে জড় হয় ?
মনের গোপন-কুঞ্জে কেন বাঁশী বাজে,
কে এসে মনের মাঝে এত কথা কয় !
আমার যে সাধ হয় সেই কথাগুলি,
প্রাণখুলে সর্ব্বজনে আনন্দে শুনাই ;
ভাবিতেও সে কথা যে হই কুতূহলী,
যাতনা-বেদনা বন্ধ সব ভুলে যাই।
কিন্তু হায় কে শুনিবে ? শুনাইব কা'রে ?
ভগ্ন প্রাণে প'ড়ে হায় আছি এক ধারে !

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# আনুগত্য

অনেক সময় কিছু লিখিব মনে করি, ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়ও দু'একবার অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু কি যে লিখিব তাহাই স্থির হ'য়ে ওঠে না; তা'ছাড়া লিখিলে কাহারও কিছু উপকার হইবে এরূপ ভরসাও হয় না। কারণ জীবনে কখনও এরূপ চেষ্টা করি নাই—তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে করযোড়ে নিবেদন, যেন নিজগুণে আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করেন।

বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আনুগত্য। এ বিষয়ে যত তলিয়ে দেখা যায়, মনে হয় এই বিরাট সনাতন ধর্ম্ম জিনিষটি অধিকাংশই আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীভক্তিদেবীই ধর্ম্মরূপ বৃক্ষরাজের নানা শাখাপ্রশাখার মূল জীবনী শক্তি; অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি যে রাস্তা দিয়েই যাওয়া যাক্ না কেন, ভক্তি সকলেরই আধার ও প্রাণ। 'ভক্তির্ভগবতঃ সেবা'—ভজ ধাতু সেবায়াং ক্তি = ভক্তি; যে প্রকারে শ্রীভগবানের সুখ হয় তাই করার নামই ভক্তি, অবশ্য কি উপায়ে সেই সুখ দেওয়া যায় তার তারতম্য বা উপায়-অনেকগুলি আছে তাই সাধনজ্ঞান পথের নামও বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিই সকল সাধন-প্রণালীর প্রয়োজন, তাহা মহর্ষিকল্প গোস্বামীপাদগণ নানাস্থানে নানাপ্রকারে বলিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ-সম্রাট শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ২২শ পরিচ্ছেদে পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ্য নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা তারা দিতে নাহি বল॥"

এই সুদুর্ল্লভ ভক্তির মূলভিত্তিই আনুগত্য। যতদিন প্রাণে বিশুদ্ধ আনুগত্যের বিমল-ধারা প্রবাহিত না হয়, ততদিন ভক্তির প্রেম মন্দাকিনী সেই মরু-হৃদয়ে দেখা যায় না।

সর্ব্ববিধ অবস্থায় আনুগত্য চাই। কি সাধক, কি প্রবর্ত্তক, কি সিদ্ধ। এই আনুগত্যই শ্রীভক্তিদেবীর মহোজ্জ্বল শিরোরত্ন। ইহাতে অধিকারী ভেদ বিচার নাই। যিনি যত ভক্ত, তিনি তত বেশি অনুগত। এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। এই জীবন-ক্ষেত্রের প্রত্যেক স্তরে কোন কিছু শিখিতে হইলেই আনুগত্য চাই, পরমার্থরাজ্যে ভক্ত-জীবন গড়িতে হইলে ত কথাই নাই।

এখন এই আনুগত্য কি ক'রে লাভ করা যায়। সাধন-ভক্তির বিবিধাঙ্গ, তার মধ্যে শ্রীগুরুপদাশ্রয় প্রথম ও সর্ব্ববাদীসম্মত। এই গুরুতত্ত্ব বড় জটিল, দুরূহ এবং বহু উপাসনা বিভ্রাট এই গুরুতত্ত্ব লইয়া হইয়া থাকে, সে সকল এই উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। গুরুতত্ত্ব বিচারের বস্তু নয়; গুরুতত্ত্ব নিজ নিজ ভাবানুসারে অস্বাদ্য। আমার বলিবার অভিপ্রায় শ্রীগুরুপদে আশ্রয় ভিন্ন আনুগত্যলাভের কোন বিশিষ্ট উপায় নাই।

অনেকেই ব'লে থাকেন এই কলিকালে সৎগুরুর অভাব, কাকেই বা গুরু করি এবং শাস্ত্রে যে সব লক্ষণযুক্ত হইলে গুরুপদবাচ্য হন বলিয়াছেন, সেইরূপ গুরু এই সময় অতি বিরল; মন ত মানে না, কি ক'রে শরণাগত হই। বিশেষ বিচার ছেড়ে দিলেও স্থূল-বিচারে দেখা যাক্। অনেক পথ আছে বলিয়াছি, তাহাতে আবার নানা মতভেদ এবং নূতন নূতন মত ও উপমতের প্রচারও দেখিতে পাই। এখন প্রাণে প্রাণে যে কোন একটি মহাজনানুমোদিত মত ভাল লাগে—তার যুক্তি জানা থাক্ আর নাই থাক্—সেই মতের যে কয়টি মহানুভব মহাত্মা এখন জীবিত বা প্রকট আছেন তাঁদের মধ্যে যে কোন একজনের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ করা চাই। মোট

কথা এমন একজনকে গুরুপদে বরণ করা চাই, যিনি সাধারণ জীবের তুলনায় অনেক উচ্চস্তরে এবং যাহার কার্য্য-কলাপে অসাধারণ উদারতা দেখিতে পাওয়া যায় ও সর্ব্ববিষয়ে যিনি মহৎ ও অগ্রসর তাঁহাকেই মন-প্রাণ সমর্পণ করা চাই। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করা চাই। এক কথায় যাঁকে একবার দেখিলে আত্মহারা হওয়া যায় ও যাঁর প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ মধুময় দেখায় ও যিনি মনপ্রাণ আকর্ষণ করেন, তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করা চাই। তারপর শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন অন্ধভাবে, বিনা বিচারে, অক্ষরে অক্ষরে করা চাই—ক্রমেই সব জিজ্ঞাসার তৃপ্তি হইবে, সব সংশয় অপনোদন হইবে এবং হৃদয়ে জীবের প্রকৃত স্বরূপ 'জীব হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'—উদ্ভাসিত হইবে এবং তুমি সেই নব-কিশোর নব-নটবর ভুবনসুন্দর মদনমোহন শ্যামসুন্দরের নাম, রূপ, লীলা ও ধাম-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পাইবে। শ্রীগুরু-পদাশ্রয় ভিন্ন পরমার্থ রাজ্যে একতিলও অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই একথা ধ্রুব সত্য।

জীবনের প্রত্যেক দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপে একনিষ্ঠ আনুগত্য চাই—এইরূপ ভাবনা চাই যে, তাঁর কায তিনি কি কৌশলে তোমার দ্বারা সম্পন্ন করাইবেন তিনি জানেন, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। তিনি যন্ত্রী, তুমি যন্ত্র, যখন যে রাগিনী বাজাইবেন, তখন তাই বাজিবে এবং যন্ত্রের সৌভাগ্য বলা যাইবে। কোন কার্য্যে স্বতন্ত্রতা বুদ্ধি যেন না আসে। তুমি জীবনকে এইরূপে তাঁর কৃপায় গড়িতে পারিলে সাংসারিক কোন ভয়ে বা বিপদে কখন ভীত বা কাতর হইবে না, এক কথায় সাংসারিক গরম হাওয়া তোমার লাগিবে না। তুমি অনুগত, সমর্পিত প্রাণ ; তুমি প্রপন্ন, তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় কিছু লাগিবে না ; তুমি সর্ব্বদা সেই কৃপাময়ের অনুভব পাইবে এবং তিনি সর্ব্বদা তোমার রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিবেন। আর সেই আনুগত্য ভাব না থাকিলে তুমি আশ্রয়হীন হইয়া নিজ বুদ্ধিদোষে

স্বতন্ত্র ও মনমুখী হইয়া পদে পদে সাংসারিক তাপ পাইবে ও কাতর হইয়া পড়িবে এবং 'কুটিল কুপথ ধরিয়া, দূরে সরিয়া 'পড়িবে। সর্ব্বপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবে পাওয়া যায়—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।

অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার দয়া কবে হইবে এই প্রতীক্ষা করিয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করতঃ মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা তোমাকে প্রণাম করিয়া যে জন জীবিত থাকে সেই জন তোমাকে লাভ করিতে পারে।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাই ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।"

অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর মুখে শোনা যায়, আমি বিদ্বান্, স্বাধীন চিন্তাশীল জীব, কি করিয়া অন্ধভাবে ভালমন্দ বিচার না করিয়া অপরের কথামত কোন কায করি। এই ভাব বা যুক্তির মূলে অভিমান পরিস্ফুটরূপেই বর্ত্তমান এবং এই অভিমানই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকা অধঃ-পতনের কারণ। এই অভিমান সর্ব্ব অনিষ্টের মূল এবং বিশেষতঃ ভক্তি পথের কণ্টক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অভিমান সুরাপান সম ত্যজ্য এও শাস্ত্রের অনুশাসন। ব্রহ্মারুদ্রাদি যে অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ছার জীব কি বুঝিবে? আর গুরুতত্ত্ব আরও জটিল নিগূঢ় ও রহস্যময়। এই রহস্য উদ্ঘাটন বহু কৃপাসাপেক্ষ। যাকে কৃপা ক'রে জানান, সেই জানে। তুমি যে সব জান বা বোঝ এই ভাবের মূলে অভিমান। যাহা বুদ্ধি তর্কের গণ্ডীর ভিতর নয় বা অগোচর ও যাহা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার, তাহা তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির বা যুক্তির ভিতর আসিবে

কি প্রকারে। তোমার বুদ্ধি স্বতন্ত্রতা দোষে দুষ্ট, তুমি আশ্রয়তত্ত্বের কিছু ধার ধার না, তোমার জীবন ঝঞ্ঝাবাতবিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্রে কর্ণধারহীন জীর্ণ তরীবৎ। তুমি অবিবাহিত, ধর্ম্মপরিণীত দম্পতীর বিশুদ্ধ পতিপত্নী প্রেম তুমি কি বুঝিবে? তোমার হৃদয় অভিমান-মদিরায় উন্মত্ত, তোমায় আনুগত্য ধর্ম্ম কি বলিব। মোট কথা যে পর্য্যন্ত তুমি অভিমান-মঞ্চ হইতে অবতরণ না করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার হৃদয়ে এই আশ্রয় আশ্রিত তত্ত্বের উদ্বোধন বা জাগরণ অসম্ভব। তাই ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর গাহিয়াছেন—

অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান ॥
আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস' ॥

( চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭ অধ্যায় )

কোন কার্য্য করার সময় সর্ব্বাগ্রে বিচার করা চাই ইহা শ্রীগুরুদেবের মতানুকুল ও আদেশানুযায়ী কি না—যদি প্রতিকুল হ'য়ে থাকে যতই আপাতমনোরম হউক না কেন, কখনই—কোন অবস্থায় তাহা করা কর্ত্তব্য নয়, সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। তুমি পরতন্ত্র, তোমার নিজ বিচার-বুদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। বহির্জগতের প্রতি নিরপেক্ষ না হইলে, আনুগত্য-ধর্ম্মের অন্তর্নিষ্ঠা হৃদয়ে জাগে না। এই প্রকার অনন্তভাবে আনুগত্য দেখাইয়া কত ভক্ত আপনার জীবনে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে বিরল নয়। যদি শ্রীগুরুদেব দিনকেও রাত্রি বলেন, তোমার সেই ভ্রম-প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব রহিত অভ্রান্ত বাক্যের উপর অবিচারে নিষ্ঠা ও অটুট বিশ্বাস চাই—'আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারনীয়া'—এবং এইভাবে যদি জীবন-পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে এই জীবন ধন্যও

কৃতার্থ হইবে এবং বিশ্ববিজয়ী হইয়া জগতে আদর্শস্থান অধিকার করিতে পারিবে এবং বহু পথভ্রান্ত পথিকের কল্যাণকর হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযদুনন্দন রচিত কর্ণানন্দ গ্রন্থের তৃতীয় নির্য্যাসে দ্রোণাচার্য্য ফাল্গুনি সংবাদ ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বাক্যে কিরূপ অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এই আনুগত্য ধর্ম্ম ঠিক পতি-পত্নীধর্ম্মের মত—যেমন পতিব্রতা রমণীর পতিই আরাধ্য ও সেব্য এবং পতির বাক্য বেদবাক্যবৎ অবশ্যপালনীয়। ভুলেও পতির বিরুদ্ধাচরণ বা তাঁহার বাক্যের প্রতিকূলাচরণ বা তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই এবং যাহাতে তাঁর সুখ হয় তাহাই সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য; তদ্রূপ অনুগত ব্যক্তির সেই জীবন দেবতা পরম করুণাময় প্রাণারাম শ্রীগুরুদেবের প্রতি করা চাই—তবেই সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানের স্বরূপ শ্রীগুরুদেব হইতে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥ — চৈঃ চঃ

তখন সুদুর্লভ বস্তুও করতলগত হইবে, তুমি শ্রীকিশোরী ভাণ্ডারের গুপ্ত নিধি, ব্রহ্মরুদ্রাদি বাঞ্ছিত অমূল্য সম্পদ প্রেমামৃতাস্বাদনে এই জীবন ধন্য ও কৃতার্থ করিতে পারিবে। এই প্রেমই সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত মুখ্য প্রয়োজন এবং পরম পুরুষার্থ, "যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ"। শ্রদ্ধা হইতে প্রেম পর্য্যন্ত সাধকের জন্য যে ক্রমিক সোপানাবলী পূর্ব্বাচার্য্যগণ বাঁধিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধার কি চমৎকার বিশ্লেষণ হইয়াছে—

শ্রদ্ধা শব্দে কহি সুদৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥ — চৈঃ চঃ মধ্য

"সেই বিশ্বাস জন্মিবার মূল কারণ শরণাগতি (বা আনুগত্য)। অনন্য মনে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই বিশ্বাস জন্মে। এই শরণাগতি ছয় প্রকার—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলি আমার অনুকূল, বিশেষভাবে বিচার পূর্ব্বক হৃদয়ে অবধারণা করতঃ সেই সেই বিষয় গ্রহণের দৃঢ় সংকল্প এবং প্রতিকূল বিষয়গুলির কায়মনোবাক্যে সংসর্গ পরিত্যাগ করার সংকল্প, মোট কথা আমার যে যে বিষয়গুলি অনিষ্টকারী তাহাদিগকে প্রাণান্তেও গ্রহণ করিব না এবং যে যে বিষয়গুলি আমার ইষ্টকারী তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, ইহাতে জগৎব্রহ্মাণ্ড হইতে আমার পৃথক্ থাকিতে হয় সেও ভাল। এই যে দৃঢ়তা এইটিই শরণাগতির প্রধান সোপান। এই সোপানে আরোহণ করিলেই তিনি রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস জন্মিবে। যেমন বিশ্বাস জন্মিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা-কর্ত্তৃত্বপদে তাঁহাকে বরণ করা এবং বরণ করিয়াই তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদনকেই শরণাগতি বলে"। (শ্রীচরিত সুধা ৪র্থ খণ্ড ১৭১)

এইত গেল সাধক ও প্রবর্ত্তক অবস্থার কথা। সিদ্ধ ভাবনায় এবং অবস্থায়ও এই আনুগত্য চাই। রাগানুগা ভক্তির নাম হইতেই জানা যায় যে আনুগত্যই তার জীবন।

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥
রাগময়ীর ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥

লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥"

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥

"কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠ নিজ সমীহিতং
তত্তৎ কথা রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজেসদা" ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২ পরিচ্ছেদ )

এই অবস্থায় ও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন-মধ্যে নিজের অভীষ্ট কাহারও ভাবানুগত হইয়া মনোমধ্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা, এইটি রাগানুগাভক্তি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতে উপাসনা প্রণালীর নাম রাগানুগ পন্থা। এ পথের মূল ভিত্তিই আনুগত্য। এই আনুগত্য উকীলের আনুগত্যের মত কার্য্য সিদ্ধির পরে ছুটিয়া যাইবার নহে। এ সম্বন্ধ নিত্য এবং প্রাপ্তির পরেও থাকিবে। ব্রজভাবের উপাসনায় শ্রীগুরুরূপা সখী বা মঞ্জুরীর আনুগত্যে ভাবনা ও সেবা আবশ্যক। নিজ নিজ যূথেশ্বরীর আনুগত্য প্রয়োজন। কি সুন্দর প্রণালী। তোমার যূথেশ্বরীর যে সেবা তাহা ভিন্ন অন্য সেবার কথা ভাবিলে চলিবে না। তাহা আনুগত্য আইনের বিরুদ্ধ হইবে। তুমি স্বতন্ত্রভাবে একা কোন কিছুই করিতে পারিবে না—সর্ব্বদার মত শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে থাকিতে হইবে।

"শ্রীগুরুরূপা সখীর বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
চামরের বাতাস করিব ॥"
"সখীর অনুগা হ'য়ে কুঞ্জসেবা সব চেয়ে
দোঁহে ডাকিবেন সখি আয় ॥"

ইত্যাদী বহু বহু পদাবলী শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধদেহে সেবার লালসাময়ী প্রার্থনা। কোন সময়ে বা নির্জন স্থানে কৃষ্ণদর্শন হইলে কৃষ্ণ তোমাকে কামনা করিলেও শ্রীগুরুরূপা সখার আজ্ঞা ব্যতিরেকে কৃষ্ণ সহ মিলিত না হওয়াকেই রাগমার্গে সিদ্ধ ভাবনায় আনুগত্য বলা হয়। এইরূপ দৃষ্টান্ত রসিক পাঠকগণ ভাবিয়া লইবেন। রসগ্রন্থের কোহিনুর শ্রী উজ্জ্বল নীলমণির সখী-প্রকরণে নানাবিধ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত আছে দেখিয়া লইবেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবেশাবতার পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ চরণ দাস দেব (৺পুরীর বড় বাবাজী) মহাশয়ের শ্রীমুখের উপদেশ বাক্যে এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"সব ভাব হৈতে গোরার রাধাভাব সার।
রাধিকার ভাবে হয় সুখ পারাবার ॥
গোপীভাব নিজদেহে অঙ্গীকার করি।
গুরু আনুগত্যে ভজ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
গৌরাঙ্গ শ্রীরাধারাণী শ্রীগুরু মঞ্জুরী
তাঁর দাসীভাব সদা অঙ্গীকার করি ॥
এত ভাবে গৌরলীলা করিলে ভাবন।
হেথায় গৌরাঙ্গ পাবে, ব্রজে কৃষ্ণধন ॥"

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস
মুন্সেফ

# সান্ত্বনা।

দিয়েছ যে ভার, যে বোঝাটী ওগো, চাপায়ে আমার শিয়রে,—
বহিতেই হবে ;—'পারিব না' ব'লে কাঁদিলে কি হবে কাতরে ?
চলিয়াছি আমি সংসার মাঝে তোমারি ত বোঝা বহিয়া !
'পারিব না' ব'লে তবে কাঁদিব না,—বেদনা ও ব্যথা সহিয়া !
কেঁদেছি অনেক, আর কাঁদিব না,—কেন বল আমি কাঁদিব ?
বুঝি নাই ব'লে কাঁদিয়াছি এত,—এবার হৃদয় বাঁধিব !
এতদিন আমি বুঝি নাই ওগো, দেখি নাই তা'ত খুঁজিয়া ;
তুমিই যে আজ বুঝালে' আমারে তাই দেখিতেছি বুঝিয়া,—
যেই গুরুভার বোঝা দিয়ে শিরে মোরে পাঠায়েছ সংসারে ;
অকাতরে ওগো হাসিমুখে তাহা বহিতেই হবে আমারে !
তোমারি এ ভার, তব সংসার, আমার বলিতে আছে কি ?
তোমারি ত বোঝা বহিয়া গো আমি তব সংসারে চলেছি !
কিসের ভাবনা, কিসের বেদনা, কেন বা শঙ্কা করিব ?
পড়িব যতই বিপদে জড়া'য়ে,—তোমারি চরণ স্মরিব !
বিপদ-বারণ ভব-ভয়-হারী তুমি প্রেমময় নিত্য ;
চিরপ্রভু তুমি, আমি যে তোমার চির দিবসের ভৃত্য !
এইটুকু আমি ভুলে' যাই যবে, তখনি আকুল হই গো ;
যাতনা-বেদনা দুঃখ-কষ্ট সকলি তখন সহি গো !
এইটুকু যদি মনে থাকে, তবে আর কি আমার ভাবনা ?
বোঝা ব'য়ে যেতে তা হ'লে ত আমি কোনই কষ্ট পাব না !
তোমারি সৃজিত বিশ্ব, তুমি যে সকলি দেখিতে পাও গো !
যেই যতটুকু বহিতে পারিবে, তা'রে সেই ভার দাও গো !
তবে আমি কেন মিছে ভেবে মরি,—তুমি কর তব কর্ম্ম ;
তোমারি আদেশ পালিয়া যাইব, জানি না ধর্ম্মাধর্ম্ম !

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# কয়েকটি উক্তি

বহুদিবস হইল একটী পরম ধার্ম্মিক, শান্ত, শিষ্ট ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কিছুদিন সংসারাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মার্থে কয়েক বৎসর নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি ভারতবর্ষের অনেক দুর্গম ও গোপনীয় তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তিনি অল্প দিবসের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। ধর্ম্ম-কথায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। আমি ক্রমাগত ৬।৭ ঘণ্টা তাঁহার সহিত ধর্ম্মালাপে অতিবাহিত করিয়াছি। কখন কখন সারা রাত্রিই ধর্ম্মালাপে কাটিয়া যাইত। তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইবার কিছু দিবস পূর্ব্বে একদিবস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়! আমাদের ইন্দ্রিয়-লালসা কি কোন কালে মিটিবে না? এত সদ্‌গ্রন্থ আলোচনা করিতেছি, এত সদালাপ শ্রবণ করিতেছি, তথাপি বিষয়ে ত কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে না?"

তিনি আমার প্রশ্নের শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা কোন উত্তরদান না করিয়া একটী ছোট গল্পের অবতারণা করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার উপদেশ প্রণালী ঐরূপই ছিল। তিনি উপদেশ বলিয়া প্রকাশ্যে কোন উপদেশ দিতেন না। গল্পচ্ছলেই সকল কথা বলিয়া যাইতেন। কথাগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে, একটী একটী করিয়া, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার বাক্য-সুধা পান করিয়া কাহারও কখন অতৃপ্তি আসিত না। তিনি আরম্ভ করিলেন—"আমাদের বঙ্গদেশীয় একটী ভদ্রলোক কার্য্যব্যপদেশে বহু দিবস উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ

ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুগণ কদাপি মৎস্য ভক্ষণ করেন না। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদের প্রবাসী বাঙ্গালীবাবুও বহুদিবস মৎস্য ভোজন করেন নাই। কিন্তু কালে তাঁহার মৎস্য ভক্ষণের প্রবল লালসা জন্মিল। কিছু দিবস মনোগত অভিপ্রায় গোপন রাখিয়া, এক দিবস ঐ দেশীয় স্বীয় ভৃত্যকে বলিলেন—"দেখ, আমরা বাঙ্গালী, দেশে প্রতি দিবস মৎস্য আহার করিতাম, অনেক দিবস মৎস্য না ভোজন করিয়া মৎস্য ভোজনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। তুমি গোপনে কোন স্থান হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিয়া, গোপনে তাহা পাক করিয়া আমাকে খাওয়াইবে। ভৃত্য প্রভুর বাক্যে সম্মত হইল। কিন্তু সে স্থানে জলাশয়াদি হইতে মৎস্য ধৃত করিবার রীতি ছিল না বলিয়া সে কোন ক্রমেই মৎস্য সংগ্রহ করিতে পারিল না। অগত্যা সে গোসাপ জাতীয় কোন জন্তুকে হনন করিয়া তাহার মাংস ঘৃতমসলাদি সংযোগে উত্তমরূপে পাক করিয়া তাহার প্রভুর খাদ্যের জন্য আনয়ন করিল। প্রভু বহুকাল পরে মৎস্য প্রাপ্ত হইলাম মনে করিয়া সেই খাদ্য অম্লান-বদনে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। এইরূপ কিছু দিবস চলিতে লাগিল। এক দিবস প্রবাসী বাবুর মনে হইল—আমি প্রতিদিন উত্তম মৎস্য ভক্ষণ করিতেছি। কিন্তু কি মৎস্য আহার করিতেছি তাহা ত কোন দিবস দেখি নাই আজ দেখিব ভৃত্য আমাকে কি মৎস্য খাওয়ায়। এই মনে করিয়া তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, 'তুমি যে মৎস্য আমাকে প্রতিদিন দিতেছ, তাহা কিরূপ মৎস্য আমাকে দেখাও।' ভৃত্য কি করে; অগত্যা গোসাপ বা তজ্জাতীয় কোন জীব লইয়া তাহাই দেখাইল। দেখিবামাত্র বাবুটীর মৎস্যের উপর এমন ভয়ঙ্কর অরুচি ও বিতৃষ্ণা জন্মিল যে, তিনি তাঁহার আহার্য্য স্মরণ মাত্রেই নিয়ত বমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বমন নিবৃত্তি হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। বহু কষ্টে তাঁহার বমন শান্ত হইয়াছিল। আমাদেরও বিষয়-তৃষ্ণা ঐরূপ।

যে দিন, বিষয়ের প্রতি প্রকৃত ঘৃণা উপস্থিত হইবে সে দিন আর বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি রহিবে না। কেহ কেহ বলেন বিষয়-মধু বা ভব-মধু হরণ করেন বলিয়াই শ্রীভগবানের নাম "মধুসূদন"। অতএব মধুসূদনকে অনুদিন অনুধ্যান করিতে করিতেই একদিন বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িবে।"

এই মহাত্মা আর এক দিবস বলিয়াছিলেন—"ভগবচ্চিন্তার জন্য নির্জ্জন স্থানের প্রয়োজন এ কথা সত্য। কিন্তু নির্জ্জন স্থান না মিলিলেও আমার কোন ক্ষতি হয় না। আমি জনকোলাহলপূর্ণ লোকালয়ে থাকিয়াও ভগবচ্চিন্তা করিয়া থাকি। লোক-সমাগম আমার চিন্তার-ধারাকে প্রতি-রুদ্ধ করিতে পারে না।

এক দিবস মৃত্যুর সময় জীবের কিরূপ অবস্থা হয় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কহিলেন—"আমি এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতামূলক একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। বিশ্বাস করা বা না করা আপনাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিছু দিবস পূর্ব্বে আমার একটী সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই আমাকে জবাব দিয়াছিলেন। আমি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে মৃত মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে রোদন করিতেছিল। সহসা আমার মনে হইল, আমি দেহত্যাগ করিয়া মস্তক হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম আকারে বহির্গত হইয়া আসিলাম। ক্রমশঃ আমি ঘুড়ির ন্যায় অনেক দূর পর্য্যন্ত আকাশে উত্থিত হইলাম। কিন্তু আমার দেহের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। একটী সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে আমি দেহের সহিত যুক্ত ছিলাম। আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনাদি বেশ শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে কিরূপে জানিনা সেই সূত্র অবলম্বনে আমি ধীরে ধীরে পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে আমার সংজ্ঞা হইল, আমি বাঁচিয়া গেলাম।"

থিওসফিষ্ট গণের গ্রন্থে যে silver chord কিংবা রজত সূত্রের কথা পাঠ করিয়াছি, ব্রাহ্মণের কথিত সূত্রই বোধ হয় সেই রজতসূত্র। এই সূত্র ছিন্ন হইলে আর জীবাত্মা পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

তারপর সর্ব্বজন বিদিত আর একটী লোকপাবন মহাত্মার দুই একটী উক্তির উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রায় ৩৮ বৎসর হইল শ্রীধাম নবদ্বীপের পরপারে মায়াপুরে (?) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মায়াপুরে বিশেষ সমারোহে উৎসব হইয়াছিল। বঙ্গের নানা স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া এতদুপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পরে মায়াপুরে ও বল্লালদিঘী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলাম। সেবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি দিবসে সন্ধ্যার পরই চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন ও হরিনাম কোলাহলের বিরাম ছিল না। নামসঙ্কীর্ত্তন স্রোতে সত্য-সত্যই "নদে ভেসে" যাইতেছিল। সেই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনধ্বনির মধ্যে আমরা এক স্থানে দর্শন করিলাম—পরমভাগবত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হরিবোলানন্দ নামক অপর একটী সাধু-মহাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য স্মরণ করিলে অদ্যাপি সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়। বস্তুতঃ আমরা ভাগীরথীর পবিত্র পুলিনক্ষেত্রে, সেই পুণ্যময়ী তিথিতে, গগনভেদী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে, যে স্বর্গীয় দৃশ্য সন্দর্শন করিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। এই মহাপুরুষদ্বয়ের দেহে কলিযুগ পাবনাবতার সঙ্কীর্ত্তনেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর সত্য সত্যই আবিষ্ট হইয়াছিলেন কিনা ভাবিবার দেখিবার বিষয়। যাহা হউক, মহান দৃশ্য কিছুকাল পরম শ্রদ্ধাসহকারে উপভোগ করিয়া। আমরা যথারীতি জাহ্নবী জলে অবগাহন করিলাম এবং স্নানান্তে নানা স্থানে দেব-দর্শন করিয়া

বেড়াইতে লাগিলাম। পরদিবস একটী ভক্তিমতী বৈষ্ণবীর গৃহে বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় দর্শন করিলাম মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"মাধব দাস নামে একটী সাধু বৈষ্ণবের সহিত জগন্নাথ দেবের বিশেষ সখ্য ছিল। জগন্নাথ দেব প্রতিদিন শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া, মাধবকে ডাকিতেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া বেড়াইতেন। এক দিবস মাধবকে সঙ্গে লইয়া একস্থানে কাঁঠাল চুরী করিবার অভিপ্রায়ে গমন করিলেন। কাঁঠাল ফল চুরি করিয়া লইয়া যাইবেন, এমন সময় উদ্যান-পালক জাগরিত হওয়ায়, জগন্নাথ দেব দ্রুত-পদে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। সঙ্গী মাধব ধৃত হইলেন এবং উত্তম মধ্যম প্রহারও লাভ করিলেন। কিন্তু তিনি জগন্নাথ দেবের রহস্য-কথা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। পর দিবস জগন্নাথ দেব মাধবকে ডাকিয়া অনেক হাসিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রহারের জন্য তাঁহাকে অনেক প্রবোধও দিয়াছিলেন। ক্রমে এই ভক্ত মাধবের আমাশয় রোগ হইল। শুশ্রূষা ও সেবা করিবার কেহ ছিল্ না বলিয়া তিনি সমুদ্রতীরে মল-মূত্রে আপ্লুত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এক সময় দেখিলেন, জগন্নাথদেব স্বয়ং তাঁহার গাত্রলগ্ন "মলমূত্র ধৌত করিয়া দিতেছেন। তখন মাধব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর! তোমার এ কি কাজ! তুমি স্বয়ং এই ঘৃণিত কার্য্য করিতেছ! তুমি ত সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি ইচ্ছা করিলেই ত, আমার এই রোগটী ভাল করিয়া দিতে পারিতে!" ইহাতে জগন্নাথদেব উত্তর করিলেন—"জীব, আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে, কিছুতেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। তবে আশ্রিত ও অনুগত ভক্তগণের বিষাদ দেখিলে, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অন্য কথা দূরে থাকুক, স্বহস্তে নীচ কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ কোন কার্য্যই হীন বা নীচ নহে।

আমার চক্ষুতে সকল কার্য্যই সমান।" মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কথিত এই সরস উপাখ্যান হইতে কর্ম্মফলের অখণ্ডনীয়তা এবং শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গেল। কিছু দিবস পরে সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই আখ্যায়িকার সুবিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের আরও অনেক মহতী বাণী স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে; অতএব সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট অদ্য এই স্থানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম, বারান্তরে আবার কিছু দিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

# মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র

[ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিত ]

আজ বাঙ্গালা অন্ধকারময়, কেবল বাঙ্গালা নহে, সমগ্র ভারতে সে আঁধারের ছায়া পড়িয়াছে, এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার মুকুট-মণি আজ খসিয়া পড়িয়াছে, গৌরব-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, আদর্শের প্রতিমূর্ত্তি কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে, চারিদিকে প্রবাহিত দানের স্রোত শুকাইয়া উঠিয়াছে, হিন্দু-সমাজের বিরাট স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালীর জাতীয়তার চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে, ধর্ম্ম আশ্রয়হীন হইয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন আদর্শ চিরতরে বিদায় লইয়াছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের অভাবে বাঙ্গালায় তথা ভারতবর্ষে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তাই চারিদিকে হাহাকারের রব শুনা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাথায় হাত

দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, পিতৃ মাতৃ-কন্যাদায়গ্রস্তেরা কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, দীন দরিদ্র চারিদিকে আঁধার দেখিতেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলী নৈরাশ্যে কাতর হইয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যসেবীরা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বিশাল কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির দরিদ্র প্রজাগণ আর্তনাদে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে। বৈষ্ণব ভক্তগণের হৃদয়ও দারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, আর বাঙ্গালী মাত্রেই অশ্রুজলে দেহ সিক্ত করিয়া তুলিতেছে। এই ধর্ম্মহীনতার দিনে, শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞার দিনে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কোথায় গিয়া আশ্রয় ও শান্তি পাইতেন? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকটে। বৈষ্ণব ভক্তগণ কোথায় গিয়া আনন্দলাভ করিতেন? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকটে। পিতৃমাতৃ-কন্যাদায়গ্রস্তদের অবলম্বন কে ছিল? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্র। দীন দরিদ্র অন্ন-বস্ত্রের জন্য কাহার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইত? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্রের দ্বারে। ছাত্রমণ্ডলী বিদ্যালাভের জন্য কাহার নিকট হাত পাতিত? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকটে। সাহিত্যসেবীরা সাহিত্যচর্চ্চার জন্য কাহার নিকট হইতে সাহায্যলাভ করিতেন? ঐ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট হইতে নহে কি? আর কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির দরিদ্র প্রজাগণ কাহার নিকট হইতে করদায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিত? ঐ আদর্শ দয়ালু মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট হইতে। তাহাদের জন্য পুষ্করিণী, কূপ খনন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দাতব্য ঔষধালয়ের স্থাপন, করভার হইতে অব্যাহতি, এ সকল তাহারা তাঁহারই নিকট হইতে পাইয়াছে। তাহাদের দায় অদায়ে, বিপদ আপদে তাহারা তাহাদের পিতাস্বরূপ মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট হইতেই অভয়-লাভ করিত। আমরা অনায়াসে মহাকবি কালিদাসের সেই অমর শ্লোকটি উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি,—

"স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

ফলতঃ এই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তামস যুগে মণীন্দ্রচন্দ্র যে আদর্শ

দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া যায় না! ধনকুবের হইয়া যিনি নিরহঙ্কারের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, সৌজন্যে অমায়িকতায় যিনি অতুলনীয় ছিলেন, রাজা মহারাজা হইতে দীন দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত যাঁহার দ্বার অবারিত ছিল, বিনয়ের অপূর্ব্ব পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন করিয়া দিতেন, নিতান্ত দরিদ্রকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন দান করিতেন, বৈষ্ণব সাধু ও সন্ন্যাসিগণের চরণে লুটাইয়া পড়িতেন, ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশিয়া নগর-কীর্ত্তনে যোগ দিতেন, বাঙ্গালার ধনি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তবিক তাঁহার তুলনা আছে কি? হিন্দুধর্ম্ম—বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরাগ যাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, হিন্দুর আচার ব্যবহার, হিন্দুর সামাজিক প্রথা রক্ষার জন্য যাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল, এই সেদিনও বাল্যবিবাহ বিরোধ আইনের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতার টাউনহলে সভাপতিত্ব করিতে গিয়া যিনি গুণ্ডাদের হাতে পড়িয়াছিলেন, তিনি যে হিন্দুসমাজের বিরাট স্তম্ভ ছিলেন, তাহা কি সত্য নহে? তাঁহার অভাবে বিশৃঙ্খল হিন্দুসমাজে যে আরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিন্দুর আদর্শ তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা ত তাঁহার নিত্যব্রত ছিল, তদ্ভিন্ন অতিথি অভ্যাগতের সেবা তিনি অকাতরে করিতেন। সম্ভ্রান্ত হউক, অসম্ভ্রান্ত হউক, তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, তিনি সকলকেই রাজভোগে পরিতৃপ্ত করিতেন। হিন্দুর প্রতি পর্ব্বানুষ্ঠান তাঁহার বাটীতে হইত, সহর মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের যাবতীয় ভদ্রলোককে প্রতি পর্ব্বেই ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইত। আর বিবাহাদি ক্রিয়ায়সময় জাতিকে যেরূপ ভাবে নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্যে তৃপ্ত করা হইত, তাহা এ কালে কোথায়ও লক্ষিত হয় নাই। দীন দরিদ্রদিগকেও মধ্যে মধ্যে আহারে সন্তুষ্ট করা হইত, তদ্ভিন্ন তাহাদের অন্ন বস্ত্র দানেরও ব্যবস্থা ছিল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকেও সেই

প্রাচীন আদর্শে প্রতিপালন করা হইত। তাঁহার রাজভবন আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া সর্বদা একটি গণ্ডগ্রামের ন্যায় বোধ হইত। সেই সকলকে লইয়া তাঁহার যেন একটি সুবৃহৎ পরিবার হইয়া উঠিয়াছিল, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সাহায্য করাও হইত। কাহাকে কাহাকে বৃত্তিও দেওয়া হইত, কাহাকে কাহাকে ঋণমুক্ত করাও হইত। কর্ম্মচারীদেরও দায় অদায়ে সাহায্য করা হইত। এ সকল কি প্রাচীন আদর্শের লক্ষণ নহে?

তাই বলিতেছিলাম, মণীন্দ্রচন্দ্রের অভাবে একটি অতুলনীয় প্রাচীন আদর্শের অবসান ঘটিল। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালার প্রকৃত জাতীয়তাও লোপ পাইল। মণীন্দ্রচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে তিনি খাঁটি বাঙ্গালীই ছিলেন, বিদেশীয় বিজাতীয় ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষও যেমন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, মণীন্দ্রচন্দ্রও সেইরূপ খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, কাজেই তিনি যে বাঙ্গালী জাতির গৌরব, এ কথা অকপটে বলা যাইতে পারে। যদি বাঙ্গলায় প্রকৃত জাতীয়তা শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মণীন্দ্রচন্দ্রের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করাই উচিত। মুখে জাতীয়তা জাতীয়তা করিয়া চীৎকার করিয়া বিদেশীয় বিজাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলে তাহাতে জাতীয়তার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। যে জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহাই সেই জাতির জাতীয়তা, বিদেশের নিকট বা বিজাতির নিকট হইতে ধার করিয়া কখনও জাতীয়তা অর্জ্জে পায় না। জাতির প্রকৃতি হইতে যাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহাই তাহার জাতীয়তা। মণীন্দ্রচন্দ্র হিন্দু ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন; তাই হিন্দু জাতির, বাঙ্গালী জাতির স্বপ্রকৃতি হইতে যাহা প্রকাশিত হয়, মণীন্দ্রচন্দ্রে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাই আমরা তাঁহাকে প্রকৃত হিন্দু, খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মণীন্দ্র

চন্দ্র বাল্যজীবনে অবশ্য কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন নাই। যৌবনের মধ্য সময়েই তিনি এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। বাল্যজীবনে কাশীমবাজার রাজসম্পত্তি হইতে যে সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই তাঁহাকে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় কাটাইতে হইয়াছে। তাই গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা তাঁহার সুচারুরূপেই ঘটিয়াছিল, মণীন্দ্রচন্দ্র জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই গার্হস্থ্যজীবনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার গার্হস্থ্য জীবন প্রতিপালন তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, তিনি সে লক্ষ্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। এই গার্হস্থ্য জীবনের সহিত তাঁহার বিপুল সম্পত্তির সংযোগ হওয়ায়, তিনি এ কালে অভাবনীয় কাণ্ডই করিয়া গিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি যে, যৌবনের মধ্য সময়ে তিনি রাজসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু যৌবনকালের বা সম্পত্তি-শালীদের কোন দোষই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় সংযমী পুরুষ, কি ধনী কি মধ্যবিত্ত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আহার বিহার সর্ব্বত্রই তাঁহার সংযমশীলতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার ন্যায় নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে দুর্লভ, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

মহারাজের জীবন-কথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়াই অভিপ্রায়, তাই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যে যে ঘটনায় ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই দুই এক কথা বলিব। আমরা বলিয়াছি, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সামান্য গৃহস্থ-জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয়। পিতার নাম নবীনচন্দ্র নন্দী, মাতার নাম গোবিন্দসুন্দরী। উপেন্দ্রচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, মণীন্দ্রচন্দ্র নামে ইহাঁদের তিন পুত্র জন্মে। শৈশবেই যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়, বিবাহিত হইয়া উপেন্দ্রচন্দ্রও পরলোকগত হন। দুই বৎসর বয়সে মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ

ঘটে, কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতৃদেবও চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইহাঁরা কলিকাতার শ্যামবাজারে রামকান্ত বসুর লেনে বাস করিতেন। তাই যে কাশীমিত্রের ঘাটে তাঁহারা চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন, মণীন্দ্রচন্দ্রের নশ্বর দেহও সেইখানে ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্যামবাজারের বাটীতে থাকিয়া পিতৃমাতৃভ্রাতৃহীন মণীন্দ্রচন্দ্র কোন কোন নিকট আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়া কিছু কিছু শিক্ষালাভও করিয়াছিলেন, শিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগও ছিল, তাই তিনি চিরজীবন সেই শিক্ষার জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। আর ঐরূপ জীবনস্রোতে পড়িয়া তিনি সাংসারিক শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন, তাই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গৃহস্থ-জীবনের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। মাতুলের সম্পত্তি হইতে যে কিছু সামান্য বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিয়া বাঙ্গালী একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম জীবনে সকলকেই চমৎকৃত করিয়া তুলিতেন। সম্পত্তি পাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মে। কিন্তু তিনি আপনার ভগিনী ভাগিনেয়দিগকে লইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল কাটাইতেন। কলিকাতা হইতে কিছুদিন তাঁহার পৈতৃক নিবাস বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণে বাস করিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বহরমপুরে আসেন। কিন্তু তাঁহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার প্রতি সুদৃষ্টিপাত করিতেন না। সে অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। বহরমপুরের সকলে কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অনেকে ভয়ে ভয়ে তাঁহার সহিত মিশিতে না পারিলেও মনে মনে যে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বহরমপুরের জমীদার এবং সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ও আরও কেহ কেহ তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যভাবেই সহানুভূতি দেখাইতেন। সেই সহানুভূতি প্রকাশের

জন্য তাঁহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া আবার বহরমপুর হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের লোকেরা তাঁহার প্রতি এরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর যখন মণীন্দ্রচন্দ্র সম্পত্তির অধিকারী হইয়া মুর্শিদাবাদে আসেন, তখন ভাগীরথীর দুই ধারে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া তাঁহার জয়গান করিয়াছিল, আর বহরমপুরে তাঁহার যে অভ্যর্থনা হইয়াছিল, সেরূপ অভ্যর্থনা লাট সাহেবেরাও পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। মণীন্দ্রচন্দ্র তাহা অবশ্য ভুলেন নাই, তাই বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও মুর্শিদাবাদবাসিগণ কখনও ভুলিবে না।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুল রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশীমবাজার রাজ সম্পত্তির অধিকারিণী হন। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্ত বাবু কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণনাথ তাঁহার প্রপৌত্র। মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যু সময়ে কিন্তু কৃষ্ণনাথের মাতা হরসুন্দরী জীবিত ছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র ও আইন অনুসারে তিনিই উত্তরাধিকারিণী হন, মণীন্দ্র-চন্দ্রের অবশ্য তাঁহারই পর সম্পত্তি পাওয়ার কথা। সম্পত্তি মহারাণী স্বর্ণময়ী বা রাণী হরসুন্দরীর জীবনস্বত্ব, ভাবী নির্ব্যূঢ় স্বত্বের অধিকারী দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রকে জীবিত অবস্থায় অর্পণ করিয়া যান। যখন মণীন্দ্রচন্দ্র কাশীম বাজার রাজসম্পত্তির অধিকারী হইলেন এবং তাহার সদ্ব্যয় আরম্ভ করিলেন তাহার পূর্ব্বে মহারাণী স্বর্ণময়ী যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, যে দানের স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন, মণীন্দ্রচন্দ্র সেই পথই ধরিলেন, আর স্রোতকে যারপরনাই বাড়াইয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রথম সৎকার্য্য হইল মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানসাগর শ্রাদ্ধ। দেশবিদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিতে, গরীব দুঃখীতে কাশীমবাজার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাতুলানীর

নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তির এরূপ ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। তাহার পর ক্রমাগত দানের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। আবার রাণী হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধও ঐরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইল। পুত্র কন্যাদের বিবাহেও অর্থব্যয়ের ক্রটি হইল না। তাহাতেও অনেক লোকে উপহার লাভ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বার্ষিক প্রদান, ছাত্রদিগের শিক্ষার ও পরীক্ষার সাহায্য, গরীব দুঃখীদিগকে অন্নবস্ত্র দান, সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য প্রদান, প্রজাদের জন্য পুষ্করিণী কূপ খনন, ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা, তাহাদের বালকগণের জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন, বেলডাঙ্গা, এথোড়া প্রভৃতি স্থানে উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা, সেই সমস্ত স্কুলের জন্য বাটী ও বোর্ডিং গৃহ নিৰ্ম্মাণ; বহরমপুরের জলের কল যাহা মহারাণী স্বর্ণময়ী সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা সম্পূর্ণ করা, বহরমপুর কলেজে ও কলেজ স্কুলে সহস্র সহস্র অর্থ দান, কলেজ স্কুলের বাটী নিৰ্ম্মাণ তদ্ভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ের শিক্ষার জন্য কলিকাতা বাগবাজারের পালিটেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন, এথোড়ায় মাইনিং স্কুলের প্রতিষ্ঠা, বহরম-পুর কলেজে কমারশিয়াল বিভাগ খোলা আর্য্য-চরিত্রের উন্নতির জন্য রাঁচিতে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন; বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য, সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরের জন্য ভূমি দান, তদ্ভিন্ন সৰ্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে তিনি তাঁহার বিশাল ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষাবিস্তারে তিনি অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মাতুল রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া কাশীমবাজারের নিকট তাঁহার প্রিয় বাগানবাটী বান-জেটিয়ায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। তখন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সে উইল রদ করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী সম্পত্তির অধিকারিণী হন। মণীন্দ্রচন্দ্র মাতুলের সেই অভিপ্রায় পূর্ণ

করিবার জন্যই শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। বহরমপুর কলেজে সহস্র সহস্র অর্থব্যয় করিয়া তিনি তাহার কৃষ্ণনাথ কলেজ নাম দিয়াছেন। এই শিক্ষাবিস্তারে ও অন্যান্য কার্য্যে তিনি কোটি টাকার উপর দান করিয়াছেন। শীযুক্ত গান্ধী বহরমপুরে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, মহারাজের দানশীলতার কথা তিনি পূর্ব্ব হইতে জানিলেও বহরমপুরে আসিয়া কোটিটাকার উপরে দানের কথা শুনিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যদের মধ্যেও কেহ এত অধিক দান করিয়াছেন বলিয়া তিনি জ্ঞাত নহেন। গান্ধী না জানিলেও মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের কথা সকলেই জানিত। তাঁহার কয়েকটি প্রধান প্রধান দানের কথা উল্লেখ করিতেছি। বহরমপুর জলের কল সম্পূর্ণ করার জন্য ২ লক্ষ ৮০ হাজার বহরমপুর কলেজ স্কুল বাটীর জন্য ১ লক্ষ ৩২ হাজার, স্যার জগদীশচন্দ্রের বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ১ লক্ষ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস অধ্যাপনার জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০ হাজার, আর তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য ২ লক্ষ টাকা তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহস্র সহস্র টাকা দানের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার ভাণ্ডার এইরূপ দানে শেষে নিঃশেষ হইয়া উঠিয়াছিল, তবুও তিনি তাহা হইতে বিরত হন নাই। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের জন্যও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতায় চীনামাটির কারখানা, রাজগী পাথরের কার্য্য, চাঁইবাসা গড়নের মাটির কার্য্য প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। কলিকাতার টাউনহলে সর্দ্দাবিলের প্রতিবাদ সভায় তিনি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্মিলনীতে যোগ দিয়া তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, আর সাধারণের কার্য্যের জন্য তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য এবং বহরমপুর মিউনিসিপালিটি ও মুর্শিদাবাদ জেলা-

বোর্ডের চেয়ারম্যানেরও কার্য্য করিয়াছিলেন। সরকার হইতে তিনি মহারাজ ও কে-সি আই-ই উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরাধিকারী মহারাজ উপাধি পাইবেন বলিয়া সরকার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। এখন এক মাত্র পুত্র শ্রীশচন্দ্রই তাহার উত্তরাধিকারী। সেই পুত্ররত্ন, বিধবা সহধর্ম্মিণী, পৌত্র, পৌত্রী, কন্যা ও দৌহিত্রী প্রভৃতি বৃহৎ পরিবার রাখিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গালী কখনও ভুলিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অনন্ত কালসাগরে অসংখ্য মানুষের বুদ্বুদ্ উঠিতেছে ও লয় পাইতেছে। কিন্তু মানুষের মত মানুষ কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? তাই বলিতেছি,—

"জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"

(বঙ্গবাসী হইতে)

# নবদ্বীপ সংবাদ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান প্রাচীন মায়াপুরে গত ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীশ্রীরাস পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অতি মনোরম সুবৃহৎ ধাতুময় মূর্ত্তি-যুগল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বিগ্রহের ওজন একমণ হিসাবে আছে। শ্রীবিগ্রহ-যুগল দিয়াছেন কলিকাতা দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীট নিবাসী গৌরভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার কারফর্ম্মাদাদা মহাশয়। এই সেবা প্রকাশের প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্মী হইতেছেন আমার গুরু-ভগিনী শ্রীমতী নবনলিনী দেবী। লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এই সেবা পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। সেবা প্রকাশ উপলক্ষে অষ্টপ্রহর ব্যাপী কীর্ত্তন ও প্রায় তিন শত লোককে প্রসাদ বিতরণ সহ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পর

দিবসে এই বিগ্রহদ্বয়কে লইয়া ভক্তমণ্ডলী ও ভজনাশ্রমের যাবতীয় লোক সংকীর্ত্তনরঙ্গে নগরভ্রমণ ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দিরের স্থান পরিদর্শন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে বহু বিদেশীয় তীর্থযাত্রী ও শিক্ষিত লোক প্রাচীন মায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়া নবদ্বীপ সম্বন্ধে বিগত ৪৪৪ বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গৌর-জন্ম স্থানের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই ইচ্ছা আগামী মাঘ মাসে ধুলট মেলার সময় প্রাচীন মায়াপুরে ৪। দিবস ব্যাপী কোন একটি উৎসব হয়। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে চব্বিশ প্রহর ব্যাপী কীর্ত্তনের সূচনা হইবে। এই লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও উন্নতি বিধানকল্পে আমরা গৌরভক্ত ও ধনী সন্তানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই উপলক্ষে যিনি যে যে বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিলে আমরা সেই সেই রূপেই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইব।

৩০শে কার্ত্তিক তারিখের উৎসব করিতে ২২৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে নগদ পাওয়া গিয়াছে ১০১৲ টাকা, বাজারে দেনা ৭২৲ টাকা, সিংহাসন খরিদ বাবদে কাওলাত হইয়াছে ৫০৲ টাকা। বিস্তৃত বিবরণ সাধনা পত্রিকায় পাঠাইয়াছি। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।

নিবেদক শ্রীব্রজমোহন দাস

প্রাচীন মায়াপুর—নবদ্বীপ।

# প্রশ্নোত্তর বিভাগ।

**পরম পূজনীয় সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—**

আপনার আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের ভক্তি দেখিলাম। ভাদ্র মাসে যে সকল প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর তো আপনার কোন পাঠক

মহাশয়েরা দেন নাই, কারণ কি বুঝিলাম না। শ্রীমন্মহাপ্রভু কি বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকট হইয়া বা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তের সেবা গ্রহণ করিতেছেন না? আমার মনে হয় পাঠক মহাশয়েরা একটু কষ্ট করিয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলে সাধারণের অনেক উপকার হইতে পারে; পূর্ব্বে প্রকাশিত ছাড়া সেবা-**প্রকাশ** এ অধমের চক্ষে আরো যেখানে যেখানে পড়িয়াছে বা স্মরণ আছে তাহা নিম্নে দিলাম।

## বিহার উড়িষ্যা

(১) বিহার উড়িষ্যা আজকাল বাঙ্গলার বহিরে। উড়িয্যার শ্রীপুর জগন্নাথ ধামে তো অনেক বিগ্রহ আছেনই, তা ছাড়া প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূরে চিল্‌কা হ্রদের নিকট শ্রীআলালনাথে (যেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা অন্তে অনবসর কালে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যাইতেন ও থাকিতেন) পরম পূজনীয় বিরক্ত বৈষ্ণব প্রবর শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠের অধিকারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিগ্রহ সেবা করিতেছেন। অনেকেরই বোধহয় জানা নাই যে, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল এইখানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই নিজের সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, সে চিহ্ন একখানি প্রকাণ্ড পাথরে বিরাজ করিতেছেন, উক্ত অধিকারী মহারাজ এই অমূল্য রত্নটী অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার উপর মন্দির করিয়া নিত্য সেবা পূজার ও সাধারণের দর্শনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যাহা প্রায় ৪৩০ বৎসরের মধ্যে কাহারো চেষ্টায় হয় নাই।

(২) বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জিলার সদরে সহরের বড় রাস্তার উপর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত অশেষ ভক্তিমান শ্রীমন্মহারাজা রঘুনন্দন প্রসাদ প্রকাণ্ড মন্দির করিয়া শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ সেবা

করিতেছেন। এখানে বিশেষত্ব এই, মহারাজ বাহাদুর বাঙ্গালী নন, তিনি বিহারি হইয়া এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও নিজে সেবা কার্য্য সম্পাদন না হওয়া পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন না। এই মুঙ্গের জিলার মধ্যে জামালপুরে E. I. Ry Loco Componnd এর ঠিক বাহিরেই একটী সাধারণ বিহারি ভদ্রলোক ছোট হইলেও সুন্দর একটী মন্দির করিয়া তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীসীতারাম ঠাকুর প্রতিষ্ঠা এবং সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(৩) বিহার প্রদেশের ভাগলপুর সহরে ষ্টেশনের খুব নিকটে এক ধনী বিহারি ভদ্রলোক শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

## উত্তরপশ্চিম প্রদেশ

উত্তর পশ্চিম যুক্ত প্রদেশের শ্রীবৃন্দাবন ধামে তো অগণন শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ জীউর সেবা প্রকাশ আছেই এবং ব্রজ ৮৪ ক্রোশের নানাস্থানে বিরক্ত বাবাজী মহারাজদিগের সেবা আছেই তা ছাড়া শ্রীশ্রীগিরিরাজের তরটীতে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের রাস্তার উপর শ্রীকুসুম সরোবরে গোয়ালীয়ারের মহারাজ বাহাদুরের ভ্রাতা "ভাইয়া সাহেব" শ্রীকুসুম সরোবরবাসী সিদ্ধমহাত্মা নিত্যধাম গত শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীমন্‌আচার্য্য প্রভু পরিবার ভুক্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দির করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ এবং শ্রীগৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুদেবকে গুরুদক্ষিণা দিয়া ব্রজে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

## পাঞ্জাব প্রদেশ

পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর সহরে কয়েকটী শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌর

নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং যথারীতি সেবা পূজা চলিতেছে। সমস্ত পাঞ্জাবের মধ্যে আরো অন্য কয়েক জেলায় অনেক শ্রীগৌর ভক্ত আছেন কিন্তু পাঞ্জাবী।

## বোম্বাই প্রেসিডেন্সি

এই প্রেসিডেন্সির সুরাট জেলার মধ্যে একটি গ্রামে সমস্ত গ্রামের লোকই শ্রীগৌর ভক্ত এবং শ্রীগৌর নিত্যানন্দ সেবা করিতেছেন। আমদাবাদের নিকট বরোদারাজ্যের এক প্রান্তে শ্রীনর্ম্মদা নদীর ধারে একটী বড় গৌড়ীয় আস্থানে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সেবা গ্রহণ করিতেছেন। গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাম দাস বাবাজী মহাশয় মহোৎসব উপলক্ষে কীর্ত্তন করিতে গিয়া নিকটস্থ গ্রামবাসীদের শ্রীনাম বিতরণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীদারোকা ধামে এবং ডাকোরজীতে (Dakore) ত্যাগী বিরক্ত কয়েকটী সাধু মহাত্মারাও গুপ্তভাবে সেবা করেন।

## মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি

মদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গঞ্জাম জেলার গঞ্জাম সহরে এবং বহরমপুরে শ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা শ্রীগোস্বামী প্রভুদের দ্বারায় সুন্দর রূপে চলিতেছে, আর বোধহয় মাদ্রাজ সহরে এক মূর্ত্তি বাঙ্গালী বাবাজীর দ্বারা সেবা চলিতেছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ (অর্থাৎ সমস্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত) করিয়াছিলেন এবং কোটী কোটী লোককে নাম বিতরণ করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন তাদের মধ্যে কি কেহই তাঁর স্মৃতি-চিহ্ন কিছুই রাখেন নাই? এদিকে কি প্রচারের আবশ্যক নাই?

## আসাম প্রদেশ

আসামের অনেক স্থানে সেবা প্রকাশ আছে এবং ঐ প্রদেশের অন্তর্গত স্বাধীন মনিপুর রাজ্যে অনেক ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা পূজা

করেন, এখানে আর একটী জিনিষ দেখিয়া বড় আনন্দ হয়। রাস্তায় প্রায় প্রত্যেক মনিপুরিই কন্ঠি এবং তিলকধারি গৌর ভক্ত। অসভ্য নাগা এবং কুকিদের মধ্যে বাস করিয়াও এরা পরম বৈষ্ণব। নাম সংকীর্ত্তনে এবং সবা পূজায় সিদ্ধ হস্ত।

## ভারতের বাহিরে

বোধহয় ইউরোপের লণ্ডন সহরে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিগ্রহ এবং মন্দির প্রস্তুত হইয়া আছেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হন নাই; সমস্ত পৃথিবীতে বাঙ্গালী যান নাই বা বাস করেন নাই এমন স্থান নাই, যে যেখানে আছেন চেষ্টা করিয়া আমেরিকায়, জাপানে বা চায়নায় এবং জার্ম্মাণীতে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করুন না? এখন আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তা এ প্রশ্ন করিয়া ছিলেন কেন, তাহা প্রকাশ করিবেন কি?

গতবারে পিনাং আকিয়াবের কথা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার সম্বন্ধে আরো অনেক লিখিবার ইচ্ছা রহিল, ইতিমধ্যে যদি কেহ কিছু সন্ধান লইয়া থাকেন তাহা প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

## আরো কয়েকটি নূতন প্রশ্ন

(১) শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং ছয় গোস্বামীর অনুগত ত্যাগী বৈষ্ণব সাধুরা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত?

(২) চার সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের ভিতর গৌর ভক্ত বৈষ্ণবদের স্থান আছে কিনা? এবং কোথায়?

(৩) গোড়মণ্ডল বাসী বৈষ্ণব মাত্রেই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব? না গৌরীয়?

(৪) ১৬ নাম ৩২ অক্ষর তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম কি এখন উচ্চ কীর্ত্তন করা চলে ? *

উপরোক্ত চার দফা প্রশ্নের উত্তর আগামী মাসে প্রকাশ হইলে ভাল হয়, ইহাই ত্যাগী গৌরভক্ত বৈষ্ণব বাবাজী মহারাজদের শ্রীচরণে সানুনয় নিবেদন এবং বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ডের মাননীয় মহান্ত মহারজ প্রকাশ্য সভা করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া তাঁহাদের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত সমস্ত মাসিক পত্রিকায় এবং দৈনিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হয়, আর অদূর ভবিষ্যতে কুম্ভমেলায় কোন গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমার মনে হয় যদি গৌর ভক্তেরা গৌরীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এই সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে আগামী কুম্ভের বৈষ্ণব সাধু মহাত্মাদের বৈঠকে চার সম্প্রদায় এর স্থানে এখন হইতে পাঁচ সম্প্রদায় বৈষ্ণব থাকিবে অর্থাৎ রামায়েৎ, নিমায়েৎ, মাধ্বাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী এবং গৌরীয়। ইহা প্রচার দ্বারা জানান দরকার। শ্রীকুণ্ডের মাননীয় মহান্ত মহারাজ যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন উক্ত মেলায় ভারতবর্ষের যেখানে যত গৌরাঙ্গভক্ত ত্যাগী বৈষ্ণব সাধু আছেন তাঁহাদের আহ্বান করুন। যে রকম সময়কাল পড়িয়াছে তাহাতে দেখা যায় এই সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চেষ্টা ও ইচ্ছা অনেকেরই ; কাজেই মহারাজ একটা Reform হওয়া নিতান্ত আবশ্যক আশা করি সুযোগ্য মহান্ত কিছুতেই পশ্চাৎ পদ হইয়া নব উত্থিতসম্প্রদায়গুলিকে সুযোগ দিবেন না এই প্রার্থনা—ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—"পরিব্রাজক বাবাজী।"

---

* এই ৪নং প্রশ্নের উত্তর গত মাসের ভক্তিতে কিছু বাহির হইয়াছে তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পুনরায় প্রশ্নটি ছাপিলাম, পাঠকগণের মতামত জানাইলে বাধিত হইব। ( ভঃ সঃ )

# রেঙ্গুণ প্রবাসীর পানিহাটীর উৎসব দর্শন

জানি না কোন পুণ্যবলে এবার পানিহাটীর উৎসব দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এবারে গৌরাঙ্গদেবের আগমন উৎসব বড়ই সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বহুদেশ বিদেশ হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। শুনিলাম এইরূপ কোন বারেই নাকি হয় না। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীবটবৃক্ষতলে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তারপর বেলা ১০টা ১১টার সময় মহাপ্রভুর একখানি চিত্রপট নৌকাযোগে আনা হয় এবং মহাপ্রভু যে ঘাটে উঠিয়া রাঘব ভবনে গিয়াছিলেন সেই ভগ্ন ঘাটে শালু পাতিয়া দেওয়া হয়। রাস্তা খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা হইয়াছিল। গঙ্গাজল, খই, কড়ি, বাতাসা, পুষ্প, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি মহাপ্রভুর অগ্রে অগ্রে ছড়ান হইয়াছিল। মহাপ্রভু রাঘব ভবনে উপনীত হইলে সেখানে খুব সংকীর্ত্তন করা হয়, তারপর মহাপ্রভুর ভোগ রাগ ও সমাগত ভক্তগণকে চিড়াপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, সেখান হইতে পুনরায় মহাপ্রভুকে বটবৃক্ষতলে আনিয়া স্থাপন করা হয়। বেলা ১॥টার সময় প্রদর্শনী খোলা হয়। স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসিতে পারেন নাই। প্রভুপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কিছুক্ষণের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। তারপর বহু ভক্ত প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন। এবারে আমাদের দাদা বহুকষ্টে বহু দুর্ল্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সাধারণকে দেখাইয়াছেন প্রদর্শনী ক্ষেত্রে যাহা যাহা ছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম, কারণ চক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। বহু বহু প্রাচীন ভক্তগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের কন্থা প্রভৃতি সজ্জিত করা হইয়াছিল। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। বেলা ২॥টায় শ্রীশ্রীবটবৃক্ষতলে শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহাশয়ের

সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ হয় সেই কীর্ত্তনে যেন ভাগিরথী তাথৈ তাথৈ নাচিতে লাগিল। তারপর রাত্রি ৭॥ হইতে ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে গৌরলীলা দেখান হইয়াছিল। প্রদর্শনীক্ষেত্র পরদিবস মেয়েদের জন্ম খোলা ছিল। আমি সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম, বিস্তৃত বিবরণ পরে বাহির হইবে।

বৈষ্ণব দাসানুদাস—শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

# শোক সংবাদ

গত অগ্রহায়ণের ভক্তি ছাপা হইবার পর আমরা সংবাদ পাইলাম বঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালীর গৌরব, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, বৈষ্ণব প্রবর, কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা বৈষ্ণবজগতের অক্ষয়কীর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর উপলক্ষে বিশেষভাবে মহারাজের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। যতই তাঁহার সহিত মিশিতাম ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম যে, এমন নিরভিমানী মধুর চরিত্রের লোকও ভোগবিলাসে প্লাবিত বঙ্গদেশে আছে। যাহাই হউক মহারাজের যে সকল অক্ষয়কীর্ত্তি আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাতে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আমরা স্থানান্তরে পত্রান্তর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কতদিনের কত ঘটনাই যে আমাদের মনে জাগিতেছে তাহা লেখনি মুখে ব্যক্ত করিবার সময় এখন নয়। যদি ইচ্ছাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছা হয় তখন আলোচনা করিব। সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের চরণ কমলে পতিহারা মহারাণী মহোদয়া ও পিতৃশোকাতুর মহারাজ কুমার শ্রীশচন্দ্র এবং তাঁহার অন্যান্য পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের শোকের শান্তি কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীরাধা[illegible]জয়তি।



"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৮শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

# ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

মাঘ ১৩৩৬

## কদম্ব মূলে*

রঞ্জিত চারু বদন-ইন্দু কদম্বতলবিহারী।
প্রাণ-মন বিমোহন চিত-চোর চূড়াধারী॥
অন্তরে দেখ রে ওরূপ মাধুরী॥
প্রেম মধুর মূরতি কিশোর বনফুলমালা শোভন
দিঠি আঁকা বাঁকা রাধা বামে আঁকা জড়িত বিজরি-কিরণ
অন্তরে দেখ রে ওরূপ মাধুরী॥
বিশ্বপ্রিয় দরশন ভাবকুসুম স্ফুরণ ভক্ত-হৃদি বিলাসকারী।
কমনীয় কাম দর্পহারী অন্তরে দেখরে ওরূপ মাধুরী॥

দীন—শ্রীজগন্নাথ দাস।

* বিগত অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে সাঁইথিয়া সরস্বতী সেবাসমিতি হইতে নগর সংকীর্ত্তনে এই গীতটী কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন রচয়িতা একজন ভক্ত কবি, আমরা ইহাঁর রচিত বহু পদ পাইয়াছি। ক্রমে ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। ইহাঁর রচিত "অঞ্জলি" ও "বংশীধ্বনি" সুন্দর পুস্তক। (ভঃ সঃ)

# আহার তত্ত্ব

( শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত )

প্রথমতঃ আহার তত্ত্বের বিচার করিতে হইলে—

১। আহার্য্য গ্রহণ—অর্থাৎ কি উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীরা আহার্য্য গ্রহণ করে তাহা দেখিতে হইবে। মাংসাশী প্রাণী দুর্ব্বলকে পীড়া দিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে, তাই তাহাদের শিক্ষা-উপযোগী থাবা ও বিশেষ দন্ত আছে। শস্যাশী প্রাণী পর্য্যটন করিয়া শ্যামল ক্ষেত্রে ইচ্ছামত আহার্য্য গ্রহণ করে, তাই তাহাদের পর্য্যটনোপযোগী ক্ষুর আছে, আর ফলভুক প্রাণীর ফল তুলিতে ও তাহার খোসা ছাড়াইতে হস্তের ন্যায় বিশেষ অঙ্গের প্রয়োজন, তাই মানব জাতির হস্ত ও অঙ্গুলি বর্ত্তমান আছে।

২। চর্ব্বণ—যাহার যেরূপ নৈসর্গিক আহার্য্য তাহার অনুকূল চর্ব্বণ করিবার শক্তি ও অবয়ব আছে। শস্যভুক প্রাণীর চোয়ালের গতি অতি জটিল। ইহারা ইচ্ছামত চোয়াল ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। গরু প্রভৃতির চর্ব্বণ ও রোমন্থন দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। মাংসভুক জীব ইচ্ছামত চোয়াল ফিরাইতে পারে না, কেবল মাত্র এক দিকে নাড়িতে পারে। থাবা ও বিশেষ দন্ত দ্বারা মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কলের দাঁতের মত ধার দিয়া হাত হইতে মাংস ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে। ফলভুক মানুষ চোয়াল নাড়িয়া চর্ব্বণ করিয়া থাকে।

৩। সমস্ত মাংসভুক প্রাণীরা লেহন করিয়া জলপান করে; কিন্তু মনুষ্য শস্যভুকের মত শোষণ করিয়া জলপান করে।

৪। আহার্য্য চর্ব্বিত হইলে খাদ্যের শ্বেতসার লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া বিশেষ ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ফলভুক ও শস্যভুকের ঐ ক্রিয়া হইয়া

থাকে কিন্তু মাংসভুক প্রাণীর মুখলালা শ্বেতসার পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে কোন ক্রিয়াই হয় না। এই জন্যই বোধহয় মানুষের স্বাভাবিক আহার ফলমূল।

৫। মাংসভুক জন্তুর যকৃতের গঠন পূর্ণ ও জটিল, অন্ত্রনালী অত্যধিক দীর্ঘ। তাহাদের পাকস্থলীতে গ্যাষ্টিক যুস ( Gastric juice ) অত্যধিক ও মাংস পরিপাকোপযোগী ও মাংসের বিষাক্ত পদার্থ ধ্বংসকারী। কিন্তু মানুষের গ্যাষ্টিক যুসের ঐ সকল ক্ষমতা নাই। তাহা অন্ন ও ফলমূল শাক সব্জি পরিপাকের উপযোগী। মানুষের যকৃত দুর্ব্বল ও সহজে পীড়িত হয়। তাহাদের মাংস পরিপাকের ক্ষমতা নাই। কোলনের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, মানবের স্বাভাবিক আহার্য্য মাংস নহে।

৬। প্রাণীর দেহের জৈবিক কার্য্য প্রণালী ঠিক এঞ্জিনের ন্যায়, কলে যেমন কয়লা দ্বারা প্রথমে উত্তাপ, তাহার পর বাষ্প ও অবশেষে বাষ্প দ্বারা নানা কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণীদেহে পচন ও অন্যান্য জৈবিক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণীগণের খাদ্য সমূহের অন্তর্নিহিত সঞ্চিত ক্রিয়া শক্তি সকল বিকশিত হইয়া শরীরের উত্তাপ ও জীবনীশক্তি প্রকাশ পায় এবং ধুমাদির ন্যায় নানা বিষ বিষাক্ত দ্রব্য মল মূত্র প্রশ্বাসিত বায়ু ও স্বেদ প্রভৃতি রূপে নির্গত হয়। উদ্ভিদ সকল প্রাকৃতিক শক্তি ও আলোর সাহায্যে জল বায়ু ও পৃথিবীর রূঢ় পদার্থের সন্নিবেশ, শ্বেতসার মেদ, শর্করা অণ্ডলাল প্রভৃতি দ্বারা দেহ গঠন করে, সুতরাং তাহাদের অন্তর্নিহিত ঐ সকল পদার্থ দ্বারা শক্তি সঞ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণীজীবনের কার্য্য প্রণালী বিভিন্ন। তাহারা প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে প্রাকৃতিক পদার্থ লইয়া কোন কার্য্যকরণক্ষম শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি পচন ও সমীকরণ দ্বারা নানা প্রকার জৈবিক

শক্তি প্রাপ্ত হয়। এ জন্য মাংস ভক্ষণে পাকাশয়ের মধ্যে নানাপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্যের উৎপাদন হয়। মানুষের পাচক রস তাহা ধ্বংস করিতে পারে না; সুতরাং নানা প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়।

৭। শরীরের রক্তে একপ্রকার আণবিক পদার্থ আছে। কোন প্রকার ব্যাধিবীজ শরীরে প্রবেশ করিলে ঐ আণবিক পদার্থ তাহা অনায়াসে শীঘ্র নষ্ট করিয়া দেয়। এই শক্তি মানব যকৃতের শ্বেতসারের উপরে বেশী নির্ভর করে। মাংসের রস ও আমিষ ভোজনজাত বিষাক্ত দ্রব্য সকল নষ্ট করিবার আণবিক পদার্থ মানব রক্তে অতি কম, সুতরাং মাংস আহার করিলে ঐ শক্তি হ্রাস হয়; সুতরাং মাংসাহারে বিশেষ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

খাদ্য দ্রব্যের উপাদান তত্ত্ব ( Chemical Composition ) বিচার করিতে গেলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, প্রধান যে পাঁচটী দ্রব্য আমাদের জীবন ধারণ ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন, নিরামিষ খাদ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে নিরামিষ আহারই আমাদের শরীর রক্ষা, বল, পুষ্টিসাধন, দীর্ঘ জীবন ও শ্রমসহিষ্ণুতার প্রধান সহায়। এতদ্ব্যতীত আহারের বিশেষ প্রয়োজন—ধর্ম্মসাধন, মানসিক উৎকর্ষ লাভ ও আত্মোন্নতি।

একমাত্র সত্ত্বিক আহারই মানবের নৈতিক উন্নতির অনুকূল। সাত্ত্বিক আহারে কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি রিপুর অসঙ্গত উদ্রেকের সম্ভাবনা দূর হয়। উগ্র ও উদ্ধত স্বভাব; শান্ত কোমল ও সর্ব্বজনপ্রিয় হয়, মন চির প্রফুল্ল হয়, মনের আবিলতা ও অবসাদ নষ্ট হয়। সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ও অনাবিল প্রেম ও প্রীতি জন্মে। এই সাত্ত্বিক আহারই নিরামিষাহার।

বিভিন্ন শাস্ত্রের মতে আমিষ আহার অনেক অনিষ্টের মূল, অনেক রোগের কারণ। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অনেক রোগ আমিষাহারের অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। আমিষ আহারে আমাদের শরীরে Uric Acid নামক এক প্রকার পদার্থ এত অধিক সঞ্চিত হয় যে, Dr, Haig এর মতে অধিকাংশ রোগই তাহা হইতে উৎপন্ন হয়।

২। মূত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়ার প্রধান কারণই অপরিমিত মাংসাহার।

৩। ক্যান্সার নামক পীড়া মাংসাহারের ফল।

৪। টেপওয়ার্ম্ম নামক পীড়া মাংসাহারেই হইয়া থাকে।

৫। মৃগীরোগের কারণই মাংসাহার। এবং একেবারে মাংসাহার বর্জ্জনই ইহা হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায়।

৬। টাইফয়েড্ জ্বর মাংসাহারের একটী প্রধান কারণ। ৭। যক্ষ্মা রোগ মাংসাহারে জন্মে ও বৃদ্ধি হয়।

৮। সকল প্রকার কাস রোগ মাংসাহারেই বৃদ্ধি পায়।

৯। মাংসাহারে অকালে দন্ত শিথিল হয় ও পড়িয়া যায়।

১০। রিউম্যাটিজম, গাউট্, লাম্বেগো, সায়েটিকা প্রভৃতি পীড়া মাংস আহারের ফল।

১১। মাংসাহারে ব্রাইটস্ ডিজিজ ( Bright's disesease ) বৃদ্ধি হয়।

১২। অম্ল পিত্তাধিকারের প্রায় সকল রোগই মাংস ভোজন হইতে উৎপন্ন।

১৩। বসন্ত, স্কার্লেট্ ফিভার, ডিপ্থিরিয়া, সিফিলিস, গণোরিয়া, বয়স

ব্রণ, খোস, পাচড়া, নানা প্রকার ক্ষত প্রভৃতি কতকগুলি পীড়ায় মাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ।

১৪। অনেকের মতে মাংসাহারে ম্যালেরিয়া জ্বর বৃদ্ধি পায়।

১৫। শরীরের যে স্থান হইতে যে কোনরূপ রক্ত নিঃস্রাব হউক না কেন মাংসাহারে তাহা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

১৬। দুর্ব্বল, অজীর্ণরোগগ্রস্ত, আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি ও যাহারা নিষ্কর্ম্মা তাহাদের মাংস আহার করা অত্যন্ত অন্যায় ও পীড়াদায়ক।

অনেকের বিশ্বাস নিরামিষ আহারে শরীরের শক্তি কর্ম্ম-ক্ষমতা ও শ্রম-সহিষ্ণুতার হ্রাস হয়। কিন্তু এ সংস্কার অমূলক।

(ক) জাপানের অধিকাংশ অধিবাসীই নিরামিষাশী। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে উন্নত জাতি।

(খ) সুয়েজখাল নির্ম্মাতা ডি লেসেপস বলেন যে, আরব ও হিন্দুস্থানবাসী শ্রমজীবী না থাকিলে এত বৃহৎ ব্যাপার কিছুতেই সম্পন্ন হইত না। তিনি আমিষাশী ইয়োরোপীয় শ্রমজীবীদের অলসতা ও অকর্ম্মণ্যতার অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

(গ) পদব্রজে ও বাইসাইকেল প্রভৃতিতে গমনে নিরামিষাশীদের শ্রম-সহিষ্ণুতা ও শক্তির প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকের সংস্কার—নিরামিষ আহারে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্মে। নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, বেকন ও এডিসনের মস্তিষ্ক কি দুর্ব্বল?

এই প্রবন্ধ দ্বারা মোটামুটি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে নিরামিষ আহারই আমাদের শরীর রক্ষা, বলপুষ্টিসাধন, দীর্ঘজীবন ও শ্রম-সহিষ্ণুতায় প্রধান সহায়।

( স্বাস্থ্যসমাচার )

# সমাজতন্ত্রে রবীন্দ্রনাথ

চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীন দেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে। দেশ যথার্থ ভাবে আত্মরক্ষা ক'রে এসেছে সমাজের সম্মিলিত শক্তিতে। সমাজই বিদ্যার ব্যবস্থা করেছে, তৃষিতকে জল দিয়েছে, ক্ষুধিতকে অন্ন, পূজার্থীকে মন্দির, অপরাধীকে দণ্ড, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা; গ্রামে গ্রামে দেশের চরিত্রকে রক্ষিত, এবং তার শ্রীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের উপর দিয়ে রাজ্য সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায় রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত ফেরাফেরি চল্‌ল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন কাড়াকাড়ি করতে লাগলো—লুটপাট অত্যাচারও কম হোলো না। কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে; যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে, তার অন্ন বস্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র, মাথার উপর যেমন মুকুট থাকে তেমনি। রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষ ভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্ম্মস্থান, সমাজ-প্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। রাষ্ট্র-প্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস, রোম এমনি করেই মারা গিয়াছে। কিন্তু চীন, ভারত রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই সুদীর্ঘ কাল আত্মরক্ষা করেছে—তার কারণ সর্ব্বব্যাপী সমাজে তার আত্মা প্রসারিত।

পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করল। যখন থেকে এই অধিকার পাকা হ'য়ে উঠল, তখন থেকে গ্রামে গ্রামে দীঘিতে গেল জল শুকিয়ে, মন্দিরে, শূন্য অতিথিশালায় উঠল অশথ গাছ, জাল জালিয়াতি মিথ্যা মোকদ্দমাকে বাধা দেবার কিছু রইল না, রোগে তাপে দৈন্যে অজ্ঞানে অধর্ম্মে সমস্ত দেশ রসাতলে তলিয়ে গেল।

(প্রবাসী)

# শাক সব্জীর শক্তি ও গুণ

যে সকল শাক-সব্জী আমরা কাঁচা ও তাজা অবস্থায় আহার করি তাহার পুষ্টি প্রদানের শক্তি বেশী নাই কিন্তু তাহার নিজস্ব কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। ইহা সকলে জানে না, বুঝেও না। এখন অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, এই সকল তাজা শাক সব্জীতে নব আবিষ্কৃত খাদ্যপ্রাণ, ভিটামিন, প্রচুর পরিমাণে আছে। সেই জন্য প্রত্যেকবার আহারের সময় কতক পরিমাণ রন্ধন না করা খাদ্য যথা লেটস, বাঁধা কপি, শশা অথবা অন্যান্য শাকসব্জী আহার করা উচিত। এই সকল কাঁচা শাকসব্জী হইতে আমরা পটাশ বা ক্ষার, চূণ এবং শরীরের পক্ষে বহু প্রয়োজনীয় অন্যান্য লবণ পাইয়া থাকি।

শাক সব্জীর বিশেষতঃ যে সব্জী ডাটার ন্যায় তাহার আর এক গুণ এই যে, ইহা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় আঁশযুক্ত ও অমসৃণ পদার্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। যাহারা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করে তাহাদের প্রচুর পরিমাণে কাঁচা শাক-সব্জী ও ফল সেবন করা উচিত। কেহ কেহ পেটের পীড়ার ভয়ে উহা আহার করে না। যাহাদের এরূপ ভয় হয়, তাহারা পটাশ বা কণ্ডিস ফুড কিম্বা পারমাঙ্গানেট অফ পটাশের শাক সব্জী ডুবাইয়া লইয়া তাহার পরে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া জলে উহা ধৌত করিয়া কাঁচা সেবন করিতে পারে।

যে শাক-সব্জী কাঁচা আহার করিতে ইচ্ছা তাহা বাছিয়া লইবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যাহাতে পচিবার লক্ষণ হইয়াছে তাহা কখনই সেবন করা উচিত নহে। কেবল যাহা তাজা তাঁহাই গ্রহণ করা উচিত।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে গোল আলুই প্রধান, সেজন্য ইহার কথা বিশেষ করিয়া বলা উচিত। সকল উদ্ভিজ্জের মধ্যে ইহা সহজেই পাওয়া যায় এবং গৃহে অনেক দিন রাখিয়া দেওয়া যায়। ঠিক মত করিয়া তৈয়ারী করিলে ইহা সহজেই হজম হয় এবং ইহাতে শ্বেতসার অধিক থাকায় ইহার পুষ্টিকারিতাও অধিক। তাহা ছাড়া চর্ম্মরোগ দূর করার শক্তিও ইহার আছে।

আলুতে ছানা জাতীয় পদার্থ নাই, কিন্তু হিন্ডেড নামক ডেনমার্কের বৈজ্ঞানিক বলেন যে, অধিক শারীরিক পরিশ্রমেও ইহাতে যে পুষ্টিপ্রদায়ী খাদ্য আছে তাহা ক্ষয় পূরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি আলুর গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন লোককে কেবল আলু ও মাখন জাতীয় পদার্থ আহার করাইয়া কয়েক মাস রাখিয়াছিলেন, এই কয় মাস ধরিয়া তাহাদিগকে প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষা ও অনুসন্ধানে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আলুকে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার খাদ্য তৈয়ারী করা যায় অথবা আলু মিশ্রণে যে খাদ্য হইতে পারে তাহার সহিত সবুজ শাক সব্জী, মাখন জাতীয় পদার্থ, রুটি এবং ছানা জাতীয় পদার্থ, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি মিলাইয়া পূর্ণ ও পুষ্টিকর খাদ্য হইতে পারে।

যাহাদের রক্তে ইউরিক এসিড আছে তাহাদিগকে বার বার আহার করাইয়াই রক্ত দোষ শূন্য করা হয়। এই চিকিৎসা সর্ব্বজনবিদিত। রোগীকে আলু, মাখন ও সবুজ শাক সব্জী কিছু কাল ধরিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। রোগী যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলু গ্রহণ করে তাহার জন্য তাহাকে উৎসাহিত করিতে হয়। আলু সেবনে ইউরিক্ এসিড দ্রবীভূত হয় এবং মূত্রাশয় দ্বারা ইহা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়।

আলু ভাল করিয়া রন্ধন করিলে সুস্বাদু হয়, অধিকক্ষণ অগ্নির নিকটে

রাখিয়া সেকিয়া অথবা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আলু তৈল বা ঘৃতে ভাজিলে বা রন্ধন করিলে হজম করা শক্ত। আলু রন্ধন করিলে উহা নরম হইয়া যায় সে জন্য উহা বস্ত্র দিয়া ঢাকা দিতে হয়।

আলুর পরই উপকারী উদ্ভিদ বিলাতী বেগুণ। অনেকে বলেন যে, ইহা সেবনে ক্যান্সার বা কর্কট রোগ হয়. ইহা অত্যন্ত ভুল। জনসাধারণ মাংস কম ভোজন করিয়া অধিক বিলাতী বেগুণ সেবন করিলে সম্ভবতঃ এদেশে কর্কট রোগে মৃত্যুর হার কম হইত। যাহারা অধিক পরিমাণে ছানা জাতীয় পদার্থ বা মাংস সেবন করে তাহাদের মধ্যেই প্রধানতঃ ক্যান্সার বা কর্কট রোগ দেখা যায়। যতই মাংস সেবন বাড়িতেছে ততই ক্যান্সার বা কর্কটের প্রাবল্য বাড়িতেছে। যে সকল জন্তুর মাংস সেবন করা হয় তাহাদের মধ্যেও আবার রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিলাতী বেগুণে উদ্ভিজ্জ মৌলিক পদার্থ এবং জীবন রক্ষার প্রধান দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে ইহা অতি উপকারী। ( পঞ্চায়েৎ )

# শোক-সংবাদ

শ্রীবৃন্দাবন ধামের মাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ গরাণহাটী কীর্ত্তন গায়ক পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী মহাশয় গত ১৯শে পৌষ ৯৮ বৎসর বয়সে নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। কেবল যে কীর্ত্তন গায়ক বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল তাহা নহে, সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ষট্‌সন্দর্ভাদি অধ্যয়ন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি একটী টোল স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হাতে গড়া কীর্ত্তন গায়ক ও মৃদঙ্গ বাদক অনেকেই এখন জন সমাজে সুপরিচিত। বঙ্গদেশে বারেন্দ্র কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইনি বিরক্ত

বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছেন। ইহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। শ্রীবৃন্দাবনে এবং অন্যান্য স্থানে সকলে ইহাঁকে "পণ্ডিত বাবাজী" বলিয়াই জানিত। শেষ বয়সে ইনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীকাঙ্গালী মহাপ্রভুর বাটীতে অবস্থান করিতেন।

# বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

**মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী।**—কাশিম বাজারের স্বনামধন্য বৈষ্ণব মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে বড়লাট বাহাদুর "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পত্রান্তরে প্রকাশ, বড়লাট বাহাদুর বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরের মারফতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে ঐ উপাধি দান করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার লাট বাহাদুর নবীন মহারাজকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র যেমন মাতামহী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মহান্ হৃদয় লাভ করিয়া আপনার ব্যবহার গুণে শুধু কাশিম বাজারের নহে—বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর হৃদয়ের অধিরাজ হইয়াছিলেন, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তেমন পিতৃ হৃদয়ের ঔদার্য্য দ্বারা যশঃ লাভ করিবেন এ আশা আমাদের অবশ্যই হয়। শ্রীভগবান নবীন মহারাজের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করুন।

**শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে নূতন সেবাইত।**—পত্রান্তরে প্রকাশ, বিগত উত্থান দ্বাদশী হইতে শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস বাবাজী মহাশয়কে শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাইতপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কুণ্ডদ্বয় সংস্কারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ভক্তিতে এক আবেদন পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে,

অতঃপর সাহায্য দাতাগণ যে সাহায্য পাঠাইবেন তাহা এই নূতন সেবাইতের নামে পাঠাইবেন।

**প্রয়াগে কুম্ভমেলা**—এই মেলা উপলক্ষে নিখিল ভারত শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে আয়োজন করিয়াছেন তাহার সংবাদ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাত কারণ আমরা নিম্নে দিলাম।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এবারে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় অনেক নকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখা দিয়াছেন, সেজন্য সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যদি আপনি আসল প্রাচীন নিখিল ভারত শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গলাভ করিতে এবং কলি পাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুমোদিত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র লাভ করিয়া পারমার্থিক উন্নতি করিতে চান তাহা হইলে এই সুযোগ ছাড়িবেন না। উক্ত সম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিত আচার্য্য গোস্বামী মহান্ত এবং বনবাসী বৈষ্ণব সাধুগণ মেলার এলাকার মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বদাই সর্ব্বসাধারণকে শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ শিক্ষা দীক্ষা ও শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র দিতেছেন এবং অহোরাত্র (মকর সংক্রান্তি হইতে মাঘী সংক্রান্তি) এক মাস কাল শ্রীশ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন; এরূপ সৎসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না। **একমাস অহোরাত্র অবিশ্রান্ত শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন** হইবে ভারতবাসী মাত্রেই যোগদান করিয়া সর্ব্বরকমে উৎসাহিত করুন—ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন। মেলার ঠিকানা—**মহান্ত শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী, চার সম্প্রদায় বৈষ্ণব খালসা গঙ্গাপটী, কুম্ভমেলা এলাহাবাদ।** *

* এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় পরিব্রাজক বাবাজী গৌরগোপীদাস মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ, পরিশ্রম এবং চেষ্টায় প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উন্নতী কল্পে উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি বাঙ্গলা, হিন্দি এবং ইংরাজীতে ছাপাইয়া ভারতের সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ের সর্ব্বজাতীয় হিন্দুর মধ্যে বিলি

**কলিকাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর** সভাপতি—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ঢাকা সহরে কয়েকজন উদ্যোগী ভক্তের চেষ্টায় একটী বৈষ্ণব সম্মিলনী স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক অধিবেশনের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে ফাল্গুন অধিবেশনের দিনস্থির হইয়াছে। উক্ত সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ ঐ উপলক্ষে একটী বৈষ্ণব-প্রদর্শনী করিবার সঙ্কল্প করিয়া যে আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম। এ বিষয়ে যিনি যতটুকু সাহায্য করিতে পারেন করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

---

হইয়া প্রচার কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছে। অনেকেই বোধহয় শুনিয়াছেন বা জানেন আজকাল নানা রকম ভুঁইফোঁড় গৌড়ীয় সম্প্রদায় বাহির হইয়া সাধারণ ধর্ম্ম পিপাসু সুধীজনকে প্রতারিত করিতেছেন কারণ উক্ত পরিব্রাজক মহাশয় প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ তের হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া অনেকের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, কেবল বাঙ্গলা, উৎকল এবং কতক বিহারদেশবাসী ও অন্যান্য দেশের ২।৪ জন ভদ্রলোক ছাড়া ঐ সম্বন্ধে কোন খবরই রাখেন না। কাজেই তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন সারা ভারতবর্ষে প্রচার কার্য্যের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। উক্ত বিজ্ঞাপনটি নানা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতের ১৬।১৭ খানা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরভক্ত পাঠকগণের নিকট তাঁর সবিনয় প্রার্থনা সকলেই তাঁর এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন। তিনি এই মেলায় শ্রীবৃন্দাবন নবদ্বীপ ও পুরিধাম হইতে প্রায় ২৫০।৩০০ মূর্ত্তি বিরক্ত বনবাসী ভজনানন্দী বৈষ্ণব এবং ভক্ত আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা এক মাস অহোরাত্র হরিনাম মহামন্ত্র নামকীর্ত্তন করাইতেছেন, তাহাতে দর্শক বৃন্দেরা প্রচুর প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন। কুম্ভমেলার অন্তে প্রচার কার্য্যের জন্য পুনরায় ভারতভ্রমণ করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা তাঁহাকে যিনি যে প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন করিবেন তাহা হইলে সহজেই উদ্দেশ্য

# শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ও বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী, ঢাকা

১৭ই ১৮ই ও ১৯শে ফাল্গুন ১৩৩৬, ইং ১লা, ২রা ও ৩রা মার্চ্চ ১৯৩০।

সহৃদয় ভক্তবৃন্দ—

আপনাদের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সহায়তায় সম্মিলনী এ যাবত বিভিন্ন স্থানে সভার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানের কথা ও গানে ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিবার জন্য যত্ন করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনের সময় নিকটবর্ত্তী, এই উপলক্ষে বিপুলভাবে বৈষ্ণব প্রদর্শনী করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূপ প্রদর্শনী এই প্রদেশে নূতন। বৈষ্ণবের দর্শনীয় ও জ্ঞাতব্য বহুবিধ সামগ্রী এখনও অনাদরে রহিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থের বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পাইলে সেই সকল গ্রন্থও প্রদর্শনীতে দর্শনের জন্য রাখা হইবে। ইহা ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস, ভূগোল, নক্সা, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য, নাটক, চিত্র, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীহস্তাক্ষর, বঙ্গের আদি কবি

---

সাধন হইবে। এই বিষয় কোন পত্রাদি বা অর্থ সাহায্য পাঠাইতে হইলে C/o Editor "Bhakti" পাঠাইবেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে আরো কিছু নিবেদন আছে। আপনারা সকলেই বোধহয় জানেন যে, উক্ত সম্প্রদায়ের কোন বিষয় সম্পত্তি জায়গীর তেজারতী বা বৃত্তি বন্দোবস্ত নাই অথচ এই এক মাস প্রয়াগে ২৫০।৩০০ মূর্ত্তি ভক্ত এবং বৈষ্ণব সাধুদের লইয়া কল্পবাস করিতে নানা রকমে যাতায়াত ট্রেণভাড়া, তাঁবু ভাড়া ইত্যাদি নানা রকমে প্রায় পাচ হাজার টাকা ব্যয় হইবে ইহা কেবল আকাশবৃত্তির উপর এবং গৌর ভক্তবৃন্দের কৃপার উপর নির্ভর। যিনি যাহা সাহায্য করিতে পারেন ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেই তিনি পাইবেন।

( শ্রীভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ। )

ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীহস্ত লিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের বস্ত্র ও সিদ্ধভক্তগণের ব্যবহৃত দ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। শ্রীপাট পাণিহাটীর বৈষ্ণব ঐতিহাসিকদ্রব্যাদি সংগ্রাহক সুলেখক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়কে প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

কৃপালু ভক্তবৃন্দের নিকট বিনীত প্রার্থনা বৈষ্ণব পুথি, শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ বা তীর্থক্ষেত্রের ফটো ও চিত্র, মুদ্রিত গ্রন্থ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-চিত্র, ভক্তগণের ফটো ও হস্তাক্ষর, বংশাবলী, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি, ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করে এইরূপ যে কোন সামগ্রী আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। প্রদর্শনীর অন্তে প্রদর্শিত সামগ্রী বিশেষ যত্ন সহকারে ফেরৎ দেওয়া হইবে। বিভিন্ন শ্রীহরি সভার মাননীয় সম্পাদক মহোদয় গণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা এই বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবেন এবং কৃপা করিয়া অবিলম্বে শ্রীহরিসভার সম্পাদকের নাম ঠিকানা প্রভৃতি সম্মিলনীকার্য্যালয় ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্মিলনীর সাফল্য সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সর্ব্বপ্রকার সহায়তার উপরেই নির্ভর করিতেছে। অতএব একান্ত প্রার্থনা ভক্তবৃন্দ যথাসাধ্য অর্থ, সামর্থ্য ও প্রীতি-দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। (সেবকবৃন্দ।)

**শ্রীধাম নবদ্বীপে উৎসব।** আগামী ১৮ই ফাল্গুন ইং ২রা মার্চ্চ রবিবার শুক্লা-দ্বিতীয়া **শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণদাস দেব**—(৺পুরীধামের **বড়বাবাজী**) মহোদয়ের চতুর্ব্বিংশতি সাম্বৎসরিক স্মরণমহোৎসব তিথি। ঐ তিথির আরাধনা উপলক্ষে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইবে।

৮ই ফাল্গুন ইং ২০শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অষ্টমী, সায়াহ্নে শ্রীশ্রীমহোৎসবের শুভ অধিবাস।

৯ই " ইং ২১শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নবমী হইতে ১৭ই ফাল্গুন ইং ১লা মার্চ্চ শনিবার প্রতিপদ পর্য্যন্ত নয়দিবস ব্যাপী অহোরাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন।

১৬ই " ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার অমাবস্যা শ্রীশ্রীমৎ **রাধারমণ দেবের মহাভিষেক।**

১৮ই " ইং ২রা মার্চ্চ রবিবার দ্বিতীয়া, প্রাতে **শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ দেবের সূচক** সঙ্কীর্ত্তনান্তে শ্রীনগরসঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ আরাধনা এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা।

১৯শে " ইং ৩রা মার্চ্চ সোমবার তৃতীয়া, অপরাহ্নে শ্রীগ্রন্থ পাঠ পরে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন।

২০শে " ইং ৪ঠা মার্চ্চ মঙ্গলবার চতুর্থী, শ্রীশ্রীরাধারমণ দেবের গুরুদেব **শ্রীশ্রীমৎ গৌরীহরিদাস বাবাজী মহান্ত** মহাশয়ের স্মরণ-মহোৎসব তিথি উপলক্ষে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ-আরাধনা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদি সেবা, শ্রী**নগর-সংকীর্ত্তনান্তে** মহোৎসব সমাপ্তি।

---

**ত্রুটীস্বীকার**—নানা প্রকার দৈব দুর্ঘটনা ও ছাপাখানার গোলমালে বর্ত্তমান মাসের ভক্তি এক ফর্ম্মা কম করিতে হইল। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, তুমি হৃদয়ে থাকিয়া যেমন করাইবে, আমি তেমনই করিব। তুমি আমাকে অসৎভাব হইতে সৎভাবে প্রেরণ কর, অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মে মতি দাও ; আমি তোমার কৃপা-শক্তি পাইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া শান্তি লাভ করি।

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তং ॥

অর্থাৎ যাজ্ঞিকগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া জানেন, বৈষ্ণবগণ যাঁহাকে বাসুদেবরূপেচিন্তা করেন এবং বেদান্ত-তত্ত্বজ্ঞেরা যাঁহাকে বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন, আমি সেই সর্ব্বজনসেব্য শ্রীহরিকে

করি। রসিকচাঁদ! এইরূপ ভাবে যাঁহার যেমন সময় ও সামর্থ্য, তিনি তদনুসারে প্রার্থনার ভাবে ভগবদ্গুণানুবাদপূর্ণ শ্লোকাদি পাঠ করিয়া, অথবা যে কোন প্রকারেই হউক প্রাণের ভাব শ্রীভগবানকে জানাইয়া প্রফুল্ল চিত্তে শয্যা ত্যাগ করিবে। এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে মনের সকল অসৎভাব বিদূরিত হইবে, সন্দেহ নাই।

রসিক।—গুরুদেব! আপনার উপদেশ অতি মধুর, কিন্তু আমার মন তর্কনিষ্ঠ, তাই মনে পুনঃ পুনঃ নানা প্রশ্ন উঠে। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার নিকট নিবেদন করি।

প্রেমা।—বৎস! তোমার সঙ্কুচিত হইবার কোনই কারণ নাই। তুমি নির্ভয়ে তোমার সন্দেহ ব্যক্ত কর; আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিতে যত্ন করিব।

রসিক।—গুরুদেব! এই যে আপনি প্রার্থনা-শ্লোকগুলি বলিলেন, প্রাণে ভাব না আসিলে কেবল অপরের রচিত শ্লোক মুখস্থ করিয়া বলিলে কি হইবে?

প্রেমা।—বৎস! তোমার প্রশ্ন সমীচীনই হইয়াছে। এরূপ প্রশ্ন অনেকেরই প্রাণে উঠে। যাহা হউক, তুমি বোধহয় মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস কর;

প্রত্যেক বর্ণের এক একটি পৃথক পৃথক্ মূর্ত্তি আছে। তাহার পর আবার সিদ্ধ আর্য্য ঋষিগণের রচিত বাক্যাবলি যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। তোমাকে সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, আর্য্য ঋষিগণের আচরিত পথে চলিলেই প্রাণে ভাবের উদয় হয়। তবে যাহার হৃদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে নির্ম্মল আছে, তাহার অতি শীঘ্র শীঘ্র ফল হয়, আর যাহার তাহা নাই, তাহারও অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমিক ফললাভ হয়। শক্তিসম্পন্ন পুরুষের বাক্য কখনও বৃথা হইবার নয়।

রসিক।—গুরুদেব! বুঝিলাম যে, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন,আমরা সেই পথে চলিলেই আনন্দ পাইতে পারিব। কিন্তু গুরুদেব! প্রভাতে উঠিয়া যে এই সকল করিতে হয়, কৈ, ইহা ত জানিতাম না? আর কাহাকে করিতেও ত দেখি নাই; তাই নিজেও করি না। এ যে অতি সুন্দর ব্যবস্থা; আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে। দেব! প্রাচীন আর্য্য-সন্তানগণ সকলেই কি এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পরে সংসার করিতেন?

প্রেমা।—হ্যাঁ বাবা! ইহা তোমাকে অতি সংক্ষেপেই বলিলাম। আর্য্য ঋষিগণ যাহা করিতেন, সে সকল অতি বিস্তৃত। আর্য্যঋষিগণ এই সকল সদনুষ্ঠানের বলেই সংসার করিয়াও নিরাসক্ত ছিলেন; বহু পরিজন পরিবৃত সংসারেও তাঁহাদের মন চঞ্চল হইত না। আর আজকাল হয় ত নিঃসন্তান, স্ত্রীহীন, সম্পদহীন অর্থাৎ কোন কিছুই নাই, তবুও এমন কল্পনার দাস, দুরাশার বশীভূত যে, দিন দিন যে আয়ু ক্ষীণ হইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখে না। বৎস! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, দশ দিন নির্ব্বিক্ষেপে অতি শুদ্ধাচারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, একদিনের সরল প্রাণের প্রার্থনায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফল লাভ হয়। প্রার্থনায় পাপ দূর হয়, প্রার্থনার বলে মহাপাপী দুরাচারীও শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া আপন ইচ্ছানুরূপ মূর্ত্তি ধরাইয়া, যোগিগণের বহু জন্মের ধ্যানেও

যাহার দর্শন সুলভ হয় না, তাঁহার দর্শন লাভে কৃতার্থ হয়। বিশেষতঃ কলির জীব দুর্ব্বল,যাগ যজ্ঞ ব্রত তপস্যার শক্তি নাই, ইহাদের সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ভিন্ন আর উদ্ধারের উপায় কি আছে ?

রসিক।—আচ্ছা গুরুদেব! নিদ্রাভঙ্গের পর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থানের পর কি করা কর্ত্তব্য ?

প্রেমা।—বৎস! এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া গাত্রোত্থান করার পর যথাবিধি মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা আছে। মল-মূত্রের বেগ কখনও রোধ করিবে না, উহাতে নানা প্রকার কঠিন রোগের উৎপত্তি হয়।

রসিক।—প্রভো! মল-মূত্র ত্যাগেরও কি কোনরূপ বিধি আছে ?

প্রেমা।—বৎস! ঋষিগণ আমাদিগের যত কিছু কার্য্য, সমস্তই বিধি অনুযায়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাতঃকালে নৈঋত কোণে যাইয়া মল ত্যাগ করিতে হয়। নিজের ছায়ায় এবং গো, সূর্য্য, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণ স্থানে, জনসমাজে, পথমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থজলে, জলমধ্যে জলাশয়ের তীরে, শ্মশানে মল-মূত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। দিবসে উত্তরমুখ ও রাত্রিতে দক্ষিণ-মুখ হইয়া, বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া নিঃশব্দে মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণগণ ঐ সময় দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিবে, আর ক্ষত্রিয়াদি যজ্ঞসূত্রধারিগণ কর্ণে অথবা মালার ন্যায় পৃষ্ঠদেশে লম্বমান ভাবে রাখিবে। পাদুকা পরিধান করিয়া কিংবা জলপাত্র হস্তে লইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে না। বৎস! এই যে নিয়ম বলা হইল, বিশেষ বিপদ্-কালে এবং বিদেশে গমনাগমন কালে বা রুগ্নাবস্থায় যাহাতে কষ্ট হয়, সেইরূপ না করিয়া, সুবিধা-মত ভাবে মল-মূত্র ত্যাগ করিলে নিয়ম ভঙ্গ জনিত পাপ হয় না। এটী তোমাকে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া রাখিলাম গ্রন্থাদিতে এবিষয় বিস্তৃতরূপেই আছে।

রসিক।—গুরুদেব! যে সকল নিয়ম আপনি বলিলেন, এ সকল কি পালন করা সকলের পক্ষেই সুবিধা হইবে?

প্রেমা।—বৎস! তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। তুমি সহরবাসী লোকের সম্বন্ধে বলিতেছ। এই যে সকল নিয়ম বলা হইল ইহার সকলগুলি প্রতিপালন করিতে হইলে গৃহে থাকা চলে না; ইহাই ত তুমি বলিবে? তাই তোমাকে বলিয়া রাখি, গৃহী ইহার মধ্যে যতগুলি পারিবে, পালন করিবে, তাহা হইলেই হইবে। কিন্তু সামর্থ থাকিতে না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে।

রসিক।—প্রভো! তারপর কি করিতে হইবে?

প্রেমা।—বৎস! ইহার পর শাস্ত্র, দন্তধাবনাদি করিয়া স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রে সকল ঋষিগণই প্রাতঃস্নানের বিশেষ উপকারিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নানের বিশেষ ফল আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

যাম্যং চ যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে অপি পাপকৃতো নরাঃ॥

অর্থাৎ নিত্যস্নানশীল ব্যক্তির যমযাতনা ভোগ করিতে হয় না; এমন কি, নিত্যস্নান দ্বারা মহাপাতকীও নিজ পাপ হইতে মুক্ত হয়।

প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ।
যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি॥
তে নৈব দুর্গতিং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু।
দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্ব্বদা॥

অর্থাৎ মনুষ্য প্রাতঃস্নান করিলে নিষ্পাপ হয়, আর তাহাকে নরকে গমন করিতে হয় না। যাঁহারা পর্ব্বদিনে অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমা, সংক্রান্তি,

একাদশী প্রভৃতি দিবসে স্রোতজলে প্রাতঃস্নান করেন, তাঁহারা কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না এবং নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহাদের অসৎচিন্তা একেবারে হৃদয়ে উদয় হয় না। অত্রিসংহিতাদি গ্রন্থে স্নানের বহু বহু প্রশংসা করিয়াছেন, বিস্তৃতিভয়ে উল্লেখ করিলাম, না।

রসিক।—দেব! স্নান না করিলে কি কোন দৈবকার্য্যে অধিকার হয়না?

প্রেমা।—বৎস! স্নান না করিয়া মনুষ্য জপ, হোম এবং দেবার্চ্চন, এমন কি, ভোজন করিবারও যোগ্য হয় না। শাস্ত্রবলেন,—"স্নান না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা নিস্ফল হয়। আর প্রাতঃস্নানে বল, বীর্য্য, ধারণাশক্তি ও মনের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থের সুস্থ হইলে প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে দুইবার স্নান করা প্রসস্ত. অসুস্থ শরীরে কিন্তু কোন নিয়ম নাই।

রসিক।—গুরুদেব! কিরূপ জলে স্নান করা বিধেয়?

প্রেমা।—বৎস! জল সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গৃহস্থের রাখা অসম্ভব। সুতরাং যেখানে যেরূপ জল পাইবে, তথায় সেই জলেই স্নান করিবে। তবে গঙ্গাদি তীর্থে স্নান সম্ভব হইলে আর কূপাদিতে স্নান করিবে না, স্রোতজলই সর্ব্বথা স্নানে প্রশস্ত। দেখ, জল সাক্ষাৎ নারায়ণ; যে কোন জলই হউক না কেন, শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিলেই সেই জল পাপহারী গঙ্গাজলের সদৃশ হয়, সন্দেহ নাই। তবে স্নানের পূর্ব্বে কূপাদিতে তীর্থাবাহন করিয়া স্নান করিবে।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অর্থাৎ হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! এই জলে আপনারা অধিষ্ঠান হইয়া আমাকে পবিত্র করুন। কেহ কেহ আবার কেবলমাত্র পাপহারিণী গঙ্গাকেই তাঁহার দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া আহ্বান করেন। যথা,—

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী॥

পরে জলকে অতি পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া তাহাতে স্নান করিবে। অনেকেই সঙ্কল্প করিয়া স্নান করেন, অসমর্থ পক্ষে তাহা না করিলেও দোষ হয় না। রাত্রিবাস কাপড়ে বা অপবিত্র কাপড়ে কখনও স্নান করিতে নাই। স্নানের সময় জলের মধ্যে মল-মূত্র পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। প্রথমে জল মস্তকে স্পর্শ করিয়া পরে পাদ স্পর্শ করিবে। বৎস! বাহ্যিক স্নান এইরূপই সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে অন্তর শুদ্ধ করিবার জন্যই একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। জলের দ্বারা বাহিরের মলিনতা দূর হয় বটে, কিন্তু হৃদয় পবিত্র করিতে কেবল মাত্র সেই গুরুর উপদেশানুসারে ইষ্টদেবের ভাব ভিন্ন আর কিছুই নাই।—ভাব-বারিতে হৃদয়কে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই অন্তর বাহির শুদ্ধ হইবে। নতুবা ভিতর অপবিত্র রাখিয়া দীর্ঘকাল বাহ্যিক স্নানেও কোন ফল দেখা যায় না, বরং অভিমানই বৃদ্ধি পায়।

রসিক।—দেব! ভাব লাভ করিবার প্রধানতম অবলম্বন কি?

প্রেমা।—বৎস! শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমার স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতেই ভাবের উদয় হয়।" তবে আমাদের ন্যায় চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়-সেবাপরায়ণ ব্যক্তির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করা বিধেয়। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালনের দ্বারা ক্রমে চিত্ত স্থির হইয়া আইসে এবং চিত্ত স্থির হইলে তবে ভাবের উদয় হয়। উপদেশামৃত বলিয়াছেন—

বাচশ্চ বেগং মনসশ্চ বেগং ক্রোধস্য বেগং স্বোদরোপস্থবেগং।
বেগান্ য এতান্ বিসহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ বাক্যের বেগ সম্বরণ করিতে হইবে, যাহা ইচ্ছা, তখন তাহা বলিবে না, মিথ্যা কিংবা কাহারও অপ্রীতিকর অথবা ক্ষতিজনক বৃথা কথা

বলিবে না, অপ্রয়োজনীয় কথা বলায় দোষ হয়। আর মনের বেগও সম্বরণ করিবে, মন যাহাতে অসৎ বিষয় না ভাবে, যেরূপ ভাবনা দ্বারা হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ-মোহাদি রিপুগণের উত্তেজনা হয়, সেরূপ বিষয় ভাবিবে না। তবে মন যখন একটা ভাবনা ভিন্ন থাকিতে পারে না, তখন তাহাকে পরমেশ্বরের চিন্তাতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিবে,তাহাতে পরমানন্দ লাভ হইবে। আর ক্রোধের বেগও সম্বরণ করিবে। ক্রোধ হইবামাত্রই তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহার ভাবানুসারে চলা একান্ত সর্ব্বনাশের মূল। ক্রোধ হইবামাত্র সাবধান হইয়া তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। আর উদর এবং উপস্থের বেগ সহ্য করিবে। খাইবার ইচ্ছা হইলেই অমনি খাইবে না—বিবেচনা করিয়া আহার করিবে, আর ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইলেই তাহার অনুগামী হইতে নাই, তাহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবে। যিনি সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য বিচার করিয়া আহার বিহার করিতে পারেন, তাঁহার অন্তর বাহির সর্ব্বদা পবিত্র থাকে। এইরূপ পবিত্র অন্তঃকরণের লোকই অন্তরের অন্তর শ্রীভগবানের নাম ও রূপ চিন্তা করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি পৃথিবীর গুরু।

রসিক।—দেব! অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, মন শুদ্ধ থাকিলেই হইল, আবার স্নান বা নামের প্রয়োজন কি? এটী কিরূপ, দয়া করিয় আমাকে বলুন।

প্রেমা।—বৎস! কথাটী অতি সত্য; মন শুদ্ধ থাকিলেই সব হয় বটে, কিন্তু এই মনকে শুদ্ধ রাখাই যে বড় কঠিন। অখাদ্য কুখাদ্য খাইবার জন্য, নানাবিধ প্রকারে ভোগ করিবার জন্য, নিজ নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনেকেই মন শুদ্ধ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রকারগণ উহাকে মনের শুদ্ধতা বলেন নাই। অসৎ বিষয়ে চিন্তারহিত হওয়া ও পবিত্র বিষয়ের উপর নিরন্তর ভাব

থাকাই মনের শুদ্ধতা। অবশ্য যদি কাহারও সেইরূপ হইয়া থাকে, সর্ব্বদাই সর্ব্বময় শ্রীভগবান্‌কে অন্তরে বাহিরে লাভ করিতে পারে, তবে তাহার পক্ষে আর শুদ্ধাশুদ্ধ কি ? তাহার শুদ্ধিলাভের জন্য বাহ্য স্নান না করিলেও দোষ হয় না।

আর একটী কথা বলিয়া দি। যখন যে তীর্থে স্নান করিবে, তখন সেই তীর্থকে প্রথমে নমস্কার করিয়া পরে স্নান করিতে নামিবে। বৎস! ভক্তিই সকল কার্য্যের মূল, ভক্তিহীন কার্য্য নিস্ফল বলিয়াই শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তি সহকারে আপন পাপ দূর করিবার মানসে সেই মঙ্গলময়ের ভাব অবলম্বন করিয়া দেহ শুদ্ধ করিবে।

রসিক।—গুরুদেব! স্নানের পর কি করা কর্ত্তব্য ?

প্রেমা।—স্নানের পর শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া গুরু ও ইষ্টদেবের ভাব ও সম্প্রদায়ের অনুকূল তিলকাদি ধারণ একান্ত কর্ত্তব্য।

রসিক।—প্রভো! তিলক মালা ধারণ করাকে নব্যশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় অসভ্যতা বলিয়া নিন্দা করে। যথার্থই কি ইহা সভ্যতা ?

প্রেমা।—বৎস! ঈশ্বর-চিহ্নে চিহ্নিত হওয়া নিন্দা বা অসভ্যতা মনে করিও না, ঐরূপ ভাব মনে করিলেও পাপ হয়। গুরুর উপদেশানুযায়ী চিহ্নাদি ধারণও এক প্রকার উপাসনা জানিবে, উহাতে অভিমান দূর হইয়া ক্ষমা ও সদ্‌গুণসকল আপনা হইতেই আসিয়া থাকে এবং দেহে অহং ভাব লোপ পাইয়া, আমি তাঁর দাস, এই ভাব ক্রমে লাভ হয়। অতএব এ দেহ আমার নয়, এ দেহ শ্রীভগবানের, এইরূপ ভাবনা করিয়া, সেই মঙ্গলময় ইষ্টদেবেরই আদেশ প্রতিপালন ও চিহ্নাদি ধারণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, আর আমরা অনেক সময় ইহার প্রত্যক্ষ ফলও অনুভব করিয়াছি। তিলক ধারণের অনুকূল প্রমাণ

ভূরি ভূরি আছে, কত বলিব, শাস্ত্রে বলেন—

যজ্ঞোদানং তপোহোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্॥
যচ্ছরীরং মনুষ্যানামূর্দ্ধপুণ্ড্রবিনাকৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎতাবৎ শ্মশান সদৃশং ভবেৎ। (পদ্মপুরাণ)
উর্দ্ধপুণ্ড্রো মৃদাশুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ (স্কন্দপুরাণ)

এই ভাবের প্রমাণের অভাব নাই। তবে গ্রহণ না করিলে কি উপায় বল।

রসিক।—দেব! এই তিলক ধারণের বিধি কি, কোন্ মন্ত্রে, কি ভাবে করিতে হয় আমাকে উপদেশ দিন?

প্রেমা।—বৎস! তুমি ছাড়িবার পাত্র নও। আচ্ছা, তোমার যখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার ইচ্ছা, তখন বলিতেছি। শুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া, আচমন করিয়া, পরে গোপীচন্দন কিংবা অন্য কোন শুদ্ধ মৃত্তিকা-দ্বারা তিলক করিবে। তিলকের আকার পরিবার পরস্পর বিভিন্ন হইলেও মন্ত্রের সম্বন্ধে সকলেরই একমত। তিলক কাহার কিরূপ হইবে, তাহা অপনাপন গুরুর নিকট জানিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে কোন্ অঙ্গে কোন মন্ত্রে তিলক করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি।—

ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ। উদরে—শ্রীনারায়ণায় নমঃ।
বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ। কণ্ঠকূপে—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ।
দক্ষিণ কুক্ষিতে—শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। দক্ষিণ বাহুতে—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ।
দক্ষিণ স্কন্ধরে—শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। বামপার্শ্বে—শ্রীবামনায় নমঃ।
বাম বাহুতে—শ্রীশ্রীধরায় নমঃ। বাম স্কন্ধরে—শ্রীহৃষীকেশায় নমঃ।
পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। কটিতে—শ্রীদামোদরায় নমঃ।

তিলকের অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া "বাসুদেবায় নমঃ" এই বলিয়া মস্তকে দিবে। কেহ কেহ বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং বক্ষঃস্থলে ও ললাটে নামাঙ্কিত ছাপ দেয়, যাহার যেমন রুচি ও বিশ্বাস, সে সেইরূপ করিবে। দ্বাদশ অঙ্গের তিলক করা হইলে পর নামাদির ছাপ দিতে হয়।

রসিক।—গুরুদেব! আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই সকল বিধি-ব্যবস্থা জনসমাজে প্রচার হইয়া যায়। দেব! তিলক হইলে পর কি করা কর্ত্তব্য, আমাকে বলুন।

প্রেমা।—প্রিয় রসিকচাঁদ! তোমার এই সকল শ্রবণ করিয়াই আনন্দ হইতেছে, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যাহারা এই সকল নিয়ম যথাবিধি প্রতিপালন করে, তাহাদের কত আনন্দ, কত সুখ। আমি শ্রীভগবানের নিকট সরল প্রাণে প্রার্থনা করি, যেন তোমার দ্বারা এই সকল বিধি-ব্যবস্থা যথারীতি জনসমাজে প্রচারিত হয়। অতঃপর তিলক ধারণা করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনার দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। যাহারা গৃহী, তাহাদের যথাসাধ্য উপচারে ইষ্টদেবের অর্চ্চন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্য আশ্রমীর কেবল জপ ও ধ্যানেও উপাসনার কার্য্য চলে। পবিত্র চিত্তে পবিত্র আসনে বসিয়া নিস্কাম ভাবে ইষ্টদেবের প্রীতির জন্য যথাসাধ্য উপচারাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। সামর্থ থাকিতে কখনও শ্রীভগবানের অর্চ্চনায় কার্পণ্য করিতে নাই, তাহাতে অপরাধ হয় জানিবে।

রসিক।—দেব! আমার পাগল মন, তাই আপনার এই পূজার কথা শুনিয়া একটা প্রশ্ন মনে হইল, আর না বলিয়া পারিলাম না। আচ্ছা দেব! ভগবান্ আমাদের নিকট কি চান, অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহা বলুন। অনেকে বলেন, তাঁহার সৃষ্ট দ্রব্যে আবার তাঁহার কি অর্চ্চনা

করিব? দেব! উপচারাদি দ্বারা অর্চনা করা কি অতি নিম্ন অধিকারী সাধকের কার্য্য?

প্রেমা।—পাগ্‌লা! তোর প্রশ্নে হাসিও পায়, আবার এত দূর সমাজের অধঃপতন হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া দুঃখও হয়। দেখ, অনেক সময়ই জীবের মনে উদয় হয়, "হরি আমাদের নিকট চান কি? কোন্ বস্তু সেই লক্ষীকান্তের ভাণ্ডারে নাই? জীবের নিকট কোন্ দ্রব্য লাভের প্রত্যাশায় শাস্ত্রে—'জীব! উপাসনা কর' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন? কোন্ অভাব পূরণের নিমিত্ত নানারূপে নানা স্থানে লীলা বিস্তার করতঃ আপন পূজা প্রচার করিয়াছেন?"

বৎস! কিছুই বুঝি না। ভাবিতে ভাবিতে ধনীর বাড়ী, বহু ধনে নির্ম্মিত মন্দিরাভ্যন্তরে নবজলধর শ্যামসুন্দরের নানাবিধ বসন-ভূষণে বিভূষিত শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, হরি বুঝি বসন-ভূষণ ও সুন্দর মন্দিরে বাস করিতে চান্। কিন্তু আবার পর্ণকুটীরে কিংবা বৃক্ষতলায় সাধককে আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্তে ভাবোন্মত্ত ভাবে সেবা করিতে দেখিয়া আর পূর্ব্বের ভাব থাকে না, তখন মনে হয়, হরি চান্ সরল প্রাণের প্রকৃত—অকপট ভালবাসা, সরল মনের বিশ্বাস। বৎস! একদিনও যদি প্রেমের সহিত শ্রীহরির উদ্দেশে একটীবারও অঞ্জলি দিয়া থাক, একবারও যদি সরল বিশ্বাসে তাহাকে ডাকিয়া থাক,তবে তুমিই বুঝিতে পারিবে—হরি কি চান্! হরি যাহা চান্, হরিকে যাহা দিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়—জীবন মন সার্থক হয়, তাহা ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই জানে না; ইহাতে ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বিচার নাই—যাঁহার প্রেম আছে, তিনিই ধন্য। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে প্রেমে, প্রেমানন্দের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি আর যেন কিছু বলিতে পারিতেছেন না; দুইটী নয়ন হইতে অবিরলধারে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতেছে। রসিকচাঁদও ভাবে বিভোর।

কিছু সময় এই ভাবে থাকিয়া প্রেমানন্দ তাঁহার স্বভাব-সুলভ বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে গাহিলেন,—

"তাঁর কাছে সব শুচি।
( সে যে ) প্রেমিক হ'লে বুকে ধরে কিবা বামুন কিবা মুচি॥
থাকলে প্রেম হয় না দিতে সাধন ভজন তলাগুজি।
প্রেম-ভিখারি প্রেম চায় সে ভাঙ্গা ঘরে দেয় না খুচি॥
কিবা তিত কিবা মিঠ কোন রসে তাঁর নাই অরুচি।
( সে যে ) খুদের কণা যেচে খেল ত্যজ্য ক'রে মিঠাই লুচি॥*

গান শেষ হইল। কিন্তু যে প্রেমের স্রোত রসিকচাঁদ ও প্রেমানন্দের হৃদয় গহ্বর হইতে নয়ন-পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল তাহা বন্ধ হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা বেগ বেশী বলিয়াই অনুমিত হইল। অনেক সময় এই ভাবে কাটিয়া গেল, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। শেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গভীর স্বরে প্রেমানন্দ বলিলেন,—"তাঁর কাছে সব শুচি" উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া রসিকচাঁদ বলিল,—"তাঁর কাছে সব শুচি।" আবার উভয়েই নিস্তব্ধ।

পাঠকগণ! আজ বেলা অধিক হইয়াছে, আমার কঠিন লেখনী রসিকচাঁদ ও প্রেমানন্দের প্রেমপ্রবাহে বাধা দেয়, ইহা আমার ইচ্ছা নয়। সুতরাং আসুন, আমরা আজ এইখানে একটু বিশ্রাম করি। আবার সন্ধ্যার পরেই আসিয়া মিলিবার চেষ্টা করিব।

---

* জাতি, কুল পাণ্ডিত্য বা ধনরত্নে শ্রীগোবিন্দকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে পাইতে হইলে চাই বিশুদ্ধ ভক্তি, নির্ম্মল প্রেম। এইটী দেখাইতেই শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধন রাজার নানা উপচার পরিত্যাগ করিয়া, বিদুরের ঘরে তণ্ডুলকণা পরমানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন।

( ৭ )

পাঠক মহোদয়গণ! প্রাতে আমরা রসিকচাঁদকে প্রেমানন্দের নিকট প্রেমবিহ্বল ভাবে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলাম। আমরা যাইবার পর উভয়ের কি ভাবে কাটিয়াছিল, বলিতে পারি না। তবে সন্ধ্যার পরেই আসিয়া দেখি, দুই জনে যে ভাবে প্রাতে বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া বাক্যালাপ করিতেছেন। দুই জনের পরিধেয় বসনই প্রেমজলে সিক্ত। ভাব দেখিয়া মনে হইল যে, সমস্ত দিনই দুই জনে এই ভাবে প্রেমালাপনে প্রেমানন্দে কাটাইয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যাইবার পূর্ব্ব হইতেই উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জানিবার আর উপায় নাই বুঝিয়া, আমরা যেখান হইতে শুনিতে পাইয়াছি, তাহাই আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম।

প্রেমানন্দ।—বৎস! শ্রীভগবান্ নিজ মুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

অর্থাৎ ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু অর্পিত হয়, আমি অভক্তের অভিমানপ্রদত্ত অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া, প্রেমিকের সেই সামান্য জিনিষও বহু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। এখন বুঝিলে রসিকচাঁদ! হরি জীবের নিকট কি চান্?

রসিক।—গুরুদেব! আপনার কৃপায় এখন বুঝিলাম যে, হরি জীবের নিকট, ভক্তি—সরল প্রাণের ভালবাসা—নির্ম্মল প্রেম চান্। ভালবাসিয়া প্রেমভরে তাঁহাকে যে যাহা অর্পণ করে, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। দেব! এক্ষণে এই পূজা-রহস্য সংক্ষেপে কিছু বলুন।

প্রেমা।—বৎস! শ্রীভগবানের অর্চ্চনায় ভগবানের কোনও অভাব

পূরণ হয়, এরূপ কখনও মনে করিও না ; কেবল আপন আপন কৃতার্থতার জন্যই নিজ প্রাণে যাহা ভাল লাগে, নিজের যাহা প্রীতিকর, সেই সেই ভাবে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা তাঁর পূজা করিবে। কিন্তু বৎস! এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে যে, সকল কার্য্যের মূলেই ভক্তি। প্রীতির সহিত আপন প্রিয়বস্তু প্রেমময় শ্রীভগবানকে দিয়া সুখ অনুভব করাই ভক্তির লক্ষণ। আমরা কামী, তাই কামনাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতে যাই, তাই প্রাণে সুখ পাই না। ভগবান অন্তর্য্যামী, তাঁহার নিকট চাহিতে হয় না, কেবল তাঁহার পদে ভক্তি রাখিয়া কার্য্য করিলে তিনি আপনা হইতেই জীবের যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। বৎস! এই সকল পূজাদি সম্বন্ধে অনেক গুহ্য রহস্য আছে, সে সকল আপনাপন গুরু অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নিজ নিজ অধিকারানুসারে জানিয়া লইতে হয়। কখন গুরুপূজা, কখন ইষ্টপূজা, কি ভাবে, কি মন্ত্রে, কি প্রণালীতে করিতে হইবে, তাহা আপনাপন গুরুদেবের নিকট জানিয়া লইবে।

রসিক।—প্রভো! এই যে আপনি বলিলেন, "ভগবানের নিকট কিছু চাহিতে হয় না, ভক্তি করিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আপনা হইতেই সকল প্রদান করেন।" আচ্ছা প্রভু! ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত বলিয়া আমার বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করুন।

প্রেমা।—বৎস! ভাল কথাই বলিয়াছ। আজকাল যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক কার্য্যেরই একটী নজির চাই। আচ্ছা, বলিতেছি, শ্রবণ কর।—তুমি বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত সুদামার চরিত্র শুনিয়াছ? সুদামা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণোচিত বেদাধ্যায়নাদি কার্য্য করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে মতি রাখিয়া সংসার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার সখ্যভাব অতি প্রগাঢ় ছিল। সখ্যভাব কাহাকে বলে, যদি জানিতে চাও, ইহার পরে প্রশ্ন করিও, বলিয়া দিব। এখন এই পর্য্যন্ত

জানিয়া রাখ যে, পাঁচ প্রকার ভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা হয়; যথা,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই তৃতীয় ভাব সখ্যভাব; এই ভাবেই সুদামার শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা ছিল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিৎ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমী॥

সুদামার বিষয়-ভোগে আসক্তি ছিল না; যখন যাহা পাইতেন, তাহাতেই প্রীত থাকিতেন। ইন্দ্রিয়-সুখ-বাসনা সুদামার মোটেই ছিল না, তিনি গৃহাশ্রমী হইয়াও শ্রীভগবানের সেবায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রবাক্য সুদামা অতি যত্ন সহকারেই প্রতিপালন করিতেন। সুদামার অর্থ ছিল না সত্য, কিন্তু তিনি যে ধনে ধনী হইয়াছিলেন, তাহাতে বাহিরে ভিক্ষালব্ধ অর্থে দিন যাপন করিয়াও সুদামা সদানন্দেই বিভোর থাকিতেন। বৎস! একবার যে ভগবৎ প্রেমের মধুরতা আস্বাদন করিয়াছে, আর কি তাহার হৃদয়ে বিষয়-বাসনা স্থান পায়? আর কি সে বিষয়ে আসক্ত হয়? তাহা কখনই হয় না।

একদিন সুদামা শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন, আর তাঁহার পত্নী নিকটে বসিয়া নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণ-গুণগাথা আলোচনা করিতেছেন। বিধির ইচ্ছায় পূর্ব্ব দুই দিবস অতি সামান্য ভিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে কেবল সুদামারই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে, পতিব্রতা রমণীও স্বামীকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইয়াছেন, নিজে উপবাসিনী ছিলেন। অদ্য সুদামাপত্নী ক্ষুধায় কিছু কাতরা হইয়াছেন, তাই নানা কথার পরে বলিলেন,—"নাথ! আপনার সখা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার নিকট যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। তিনি সম্প্রতি দ্বারকায় রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করতঃ বিরাজ করিতেছেন, আর আমরা এখানে দুঃখে

কষ্টে দিন যাপন করিতেছি। আপনি একবার সেখানে গমন করুন। তাঁহার একবার কৃপাদৃষ্টি হইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। শুনিয়াছি, শ্রীভগবানের কৃপায় জীবের সকল কষ্ট দূরে যায়, অতএব আপনি একবার সেখানে গমন করিয়া আমাদিগের কষ্টের কথা তাঁহাকে বলিয়া দেখুন, তিনি কি করেন। তিনি যে অগতির গতিদাতা, নিশ্চয়ই আমাদিগের একটা গতি তিনি করিবেন।

পত্নীর এই সকল কথা শ্রবণে সুদামা সুখী হইলেন না। তাহাকে বলিলেন,—প্রিয়ে! ভগবানের নিকট কোনও বিষয়ের জন্য কামনা করিতে হয় না। সকাম সাধক আর ব্যবসায়ী, উভয়েই তুল্য। অকপট ভাবে শ্রীভগবানের সেবা কর—তাঁহাকে ডাক—তিনি যখন যে ভাবে রাখিবেন, তাহাকেই উত্তম বলিয়া মনে কর। দেখিবে, তিনি আপনা হইতেই দয়া করিবেন। স্বামীর নিকট এইরূপ শুনিয়া সুদামাপত্নী লজ্জিতা হইলেন এবং আশাভঙ্গ জনিত দুঃখে ও পতির অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার সদাপ্রফুল্ল বদন-কমল বিবর্ণ হইল। পত্নীর এই ভাব সুদামা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, যাহা হউক, একবার সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিয়া আসি, পরে যাহা হয় হইবে। এই স্থির করিয়া পত্নীকে বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি তোমার কথামত অদ্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে যাইব, তুমি দুঃখ করিও না। এখানে ভাগবত বলিয়াছেন,—

স এবং ভার্য্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ।
অয়ং হি পরমো লাভো হ্যুত্তমশ্লোকদর্শনম্।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে॥

আহা! ভগবদ্ভক্তের সুখ-দুঃখ সমান! ভক্ত প্রাণে যে অমূল্য নিধি পাইয়াছেন, ত্রিভুবনে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু আছে বলিয়া তিনি জানেন না বা জানিতে চাহেনও না। তিনি কেবল চান, তাঁহার প্রাণের

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"


| ২৮শ বর্ষ | ভক্তি | ফাল্গুন |
| --- | --- | --- |
| ৭ম সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ১৩৩৬ |


# প্রাণের কথা

( ৫ )

কেহ নাই—কেহ নাই, নাহি রে কেহই,
আমার প্রাণের কথা কে শুনিবে আর?
শুনিতে কেহই নাই শুধু তুমি বই,
তুমিই আছ হে নাথ ভরসা আমার!
সংসারে ধিক্কৃত আমি যদিও হ'য়েছি,
পেয়েছি শত্রেক হেলা সকলের কাছে;
তুমিত ছাড়নি প্রভু, তোমারি র'য়েছি;
মনটা তোমারি পায়ে এত বাঁধা আছে!
তবে আর কিসে চিন্তা? ভয়ই বা কেন?
কেহ নাই, তুমি মোর আছ ত হে নাথ!
তাই থেকো, তব পদে মতি থাকে যেন,
সব যাক, আমি রব শুধু তব সাথ।
রাখিয়াছি শির তব চরণের তলে;
ও চরণ ভিজাইব নয়নের জলে।

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

# দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

( শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি এ লিখিত )

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সকলেই দ্বৈতবাদী। রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ মাধ্বাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ রূপে আলোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সাধু বা বৈষ্ণব মাত্রেই দ্বৈতবাদী। বস্তুতঃ দ্বৈতবাদ না হইলে শ্রীভগবানের উপাসনা থাকে না। পক্ষান্তরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই অদ্বৈতমতাবলম্বী। পুরাণ ও তন্ত্রের অনেক স্থলে অদ্বৈতবাদের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শিব পূজায় মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে স্বয়ং পূজক বা যজমানও একটী মূর্ত্তি। হিন্দুর প্রাতঃ-স্মরণীয় মন্ত্রগুলির মধ্যে—

"অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাব বান॥"

এই শ্লোকে অদ্বৈতবাদই স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্রেরও অনেকে অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ "প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্মং" অহং ব্রহ্মোঽস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি" "তত্ত্বমসি" চতুর্ব্বেদোক্ত এই মহাবাক্য চতুষ্টয় সম্পূর্ণভাবে অদ্বৈতবাদই সমর্থন করিতেছে। আবার "দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বৈতপক্ষে ও অদ্বৈত পক্ষে উভয় পক্ষেই ব্যাখ্যা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। এদিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু "মায়াবাদ"কে অসচ্ছাস্ত্র ও শাক্যের মতকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রভাবে মায়াবাদী বৈদান্তিক সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীও মায়াবাদ ত্যাগ করিয়া দ্বৈতবাদী হইতে বাধ্য হইয়া-

ছিলেন। এরূপ স্থলে সত্য নির্ণয়ের উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শ্রীরাসলীলায় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণবিরহে পরিশেষে আপনারাই শ্রীকৃষ্ণ ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর শাস্ত্রানুসারে দেবতা পূজার সময় পূজক নিজেকেই দেবতাস্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। ইহাতে শাস্ত্রে কি অদ্বৈতবাদের সূচনা বা সঙ্কেত করা হয় নাই?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বধামগত "সোহংস্বামী" সোহংগীতা "সোহংতত্ত্ব" "সোহং সংহিতা" প্রভৃতি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে অদ্বৈত মত প্রচার করেন। শুধু অদ্বৈত বাদ প্রচার নহে, তিনি পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রের অসারতা ও অপ্রমাণিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। অধিক কথা কি তিনি তৎপ্রণীত ভগবৎগীতার সমালোচনা নামক পুস্তকে ভগবদ্বাক্যের বৈষম্য অসামঞ্জস্য ও অপ্রমাণিকতা প্রমাণ করিতেও ক্রটী করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি হিন্দুর পুরাণ বর্ণিত দেবদেবী ও অবতারগণের অপ্রামাণিকতা প্রদর্শন করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অনেক সময়েই পাঠকগণের চিত্তবৃত্তি বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করা অথবা হিন্দুর পুরাণ ও তন্ত্রাদির গৌরব রক্ষা করা মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি বেদ বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া আপনার মতের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান ও তর্কশক্তি উভয়ই নিতান্ত হীন। এজন্য সুধী ও শাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ সমীপে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা তাঁহারা সোহং স্বামী মহোদয়ের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমুদয় যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে চেষ্টা করুন। অন্যথা অপরিণতবুদ্ধি যুবক ও প্রৌঢ়গণ তাহার পুস্তকাদি পাঠে বিভ্রান্ত হইয়া অচিরে হিন্দু দেব দেবী ও শাস্ত্রা-

দিতে বিশ্বাস হারাইবেন। শুধু বেদ বেদান্তের ধর্ম্ম সাধারণের অধিগম্য হইতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদ ও সাধারণের বোধাতীত। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

## আত্মগ্লানি

আরে আরে মোর নিলাজ পরাণ
কি ক'রে দেখাও মুখ।
কোন্ আনন্দেতে আছরে ভুলিয়ে
অন্তরের যত দুখ॥
দেখ একবার চাহিয়ে ভিতরে
কি আগুণে জ্বলে' মর।
সে আগুণ কিসে নিভিয়া যাইবে
তাহার উপায় কর॥
ভোগ বিলাসেতে ভুলিয়া যাইছ
ভজনীয় কথাগুলি।
সেই কারণেতে এমন করিয়া
দিবানিশি মর জ্বলি॥
আপন ইচ্ছায় আপনি মরিছ
কথা না শুনিলে কারো।
ক্ষণিক সুখের তরেতে ছুটিছ
ভালে আছে দেখি আরো॥

এখনো তোমার সময় আছয়ে
বাঁচিবারে যদি চাহ।
সব কুবাসনা পাপ কুমন্ত্রণা
মন হ'তে ফেলি দাও॥
মনে মনে তুমি কত কিছু কর
বাহিরে সাজহ ভক্ত।
ভক্ত সাজিয়া সবারে ভুলাবে
সে কাজ বড় যে শক্ত॥
এমন করিয়া ক'দিন রহিবে
যেদিন ধরিবে সে।
নিকটেতে ডাকি বুঝিয়া লইবে
হিসাব দিবে গো কে?
যদি বল তুমি, দয়াল সে যে গো
আমিও স্বীকার করি।
তার কাছে কিন্তু নহে সে দয়াল
(যার) ভাবের ঘরেতে চুরি॥
অবোধ বালক নহে অপরাধী
যদিও করে সে দোষ।
জ্ঞানী হ'য়ে যদি অন্যায় আচরে
এড়াতে নারে সে রোষ॥
তাই বলি মন করিয়ে যতন
আপন কর্ত্তব্য কর।
কাঁদিয়া মরিলে কেহ ত তখন
মুখ না দেখিবে তোর॥

সাধু গুরুজন বিমুখ হইলে
কোথায় পাইবি স্থান।
তাই বলি মন ফেরোরে এখন
( যদি ) রাখিতে চাহ রে মান॥
সাধু গুরুজনে সদয় হইলে
হইবিরে সুখী শেষে।
কত মহাজন কুটুম্ব তখন
পাইবি ঘরেতে ব'সে॥
বল দেখি মন ইহা হ'তে আর
বড় সুখ কিবা আছে।
আলোক ত্যজিয়ে পাইবি কি সুখ
গিয়ে আঁধারের কাছে॥
আর দুঁহে মিলি দুই বাহু তুলি
করি গুরু গুণ গান।
যতন করিয়ে বুকেতে ধরিয়ে
যে করিল চক্ষুদান॥
প্রাণ ভ'রে ভাই এস সবে গাই
জয় দয়াময় গুরু।
আমার সকল বাসনা পুরাতে
বাঞ্ছা কল্পতরু॥
শ্রীগুরু শ্রীপাদ কর আশীর্ব্বাদ
মনটাকে তুলে নিয়ে।
পাদ্য অর্ঘ্য যেন দিতে পারে "বাঁকা"
তোমার কাছেতে গিয়ে॥

দীন—শ্রীবঙ্কুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

# শ্রীল জগাই মাধাইর বংশতালিকা *

"নবদ্বীপ বাসী শ্রীশুভানন্দ রায়।
ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয়॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি।
দেশে বিদেশে যাঁর ঘোষয়ে সুকীর্ত্তি॥
পাৎসাহের সঙ্গে অতিশয় প্রীতি তাঁর।
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার॥
জ্যেষ্ঠ রঘুনাথ কনিষ্ঠ জনার্দ্দন রায়।
রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয়॥
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয়।
জ্যেষ্ঠ জগন্নাথ তাঁরে জগাই বলি কয়॥
কনিষ্ঠ মাধব তাঁরে মাধাই ডাকয়।
নদীয়ার রাজা এই দুই মহাশয়॥
দেশ লোটে, লোক মারে, পাৎসাহ না মানে।
তাঁদের ভয়েতে কাজি নহে আগুয়ানে।
... ... ...
চুরি ডাকাতি করে জগাই মাধাই।
যত পাপ করে তার অন্ত নাহি পাই॥
গোবধ ব্রহ্মবধ যত পাপ চয়।
পাপ-মধ্যে কোন পাপ বাকি নাহি রয়॥
দুই ভাই তরাইলা দয়াল নিতাই।
মাইর খাইয়া প্রেম দেয় এমন দয়াল দেখি নাই॥"

(প্রেমবিঃ—২১ বিঃ)

---

* মাধাইর বংশতালিকাটি শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ দত্ত বি, এস সি মহাশয় শ্রীল মাধব প্রভুর বংশধরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। জগাইর বংশ তালিকা কাহারও জানা থাকিলে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। (লেখক)

## বংশলতা

- শ্রীশুভানন্দ রায়
  - রঘুনাথ
    - জগাই বা শ্রীজগন্নাথ
  - জনার্দ্দন
    - মাধাই বা শ্রীমাধব
      - বাণীনাথ ( কতুলপুরে বাস করেন )
        - হরিচরণ ( ১ম স্ত্রীর গর্ভে )
          - রাম
          - কিশোর
            - গোবিন্দ ( ১ম স্ত্রীর গর্ভে )
              - খুদিরাম
                - দর্পনারায়ণ
                  - নকুড়
                    - ঠাকুরদাস
                  - গোলকনাথ ( শ্রীরাম পুরে বাস )
                    - বিপ্রদাস
                    - গুরুদাস
                      - প্যারীমোহন
                        - বৃন্দাবন
                          - রাসবিহারী ( নবদ্বীপ বাসী )
                    - প্রাণকৃষ্ণ
                - পঞ্চানন ( ১১৫১ সালে চুঁচড়ায় বাস )
                  - বীরচন্দ্র
                  - জয়নারায়ণ
                    - ( কন্যা )
                      (স্বামী) গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
                      - বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়
              - গৌরচন্দ্র
            - গোকুল
            - বাসুদেব
            - প্রতাপ নারায়ণ ( ২য় স্ত্রীর গর্ভে )
          - বলরাম
        - রাধাবল্লভ ( ২য় স্ত্রীর গর্ভে )
          - বৃন্দাবন

শ্রীল মাধাই বা মাধব প্রভুর সমাধি অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। উহাকে ঘোষহাট মাধাই তলা বলে। কাটোয়া সহর হইতে ১ মাইল দক্ষিণে আকাই হাট যাইবার পথে একটি আশ্রম মধ্যে এই সমাধিমন্দির। পূর্ব্বে এই পবিত্র স্থানটি লুপ্ত হইয়া যায়। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গোপীচরণ দাস নামক জনৈক ভক্ত বাবাজী এই স্থানটিকে উদ্ধার করতঃ শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি উক্ত স্থানটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ—শ্রীমাধাই ঠাকুর শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসের সংবাদ পাইয়া অধীর হইয়া কাটোয়াতে মহাপ্রভুকে অন্বেষণ করিতে আসেন। পরে নবদ্বীপ ধামে আর ফিরিয়া যান নাই। এই স্থানেই ভজন করিতে করিতে দেহ রক্ষা করেন।

অন্য প্রবাদ—এই স্থানে জগাই মাধাই দুইজনে দস্যুবৃত্তি করিতেন। প্রথম প্রবাদটিই সঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয়।

এই শ্রীমাধাইয়ের সমাধি মন্দিরের নিকটই বারদীর শ্রীল লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের শিষ্যগণের একটী সুন্দর মঠবাড়ী আছে।

(মাধাইতলার সেবক শাখার তালিকা)

শ্রীগোপীচরণ দাস মহান্ত
|
গৌরচরণ দাস
|
গৌরকিশোর দাস
|
ফুলকিশন দাস
|
রাধাবিনোদ দাস
|
শ্রীবৈদ্যনাথ দাস মহান্ত (ইনি ১৩২৮ সালে এই প্রবন্ধ লেখককে এই বিবরণ প্রদান করেন।)

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এই মাধাই তলাতে বৎসরের মধ্যে ৪মাস অবস্থিতি করেন। দোলযাত্রাতে উৎসব হয়। বাকি ৮ মাসের মধ্যে ৪মাস বিশ্রাম তলা গ্রামে বিজয় করেন। বর্দ্ধমান জেলার নবগ্রাম হইতে ৩ মাইল এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেলের পাঁচুন্দি ষ্টেসন হইতে ১ মাইল দূরে বিশ্রামতলা গ্রাম। ডাক ঘর কুলাই। ঐ স্থানের মহান্ত বা সেবায়তের নাম শ্রীননীতোষ দাস মহান্ত, রথযাত্রায় শ্রীবিগ্রহের উৎসব হয়, এবং আর চারিমাস বীরভুম জেলার বাহিরী গ্রামে বিজয় করেন। ( বোলপুরের নিকটে, ডাকঘর ঐ বাহিরী ) ঐ স্থানের সেবায়েতের নাম শ্রীহৃদয় চৈতন্যদাস বাবাজী, রাস যাত্রায় উৎসব হয়।

গত ১৩২৮ সালে আমরা কাটোয়ার মাধাই তলায় শ্রীল মাধাই ঠাকুরের পবিত্র সমাধি দর্শন করি। সেবায়েত মহাশয় কৃপা করিয়া ঐ সমাধির একখানি ফটো চিত্র এ দীনকে প্রদান করিয়া ছিলেন। এসম্বন্ধে যদি পাঠকগণের মধ্যে কেহ কিছু নূতন সংবাদ দিতে পারেন জানাইলে যথা সময় পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# শ্রীল রসিকানন্দ দাস।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা মহাত্মাগণের পরিচয় ও তাঁহাদের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংগ্রহ কারগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু অনেকের সম্বন্ধে কোন কিছু বিবরণ দিতেও পারেন নাই। আমাদের যৎটুকু সামর্থ আমরা ততটুকুই আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিব। ভুল ভ্রান্তি ত থাকিবেই,

পাঠকগণের নিকট সানির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উৎকর্ষতা সম্পাদনে যিনি যতটুকু উপকরণ আমাদিগকে দিতে পারেন দিবেন, করযোড়ে ইহাও প্রার্থনা যে, আমাদের ভুল ভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া আমাগিকে কৃতার্থ করিবেন।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য মহাত্মার নাম রসিকানন্দ দাস। শ্রীশ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণীতে ইহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত জন্মাষ্টমীর সময় উৎকলের জনৈক বৃদ্ধ বৈষ্ণব ভ্রমণচ্ছলে আমাদের কৃতার্থ করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৯৫ বৎসর হইবে। কিন্তু এখনও দেহের গঠন যেরূপ সুদৃঢ় রহিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের যুবকগণও তুলনার স্থল হয় না।

যাহা হউক নানাবিধ ভজন প্রসঙ্গ হইতে হইতে এই রসিকানন্দ দাসের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন গৌরপদ তরঙ্গিণীতে রসিকানন্দের যে, তিনখানি মাত্র পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে আরও অনেক পদ আছে।

উৎকলে যাইয়া আমাদিগকে উহা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন, তবে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুম্ভমেলায় যাইবেন এইরূপই বলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে যাহা কিছু পাইব যথাসময়ে ভক্তির পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থাপিত করিব।

এক্ষণে আমরা রসিকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইব। গৌরপদ তরঙ্গিণীর গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—১৫১২শকে কার্ত্তিক মাসের ১০ তারিখে রবিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণরেখা নদী তীরস্থ রয়ণী নামক গ্রামের অধীশ্বর অচ্যুতানন্দ ইহাঁর জনক। মাতার নাম ভবানী। ইহারা "করণ কায়স্থ"। প্রজাপালনে অচ্যুতানন্দ এমন যশ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাৎকালিক অন্যান্য রাজা বা জমিদারগণ ঐ আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। রসিকানন্দের জন্মের

দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১৪শকে অচ্যুতানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মুরারি ভূমিষ্ঠ হয়েন। উপযুক্ত পিতা মাতার সৎ আদর্শ পাইয়া অতি অল্প বয়সেই রসিক এবং মুরারি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েন। দুই ভাইয়ের সুখ্যাতি নানা-ভাবে চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়ে। পুত্রের সুখ্যাতিতে পিতামাতার আনন্দের সীমা থাকেনা, তার উপর যদি ভগবদ্ভক্তি সম্পন্ন হয়, তবে তো আর কথাই নাই। অচ্যুতানন্দের ও ভবানীর যেমন দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল পুত্রদ্বয়ও তাঁহাদের আদর্শে অল্পবয়সেই বিশেষ ভক্তিমান হইয়া উঠেন। নরোত্তম বিলাসের চতুর্থ বিলাসে দেখিতে পাই, উভয় ভ্রাতাই শ্রীশ্যামনন্দ পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা,—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।"

ভক্তিরত্নাকরও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, উভয় ভ্রাতাই প্রভূত ক্ষমতাশালী সাধক ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

বৈষ্ণব কবির মধ্যে দুইজনের নাম আমরা মুরারি পাই। একজন মুরারিগুপ্ত ও একজন মুরারিদাস। মুরারিগুপ্তের কড়চা বা চৈতন্য চরিত জগতে প্রসিদ্ধ, তবে সেখানি সংস্কৃতগ্রন্থ। সুতরাং আমাদের মনে হয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মুরারিদাসের কবিত্বের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনজন্য লিখিয়াছেন;—

"মুরারি-মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি।"

আমরা আজ পর্য্যন্তও মুরারিদাসের কোন কার্য্যের সন্ধান পাই নাই, পদ বা অন্য কিছু আছে কিনা যদি কেহ জানেন অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। মুরারির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রসিকানন্দের "রতিবিলাস" ও "শাখা-বর্ণন" নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম শুনিতে পাই, মুদ্রিত হইয়াছে কিনা তাহাও জানি না।

গৌরপদ তরঙ্গিণীতে দেখিতে পাই, রসিকমঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

পিতা মাতার মৃত্যুর পর মুরারির স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে রসিক ও মুরারি ঘণ্টশীলা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই ঘণ্টশীলাও সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী। জন প্রবাদ যে, পঞ্চ পাণ্ডব বনবাস কালে কিছুদিন এই ঘণ্টশীলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু যে বলিয়াছেন "একটী বধুর ইচ্ছায় দুই ভ্রাতা পৈতৃকাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘণ্টশীলায় গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এ কথাটা আমাদের সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে স্থান পরিবর্ত্তনের অন্য কোন কারণ থাকিবারই খুব সম্ভাবনা।" আমাদেরও তাহাই মনে হয়। নরোত্তম বিলাসের তৃতীয় বিলাসে আছে—

উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচার।
শ্যামানন্দ তা সবার করিলা নিস্তার॥
শ্রীরসিকানন্দ আদি বহু শিষ্য কৈলা।
তা সবার কৃপা লেশে দেশ ধন্য হইলা॥

শুনা যায় রসিকানন্দের জন্মস্থান রয়ণীপ্রদেশে এক দুর্দ্দান্ত যবন রাজা ছিল। শ্রীগুরু কৃপায় অলৌকিক প্রভাবে রসিকানন্দ সেই যবন ভূপতিকে তাহার অসংখ্য মুসলমান প্রজাসহ বৈষ্ণব করিয়া ছিলেন। এবং "করণ-কায়স্থ" হইয়া বহু বহু ব্রাহ্মণকেও শিষ্য করিয়া ছিলেন এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

"শত শত যবনাদি শিষ্য হইল হেলে।"

রসিকমঙ্গল গ্রন্থে এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়। প্রবীন বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় রসিকানন্দের একটী অলৌকিক কার্য্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই রসিকের মহিমা কি বলিব, ইনি বনের মত্ত হস্তিকেও শুদ্ধ হরিনামের প্রভাবে বশ করিয়া ছিলেন। মনঃ শক্তি ও ভক্তির বল এত অধিক যে, যে মত্ত মাতঙ্গ জনপদ ধ্বংশ করিত লোক জন তাহাকে দেখিয়াই পালাইত, কিন্তু রসি-

কানন্দ ভীত না হইয়া যেমন 'হরি বোল' বলিয়া হুঙ্কার করিলেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হস্তী অমনি তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল।" রসিকানন্দের পত্নীর নাম মালতী। ইহাঁর পত্নী ও পুত্রগণও শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর পুত্র কয়টী ছিল এবং কি নাম তাহা জানিতে পারি নাই। শেষে রসিলানন্দ সংসার ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। সমগ্র উৎকল দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু শিষ্য করেন এবং অনেক নাস্তিক পাষণ্ড রসিকানন্দের কৃপায় উদ্ধার হইয়াছিলেন। নরোত্তম বিলাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্যামানন্দের সহিত রসিকানন্দ খেতুরীর মহা মেলাতে উপস্থিত ছিলেন। এবং রামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে মহোৎসবের আংশিক অধ্যক্ষতাও করিয়াছিলেন।

রসিকানন্দের মাত্র তিনখানি পদ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পদ তিনখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রথম পদ খানি নাগরী ভাবের যথা—

নিরবধি মোর হেন লয় মনে
ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া গৌরাঙ্গ বদন
হেরিব মনের হরিষে॥
আই আই ফিরে সেরূপ মাধুরী
নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়া নাগরী সোহাগে আগরী
পাইল রসের নিধি॥
অপরূপ রূপ কেশর করিয়া
ইচ্ছাহর হিয়ায় লেপি।
সোণার বরণ বসন পরিয়া
জীবন যৌবন সঁপি॥

চুলের চাঁপা ফুল হেন করি
আউলাঞা করিয়া দেখা।
লাজ ভয় ছাড়ি লোকে উড়ি পড়ি
দু'বাহু করিয়া পাখা॥
পীরিতি মূরতি চিত্র বনাইয়া
কহিব মনের কথা।
ভরি বুকে বুকে রাখি মুখ মুখে
রসিক ঘুচাবে ব্যথা॥

ব্রজ লীলায় গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগের যে সকল পদ আছে পদ কর্ত্তৃগণ তদনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় বহু পদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল পদই বৈষ্ণব সমাজে নাগরীর পদ বা রসের পদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল পদে সাধারণতঃ দেখাযায় যেন নদীয়া নাগরীগণ গৌরাঙ্গরূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছেন। যে সকল গ্রন্থের শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা আছে তাহাতে দেখাযায় প্রভু বিশ্বম্ভর বাল্যকালে অনেক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও কাম কটাক্ষক্ষেপ দূরে থাকুক যুবতী স্ত্রীলোকের মুখ পানে ভ্রমেও তাকান নাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্ববিষয়ে অতি বিশুদ্ধ চরিত্র দেখা যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর অন্যে পরে কা কথা স্বীয় ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ সন্দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই। পরমা তপস্বিনী বৃদ্ধা মাধবী দাসীর সহিত দু একটী কথা কহিয়া ছিলেন বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় বিশ্বস্ত পরম প্রিয়ভক্ত ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়া ছিলেন। অথচ এই নাগরী ভাবের পদ সমূহ দেখিয়া অভক্ত পাষণ্ডগণ শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত্রে লাম্পট্য দোষের আরোপ করিতে পারে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে জানিয়া শুনিয়া ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ ঈদৃশ ভাবাত্মকপদ রচনা করিলেন কেন?

এই প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যায়। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসসভার উপস্থিত হয়েন তখন—

মল্লানামশনি নৃণাং নর বরঃ স্ত্রীনাং স্মরো মূর্ত্তিমান,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজ পতে বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত কংস সভায় উপস্থিত হইলে একই সময় শ্রীকৃষ্ণ মল্লদিগের নিকট বজ্র তুল্য, সাধারণ মানবের নিকট অতি মহাপুরুষ, স্ত্রীগণের নিকট সাক্ষাৎ মদন, গোপদিগের নিকট স্বজন, অসৎ নরপতি গণের নিকট শাসন কর্ত্তা, নিজের পিতা মাতার নিকট শিশু, ভোজরাজ কংশের নিকট সাক্ষাৎ কাল, অবিজ্ঞজনগণের নিকট বিরাট, যোগিগণের নিকট পরম তত্ত্ব এবং বৃষ্ণি দিগের নিকট পরমদেবতা রূপে বিদিত হইলেন। তবেই ভাবিয়া দেখুন একই কৃষ্ণকে যাহার যেমন মনের ভাব তিনি সেই ভাবে দর্শন করিলেন। প্রচলিত একটী কথা আছে—"কৃষ্ণ কেমন?" "যার মন যেমন।" এখানেও তদ্রূপ। যে নয়ন ভঙ্গী, যে হাস্য, যে হস্তাদি সঞ্চালন দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ ভাবিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্যাকুল এবং যে ভাব ভঙ্গীকে বায়ুরোগে সন্দেহ করিয়া স্নেহময়ী মা শচীদেবী আকুল সেই ভাবভঙ্গীকে কামচেষ্টা মনে করিয়া হাবভাব ময়ী নদীয়া নাগরী-গণ যে তাঁহাকে নব নাগর ভাবিবেন তাহাতে আর চিচিত্রতা কি? ফলতঃ মহাপ্রভুর নবীন নাগর রূপ ভক্তের ইচ্ছানুসারে। যাঁহারা ব্রজভাবে মাতোয়ারা মধুর রসের রসিক, রসশেখর শ্রীগৌরাঙ্গকে তাঁহারা আর কোনরূপে দেখিতে চায় না বা পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীগৌরপদ দাস

প্রাণ হৃদয়-সর্ব্বস্ব শ্রীহরিকে দেখিতে এবং অবিরত তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে। তাই আজ ভক্ত সুদামাও ভাবিলেন, যাহা হউক, যেমন করিয়াই হউক, প্রিয়তম কৃষ্ণকে ত আজ দেখিতে পাইব? আজ আমার ভাগ্যের আর সীমা নাই। কিন্তু প্রিয়তমের নিকট যাইতে হইলে কিছু উপায়ন (উপহার) লওয়া আবশ্যক। বহুদিন পরে বন্ধুর নিকট যাইতেছি, রিক্তহস্তে কি করিয়া যাই? আহা! ভক্তের ভাবের বলিহারি যাই। যিনি জগৎপতি, তাঁহার জন্য আবার উপহার লইতে ভক্ত ব্যস্ত। ধন্য ভক্ত তোমার ভাব! ধন্য তোমার ভালবাসা! সুদামা, পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! তোমার ইচ্ছায় আমি কৃষ্ণ-দর্শনে যাইতেছি, কিছু খাদ্য দ্রব্য থাকিলে আমাকে দাও —নতুবা শূন্যহস্তে বন্ধুর নিকটে যাইব কেমন করিয়া?" আহা! ভক্তিমান্ সুদামা নিষ্কপট চিত্তে সর্ব্বদাই ভাবে বিভোর। সংসারে কি আছে, কি নাই, পত্নী যে আজ তিন দিন কিছুই আহার করিতে পাইতেছেন না, ইহা কিছুই জানেন না। আর এ দিকে পত্নীও তেমনি সদা-প্রফুল্ল। যদিও আজ ক্ষুধায় কাতরা হইয়াছেন, তথাপি স্বামী-সেবা এবং স্বামীর সুখচিন্তা ভিন্ন অন্য কোন ভাবনাই নাই। বৎস! ইহারই নাম যথার্থ ধর্ম্মপত্নী! এই অবস্থায় সুদামা কিছু চাহিলে, সুদামাপত্নী কি করিলেন, তাহা ভাগবতে বলিয়াছেন,—

অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিৎ গৃহে কল্যাণি দীয়তাং।
যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান্॥
চেলখণ্ডেন তান্‌বদ্ধা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নং।
স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল॥

পতিপরায়ণা সুদামাপত্নী স্বামীর কথার উত্তর না করিয়া, প্রতিবাসী ব্রাহ্মণগণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া, চারি মুষ্টি পৃথুকতণ্ডুল অর্থাৎ চিড়ার খুদ আনিয়া, বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিবার জন্য পতির হস্তে সমর্পণ

করিলেন। ভক্ত সুদামার হর্ষের সীমা নাই—কৃষ্ণচিন্তায়, ভাবি কৃষ্ণদর্শনানন্দের ভাবনায় বিহ্বল হইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল কতক্ষণে শ্রীগোবিন্দ-দর্শন পাইবে, এই চিন্তায়ই সুদামার প্রাণ ও মন পুলকিত। এইরূপে যাইতে যাইতে ক্রমে দ্বারকায় উপনীত। কিন্তু সেখানকার রাজভবন দর্শনে সুদামা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন যে, এখানে কিরূপ ভাবে প্রবেশ করিব? এমন সময় প্রহরীরা ব্রাহ্মণের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিল, "মহাশয়! এখানে ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার। আপনি স্বচ্ছন্দমনে প্রবেশ করিতে পারেন।" সুদামা তখন ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করা সার্থক মনে করিয়া সেই দ্বারকাভবনে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে অনেক কক্ষ অতিক্রম করিয়া, যেখানে কৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর (রুক্মিণীর) সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, সেইখানেই উপনীত হইলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আর কি থাকিতে পারেন? এতক্ষণ জানিয়াও লীলার অনুরোধে স্থির ছিলেন;—এক্ষণে আর থাকিতে পারিলেন না, সিংহাসন ছাড়িয়া বাহুদ্বয় প্রসারিত করতঃ সুদামাকে আলিঙ্গন করিলেন।

উভয়েই উভয়ের ভাবে বিভোর। ভক্ত যেমন শ্রীহরিকে পাইয়া আত্মহারা, ভক্তপ্রাণ শ্রীহরিও প্রিয়তম ভক্তকে পাইয়া আত্মহারা; পরস্পর পরস্পরের ভাবে বিভোর আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত। কিছুক্ষণ পরে সেই রত্ন-সিংহাসনোপরি প্রিয়সখাকে লইয়া কৃষ্ণ উপবেশন করিলেন এবং লক্ষ্মীদেবী চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া অপরাপর সকলে ভাবিতে লাগিল, এই ব্রাহ্মণ না জানি কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, নতুবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ইহাকে অর্দ্ধাসন প্রদান করিবেন কেন?

এইভাবে নানাপ্রকার বাক্যালাপ কৃষ্ণের সহিত হইতেছে। এ দিকে সুদামা খুদের পুটলিটি বগলে লুকাইতেছেন; মনে মনে ভাবিতেছেন যে,

আমি কেমন করিয়া স্বয়ং লক্ষ্মীকান্তকে এই ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করি? সুদামা ভক্ত, তাঁহার সরল হৃদয়ে অভিমানের গন্ধও নাই, তাই তিনি সর্ব্বদাই দীনভাবাপন্ন ও কুণ্ঠিত, আর শ্রীহরিও ভক্তবৎসল, ভক্তের সামান্য জিনিষও তিনি বহু বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই সুদামা লুকাইয়া রাখিলেও অন্তর্য্যামী সকল জানিতে পারিয়া, নানা কথা বলিতে বলিতে বলিলেন, "সখে! অনেক দিন পরে তোমার সহিত দেখা হইল, কৈ, আমার জন্য কি দ্রব্য আনিয়াছ, আমাকে দাও?" সুদামা তখন কি করিবেন, সেই খুদের পুটলি বাহির করিয়া কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণও তাহা হইতে এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং মুখে দিয়া বলিলেন, ভাই! এ যে আমার অতি প্রিয়বস্তু; আমার নিকট ইহা অমৃততুল্য। তুমি এতক্ষণ আমাকে না দিয়া ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলে কেন? তুমি কি জান না যে, প্রীতির সহিত যে যাহা আমাকে দেয়, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি? এই বলিয়া যেমন দ্বিতীয় গ্রাস তুলিতে যাইবেন, অমনি লক্ষ্মী-দেবী হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "নাথ! আপনার প্রীতি-সম্পাদনের প্রতিফল ত্রিজগতেও তুলনা হয় না। সুদামার ভাগ্যের সীমা নাই, ত্রিজগতের ঐশ্বর্য্য দিলেও ইহার প্রতিশোধ হইবে না। আপনি দ্বিতীয় গ্রাস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হউন।" লক্ষ্মীর বাক্যে শ্রীহরি নিবৃত্ত হইলেন। এ দিকে সুদামা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন চলিয়া গেল। কারণ, "সুখের দিন শীঘ্রই কাটিয়া যায়।"

আজ সুদামা গৃহে যাইবেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে-ছেন; কৃষ্ণও ছলছল নেত্রে সখাকে বিদায় দিলেন। সুদামাপত্নী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, সুদামাও তাহা কিছু বলিলেন না, কৃষ্ণও তাহাকে তখন কিছু দিলেন না।

বৎস রসিকচাঁদ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, সুদামার চিত্ত কি উদার, কিরূপ বিষয়ত্যাগী। সুদামা আনন্দে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে গৃহে চলিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ যে আমায় কিছু দেন নাই, ইহা আমার প্রতি তাঁহার প্রেমেরই পরিচয়। কারণ, ধন-মদে মত্ত হইয়া জীব তাঁহাকে ভুলিয়া যায়। পাছে আমি প্রিয়তম কৃষ্ণকে ভুলিয়া বিষয়গর্ত্তে নিমগ্ন হই, তাই গোবিন্দ আমায় বিষয় দিলেন না। আমি বেশ বুঝিলাম, সত্য সত্যই হরি, আমার প্রিয় সখা।

বৎস! একবার ভাব দেখি—কত দূর উন্নত ভাব। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যদি সামান্য কোনও কার্য্য আমরা করি, যদি তাহারও প্রতিদান কিছু না পাই, তবে আমাদের প্রাণ কেমন হয়? আর সুদামা স্বয়ং লক্ষ্মীকান্তকে পাইয়াও এমন দারিদ্র্য-যাতনা ভোগ করিয়া কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া একবার কিছু বলিলেনও না।

যাহা হউক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুদামা স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন যে, যেখানে তাঁহার সেই পর্ণকুটীর ছিল, সেখানে দেবনির্ম্মিত অপূর্ব্ব অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। দেখিয়া ভক্ত, বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া ভাবিতেছেন, আমার গৃহ কোথায়, পতিপরায়ণা সেই পত্নীই বা কোথায়? ভক্ত সুদামা এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখেন, দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় এক রমণী সুবর্ণ থালে পট্টবস্ত্র এবং চরণ প্রক্ষালনার্থ জলকুম্ভ লইয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিতেছেন। তাদৃশ বসন-ভূষণে সুশোভিতা রমণীকে দেখিয়াই সুদামা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' ব্রাহ্মণী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, 'নাথ! আমি আপনার সেই দাসী। শ্রীভগবদ্দর্শনের ফলে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, আর লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় এই সকল বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছি। আসুন, এইবার প্রাণের সাধ মিটাইয়া প্রাণবল্লভ রাধামাধবের সেবা করি।

নাথ! আর আমাদের কষ্ট নাই, দুঃখহারীর কৃপায় আমাদের সকল দুঃখ দূরে গিয়াছে।”

বৎস! পত্নীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ভক্ত সুদামা, প্রেম-বিগলিত নেত্রে করযোড়ে শ্রীগোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—গোবিন্দ! পতিতপাবন! দেখিও নাথ! বিষয়-মদে মত্ত হইয়া যেন তোমাকে ভুলিয়া না যাই। দয়াময়! আমি ত বিষয়-সুখ প্রার্থনা করি নাই। তবে কেন আমায় দিলে? যদি দিয়াছ, তবে এই প্রার্থনা, যেন তোমায় না ভুলি। এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া, পত্নীর সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়া, অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করতঃ শ্রীভগবৎসেবার ফলে অন্তে নিত্যধামে গমন করিলেন।

রসিকচাঁদ! এখন বুঝিলে কি, হরি কি চান্? আর বুঝিলে কি যে, শ্রীহরির নিকট কামনা করা উচিত নয়, নিষ্কাম ভাবে তাঁহার সেবাই জীবের প্রধান ধর্ম্ম?

রসিক।—প্রভো! বেশ বুঝিলাম, এখন বলুন উপাসনা কি প্রত্যহই নিয়মিত ভাবে করা প্রয়োজন?

প্রেমা।—বৎস! শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া, যে ব্যক্তি কেবল আহার-নিদ্রা-পরায়ণ হয়, তাহাতে আর পশুতে কোনই তফাৎ নাই। ঈশ্বরোপাসনা না করিলে আত্মার অধঃপতন হয়। যে ব্যক্তি নিজ কর্ম্মদ্বারা নিজের অধঃপতন সাধন করে, তাহার ন্যায় মহাপাপী আর কে আছে? অতএব শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে প্রতিদিনই নিয়মিত ভাবে ভগবদুপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহাই শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ। বিস্তৃত ভাবে বলিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। যদি কখনও সেরূপ সুযোগ উপস্থিত হয়, হইবে। এক্ষণে বিশ্রাম কর। সমস্ত দিন মোটেই বিশ্রাম হয় নাই। আর তোমাকে একটী কথা বলিয়া রাখি। আমি অদ্য রাত্রেই স্থানান্তরে

যাইব ; সেখান হইতে ফিরিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইবে। আমাকে আশ্রমে না দেখিয়া হতাশ হইও না। আমি সেখানকার কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় তোমার সহিত এইখানেই মিলিত হইব। আমি না আসা পর্য্যন্ত তোমার উপরই এই আশ্রম রক্ষার ভার রহিল।

রসিক।—প্রভো! আপনার দর্শন পাইব না—আপনার অমিয়মাখা বচনাবলী শ্রবণ করিতে পারিব না, ইহা ভাবিয়া যে আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইতেছে। এমন একখানি সৎগ্রন্থ অধমকে দয়া করিয়া দিয়া যান, যাহা পাঠ করিয়া আপনার অদর্শন জন্য দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে দাস কৃতার্থ হয়।

প্রেমা।—বৎস! উত্তম কথা বলিয়াছ। এই লও, এই একখানি গ্রন্থ তোমাকে দিলাম ; তুমি ইহার আলোচনায় নিশ্চয়ই আনন্দ পাইবে।

এই বলিয়া প্রেমানন্দ রসিকচাঁদের হাতে একখানি ছোট গ্রন্থ দিলেন। গ্রন্থখানির নাম আমরা এখনও জানিতে পারিলাম না, পরে জানিতে পারিলে পাঠকগণকে জানাইব।—রসিকচাঁদ গ্রন্থ পাইয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কিছু সময়ের জন্য বিদায় হইলেন।

প্রেমানন্দ দুই এক দিনের কথা বলিয়া রসিকচাঁদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, নানা কারণে তাঁহার শীঘ্র আসা হইল না। এক দিন দুই দিন করিয়া পনের দিন চলিয়া গেল, তবু প্রেমানন্দ আসেন না। একবার যে যাইয়া প্রেমানন্দ কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, দেখিয়া আসিবেন, রসিকচাঁদের তাহাও ঘটিয়া উঠে না। কেন না, প্রেমানন্দ আশ্রম রক্ষার ভার তাহার উপর দিয়াগিয়াছেন ; তাই সে আর কোথাও যায় না। প্রেমানন্দের আদেশে তাঁহার প্রদত্ত গ্রন্থ লইয়া রসিকচাঁদ দিন কাটাইতে লাগিলেন।

( ৮ )

আজ বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। যদিও মাঘ মাস, তথাপি রৌদ্র খুব জম্‌কাল ভাবেই প্রকাশ হইয়াছে, রাস্তা-ঘাট সব জন শূন্য। তবে মধ্যে মধ্যে রাখাল বালকগণের হে—রে—রে—রে শব্দে স্তব্ধজীবের চমক ভাঙ্গিতেছে। এমন সময়—প্রকৃতিদেবীর এই গম্ভীর ভাবে অবস্থান সময় কোথা হইতে একখানি নৌকা আসিয়া নদীতীরে লাগিল। নদীর অদূরেই প্রেমানন্দের কুটীর ছিল। ঐ কুটীরে বসিয়া প্রেমানন্দের আগমন আশায় রসিকচাঁদ সকাল হইতে পথপানে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ নদীতীরে একখানি নৌকা লাগিল, রসিকচাদ উঠিয়া দেখিলেন, নৌকার ভিতর হইতে একজন গৈরিকবসনধারী মহাপুরুষ বাহির হইলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, তাঁহার পরমদয়াল শ্রীগুরুদেব। রসিকচাঁদ অমনি ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, ভক্তি-ভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার সঙ্গে কুটীরে ফিরিলেন।

আজ রসিকচাঁদের বড়ই আনন্দ। আনন্দে অধীর,বালস্বভাব, সদাপ্রফুল্ল রসিকচাঁদ নিণিমেষ নয়নে প্রেমানন্দের সহাস্য বদনকমল দর্শন করিতেছেন, কিছু কাল কোন কথাই নাই। পরে প্রেমানন্দ স্নেহস্বরে বলিলেন, 'বৎস! তোমার শারীরিক কুশল ত?'

রসিক।—প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সমস্তই মঙ্গল। আপনি স্থানান্তরে যাইয়া শারীরিক কুশলে ছিলেন ত? আমার প্রাণ আজ কয় দিন যাবৎ বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, একবার যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব। গুরুদেব! এত বিলম্ব হইবার কারণ কি?

প্রেমা।—বৎস! সে স্থানের লোকের আগ্রহবশতঃই এত বিলম্ব

হইয়াছে। আমার এখনই কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তুমি একটু বাহিরে অপেক্ষা কর। আমি কিছু সময় পরেই বাহিরে আসিব।

এই বলিয়া প্রেমানন্দ কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর রসিকচাঁদ ইত্যবসরে বাহিরে বসিয়া প্রেমানন্দ-প্রদত্ত পুস্তকখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। যে স্থানটি পাঠ করিতেছিলেন, সেখানে নিম্নলিখিত উপদেশ কয়টি লেখা ছিল। আমরাও পাঠকগণের অবগতির জন্য সে কয়টি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

১। পরনিন্দা করিবে না। পরনিন্দা দ্বারা যেরূপ চিত্ত মলিন হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। শাস্ত্র বলেন—নিন্দনীয় ব্যক্তিরও নিন্দা করা পাপ। যে মন্দ কর্ম্ম করে, তাহার যেরূপ পাপ হয়, যে বিষয় আলোচনা করে, তাহাকেও সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়

২। শাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্যে কখনও অশ্রদ্ধা করিবে না। শাস্ত্র ও ভগবান্ অভিন্ন; সুতরাং শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করিলে ভগবানেই অশ্রদ্ধা করা হয়। ঋষিগণ পরমেশ্বরের আরাধনায় শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারই আদেশে জীবের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্রবাক্যরূপ ঋষিবাক্য অবহেলা এবং ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন একই জানিবে।

৩। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য আপাততঃ ভাল লাগিলেও তাহা করিবে না। কারণ, নিশ্চয় জানিবে যে, উহার পরিণাম অতিশয় দুঃখময়। নতুবা ত্রিকালজ্ঞ মহাজনগণ নিষেধ করিবেন কেন?

৪। প্রাণিহিংসা করিবে না। হিংসা করা যে মহাপাপ, তাহা সকল ধর্ম্মেই বলিয়াছেন। যে জীবহিংসা করে, সহস্র চেষ্টায়ও তাহার ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। ইহা নিশ্চয় জানিবে।

৫। হিংসাকারীকে কোমলমতি শিশু, এমন কি, বনের পশু-পক্ষিগণও

বিশ্বাস করে না। হিংসুকের চিত্ত দিন দিন এত সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে, বিনা স্বার্থে কিংবা স্বল্প প্রীতির অনুরোধেও অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া, ইহকালে লোকের নিকট নিন্দনীয় ও অবিশ্বাসী হয় এবং পরকালেও ঘোর অশান্তিময় নরক ভোগ করে।

৬। অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। মানুষকে পশুতুল্য করিতে অসৎসঙ্গের মতন আর দ্বিতীয় কিছু নাই। এরূপ অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এক পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াও সৎসঙ্গগুণে একজন দেবোপম-চরিত্র হইয়া জগতের আদর্শ হইয়াছেন, আর অসৎসঙ্গের ফলে আপাতরম্য সুখে প্রমত্ত হইয়া অপর জন নরকের কীটসদৃশ অস্পৃশ্য বলিয়া লোকের নিকট ঘৃণার্হ হয়। সতের সঙ্গগুণে অসৎও সৎ হইয়া যায়, আবার অসতের প্রলোভনে মজিলে কুল, মান, বিদ্যা-বুদ্ধি, সকলই লোপ পাইয়া যায়। "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ" এই প্রবাদ সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।"

এই ভাবে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ প্রেমানন্দের আহ্বানে রসিকচাঁদ কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

পাঠকগণ! দুই প্রেমপাগলের বহুদিন ছাড়াছাড়ির পর মধুর মিলনের সংবাদ আশ্রমের মধ্যেই থাকুক, আমরাও এইখানে একটু বিশ্রাম লইলাম।

( ৯ )

আজ শ্রীপঞ্চমী গ্রামের বালকগণ রসিকচাঁদের খুবই অনুগত হইয়াছে, বৃদ্ধেরা যদিও বালকগণকে পাগল রসিকের সঙ্গে মিশিতে দিতে চায় না তথাপি তাহারা রসিক চাঁদকে লইয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে ছাড়ে না। আজ সমস্ত দিন বালকগণের সঙ্গে আনন্দ করিয়া সন্ধ্যার পর

কয়েকজন বালক সঙ্গে লইয়া রসিকচাঁদ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। এদিকে প্রেমানন্দও প্রচুর ফল মিষ্টান্নাদি সাজাইয়া বসিয়া যেন ইহাদেরই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কীর্ত্তন সম্প্রদায় নিকটে আসিলে প্রেমানন্দ যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক বসিতে আদেশ করিলেন। সকলে বসিলে রসিক চাঁদকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমানন্দ বলিলেন—বৎস! সমস্তদিন তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি; কোথায়—কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলে?

রসিক।—প্রভু! এই সকল ছেলেরা কিছুতেই আজ ছাড়ে নাই, প্রতিমা আনিয়া দেবীর পূজার আয়োজন করিয়াছিল, আমিও ইহাদের আগ্রহ দেখিয়া আসিতে পারি নাই, সন্ধ্যার পর দেবীর আরত্রিকাদি সারিয়া আসিতে বিলম্ব হইল।

প্রেমা।—বেশ বেশ, খুবই আনন্দের কথা। বালকগণের মধ্যে যে সৎ ইচ্ছা জাগিয়াছে তাহাতে পরিণাম ভালবলিয়াই মনে হয়। সকলকে সৎপথে চালিত করিয়া জীবন মধুময় করিতে পারিলেই মঙ্গল।

রসিক।—আপনার আশীর্ব্বাদ। দেব! আপনার সঙ্গে দেখা হইলেই আমার কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ইচ্ছা হয়। কত অমৃতময় উপদেশ দিয়াছেন, যতই শুনিতেছি ততই যেন নূতন নূতন প্রশ্নের উদয় হইতেছে ইহার কারণ কি?

প্রেমা।—বৎস! ইহা জ্ঞানেরই স্বভাব। জীব যতদিন অজ্ঞথাকে অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় জানে না ততদিন মনে ভাবে আমি যাহা জানিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, আমার আর কিছু জানিবার বা বুঝিবার নাই। কিন্তু বাবা! শাস্ত্র বাক্য শ্রবণে হৃদয়ের অন্ধকার যেমন যেমন দূর হইতে থাকে, জ্ঞাতব্য বিষয়ও সঙ্গে সঙ্গে বহু হইয়া পড়ে। সাধু মহাত্মা বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি পাইলেই মনের সন্দেহ মিটাইতে চায়। তোমার অবস্থা তাই

হইয়াছে। সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই, মনে যে সন্দেহ জাগিয়াছে অকপটে বল। শ্রীগুরু কৃপায় যতটুকু জানি বলিব।

রসিক।—দেব! যদি অভয়ই দিলেন তবে বাসনা পূর্ণ করুন। মনে একান্ত বাসনা জাগিয়াছে যে, আপনার শ্রীমুখে শুনি—কি কি কারণে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য·এই ছয় রিপু বৃদ্ধি হয়, আর কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারাইবা উহা প্রশমিত হয়?

প্রেমা।—বৎস! অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ কিন্তু বিষয়টী অতি বিস্তৃত। এক একটীর বিষয় এক এক দিন বলিলেও শেষ হয় না। যাহা হউক তোমার আগ্রহে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করি। প্রথম কাম, সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"সঙ্গাৎ স্ত্রীভির্মিথো বাসাৎ শরীরস্যাতিপোষণাৎ।
রজোগুণান্বিতাহারৈর্ভবেৎ কামো মহান্ রিপুঃ॥"

কাম বলিতে কিন্তু বিষয় বাসনা এবং ইন্দ্রিয় প্রীতি এই দুইটীকেই আমি বলিতেছি। ইহার উদ্ভব হইবার কারণ হইতেছে—বিষয়েতে চিত্তের অভিনিবেশ অর্থাৎ একান্ত আসক্তি বশতঃ এবং একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত বহুসম্ভাষণ ও অবস্থান কিম্বা স্ত্রীলোকের রূপগুণাদির বিষয় চিন্তা করা। রজোগুণান্বিত দ্রব্য আহার করিয়া যাহারা শরীর পোষণে যত্ন করে তাহাদেরই কামরিপু প্রবল হইতে দেখা যায়।

সংসর্গেণ চ সাধুনাং যোষিৎ সঙ্গ বিবর্জ্জনাৎ।
দুর্জ্জয়ঃ সংজিতঃ কামো দেহাশুদ্ধি বিচারণাৎ॥

অর্থাৎ সাধু লোকের সঙ্গগুণে এবং তাঁহাদের জীবনী আলোচনা দ্বারা চিত্তকে স্থির রাখিয়া একান্তে স্ত্রীলোকের সহিত বসবাস কিম্বা হাস্য পরিহাসাদি পরিত্যাগ করিলে এবং সর্ব্বদাই দেহের নশ্বরতা ও অশুচি ভাব চিন্তা করিলে অর্থাৎ এই দেহে রক্ত, মাংস, পুঁজ প্রভৃতি ঘৃণ্য দ্রব্য রহিয়াছে

এইভাব চিন্তা করিলে দুর্জ্জয় কাম রিপু পরাজয় হয় বলিয়াই সাধুগণ বলিয়া থাকেন। এইবার ক্রোধ সম্বন্ধে বলিতেছি—

রজোগুণাৎ ভবেৎ ক্রোধঃ ॥

ক্রোধ অতিশয় অনিষ্টকারী, ক্রোধের বশীভূত জীবের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা থাকে না, অনায়াসে ক্রোধের উত্তেজনায় মানুষ এমন কার্য্য করিয়া ফেলে, যাহার জন্য পরিণামে ঘোরতর অনুতাপ ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া দুঃখ পায় ঐ ক্রোধ রজোগুণোদ্ভূত অভিমান বশতই হইয়া থাকে। আমি শ্রেষ্ঠ বা ধনী কিম্বা বলবান সুতরাং আমি যাহা চাই তাহাই হউক এই ভাবে যাহার অভিমান বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহার অভিমানের বিপর্য্যয় হইলেই ক্রোধের উদয় হয়।

সুখদুঃখাদিকং সর্ব্বং আত্মনঃ কর্ম্মণৈর্বহি।
জায়তে চেতি সংচিন্ত্য তং ক্রোধং পরিবর্জয়েৎ ॥

ক্রোধ হইতে বহু অনিষ্ট হয়, ক্রোধ হইতে পাপ ও বিপদ আসে এই ভাবিয়া এবং শুভ, অশুভ, ভাল, মন্দ, সম্পদ, বিপদাদির দাতা কেহই নয়, জীব আপন কর্ম্মফলই ভোগ করে এই ভাবিয়া কেহ অনিষ্ট বা কটু বলিলে উহা আমার নিজকৃত পাপের ভোগ ইহা মনে করত বলবান ক্রোধকে জয় করিবে। তারপর লোভ।—

বিষয়েন্দ্রিয়নিত্যত্বজ্ঞানাৎ লোভঃ প্রজায়তে।
রিপুনাং কারণং লোভঃ শরীরস্থো মহান্ রিপুঃ ॥

বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সকল নিত্য এই জ্ঞানেতেই লোভের উৎপত্তি হয়, লোভ বশতঃ জীব নিষিদ্ধকর্ম্ম, নিন্দনীয় ও দুঃখপ্রদ আহার বিহার করিয়া থাকে, লোভ হইতেই সকল রিপুর জন্ম হইয়া থাকে, লোভই শরীরস্থ মহান্ শত্রু।

বস্তুতত্ত্ব বিবেকেন চিত্তশুশুচি চিন্তয়া।
লোভাৎ পাপংততোমৃত্যুং জ্ঞাত্বালোভং বিনির্জয়েৎ ॥

বস্তুর নিত্যতা ও অনিত্যতা এবং শুচি ও অশুচি ভাব চিন্তা দ্বারা চিত্তের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্য যত্নবান হওয়া এবং লোভ হইতেই অধর্ম্ম, অধর্ম্ম হইতেই নানাবিধ রোগাদির উদ্ভব এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হয় এই সকল পর্য্যালোচনা করিতে করিতেই লোভ ক্রমে দমন হয়।

বৎস! আমি কিন্তু খুব সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, এক একটী বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে গেলেই বহু সময় দরকার। এক্ষণে কেবল রিপু উদ্বুদ্ধ হইবার কারণ এবং দমন করিবার কারণ সংক্ষেপে বলিয়া রাখি পরে এক একটী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী সম্বন্ধে বলিয়াছি এক্ষণে মোহ সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর। মোহ অজ্ঞানেরই স্বরূপ। তমো গুণান্বিত আহার বিহারে মোহের উৎপত্তি হয়। আমার গৃহ, আমার ধন, আমার পরিজন ইত্যাকার আমার আমার ভাবের প্রাবল্যই মোহের পরিচায়ক। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানাৎ মমতাভ্যাসাৎ মোহঃ সংজায়তে হৃদি।"

মোহমুগ্ধ জীবের হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না, দেহাদির পরিবর্ত্তন ও আমার বলিয়া যাহাকে অতিশয় ভালবাসে তাহার স্নেহ-শূণ্যতা দেখিয়াও মনকে সেই আসক্তি হইতে ফিরাইতে পারে না সুতরাং অতিশয় কষ্ট পায়।

এমন যে দুর্জ্জয় রিপু ইহার দমন শুধু মুখের কথায় হয় না। বেশ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাইতে হয় যে, একমাত্র শ্রীভগবানই নিত্য বস্তু, তৎভিন্ন আর সকলই অনিত্য এই ভাবিয়া আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভাব চিন্তায় চিত্ত সত্বগুণ প্রধান হইলে মোহ দূর হয়। মোট

কথা কিছুই আমার নয়, আমিও আমার কর্ত্তৃত্বে চলিতে বা বলিতে পারি না সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অপার করুণা এইরূপ ভাব সর্ব্বদার জন্য প্রাণে বদ্ধমূল রাখিতে পারিলেই মোহ জয় হয়।

রসিক।—প্রভো! শাস্ত্রের উপদেশ শুনিতে তো খুব সহজ, কিন্তু এক একটী পালন করিতে যে, একেবারে অস্থির হইতে হয়। এই যে আমাকে একেবারে ভুলিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন ইহা কি সম্ভব হয়?

প্রেমা।—বৎস! সম্ভব সকলই হয়, শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন কোনটীই অসম্ভব বা অসাধ্য নয়। আমরা গোড়া হইতে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছি বলিয়া এখন কোন কিছু করিতে হইলেই ভয় পাই, যদি বাল্যকাল হইতে এই ভাবের শিক্ষা আমরা পাইয়া আসিতাম তাহা হইলে এখন এ সকল শুনিয়া আমাদের ভয় হইত না। বাল্যকালে আমরা তুচ্ছ আমোদ প্রমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া এ সকল চিন্তা মনেই আনি নাই কাজেই এখন অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছি। এখন মদ রিপু সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন শুন।—

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তো জনো মত্তোভবেৎ সদা।
"অহং মহাত্মা ধনবান মত্তুল্যঃ কোঽস্তি ভূতলে।
ইতি যজ্জায়তে চিত্তং মদঃ প্রোক্তঃ স কোবিদৈঃ॥"

রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণের আধিক্য বশতঃ তমোগুণ প্রধান আহার বিহারে মদের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার মদের স্বরূপ। আমি মহাত্মা, আমি ধনবান, আমার সদৃশ আর কে আছে ইত্যাকার চিত্তবৃত্তিই মদের পরিচায়ক; অহঙ্কারী জীব পাপী হইতেও নিকৃষ্ট। কেন না পাপীর প্রতি দয়ালু ভক্তগণ কৃপা করিয়া থাকেন ভক্তের কৃপায় পাপীর সঞ্চিত পাপ দূর হয় অধিকন্তু পুনরায় পাপ প্রবৃত্তিও আইসে না কিন্তু অহঙ্কারী নিজেকে জগতের সকল লোক অপেক্ষাই উচ্চ মনে করিয়া কাহারও সঙ্গ

করে না, কাজেই উত্তম সঙ্গের অভাবে চিরকাল দুঃখ কষ্টই পাইতে থাকে।

সঙ্গ মাহাত্ম্য তোমাকে পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি, বোধহয় স্মরণ আছে।

"সদ্বৃত্ত সন্নিকর্ষোহি ক্ষণার্দ্ধমপিশস্যতে।"

অর্থাৎ সাধুর সহিত, সৎভাবাপন্ন ব্যক্তির সহিত ক্ষণার্দ্ধকাল অবস্থানেও অতীব শ্রেয়ঃ ভাব লাভ হইয়া থাকে। কাজেই যে অহঙ্কারী সে ত কিছুতেই নিচু হইবে না সুতরাং মহতের কৃপা তাহার লাভ হইবে কি করিয়া? বুদ্ধিমানগণ শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করিয়া—

অনিচ্ছতোহপি দুঃখাদি রায়াতি যাতি নিত্যশঃ।
এবং বিবেকতো বুদ্ধা মদং বধীমান বিনির্জয়েৎ॥

ইচ্ছা না থাকিলেও দুঃখাদি আসিতে ও যাইতেছে আজ যে ধনবান অভিমানী অল্প সময় পরেই তাহাকে নির্ধন হইতে দেখা যায়, এই সকল বিচার করিয়া, এবং দেহেন্দ্রিয়াদির প্রতি পলে পলে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, সুতরাং জীবের কোন বিষয়েই ক্ষমতা নাই, এই সকল ধারণা রাখিয়া অহঙ্কারকে জয় করিবে। তারপরে সর্ব্বশেষ রিপু মাৎসর্য্য সম্বন্ধে বলি—

পরোৎকর্ষে দুঃখভাবঃ মাৎসর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং
দুঃসঙ্গাৎ জায়তে তত্তু তমসো রজসান্বিতাৎ।

পরের উন্নতি ও সুখে ঈর্ষাভাবই মাৎসর্য্যের লক্ষণ। এই মাৎসর্য্য রজোগুণ মিশ্রিত তমোগুণের কার্য্য, অসৎসঙ্গ হইতে অজ্ঞানের আধিক্য হইতেই ইহার উৎপত্তি হয়।

মাৎসর্য্য জীবের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যথিত করে, মাৎসর্য্যবান ব্যক্তি কপট ও কুটিল হইয়া থাকে।

জীবানাং সুখদুঃখস্য ধাতারং শ্রীহরিং ধিয়া
বিচিন্ত্যান্তশুভদ্বেষং মাৎসর্য্যং চ বিনির্জয়েৎ॥

মাৎসর্য্য জয় করিতে হইলে কেবল শুভাশুভ কর্ম্ম বিধাতা শ্রীহরির এবং আপন কর্ম্ম বলেই জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, কেহ কাহাকেও সুখী বা দুঃখী করিতে পারে না, এইটী সর্ব্বদা ধারণা করিতে হয় তাহা হইলেই মাৎসর্য্য ভাব দূর হয়। বৎস! ষড়রিপু দমনের পন্থা সংক্ষেপে তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে এই সকল বিষয় বেশ চিন্তা কর পরে আবশ্যক মত আরও বলিব। এই সম্বন্ধে তোমার কিছু সন্দেহ থাকিলে বল।

রসিক।—দেব! ষড়রিপুর উৎপত্তি ও দমনের বিষয় যাহা আপনার নিকট শুনিলাম আশীর্ব্বাদ করুন যেন নিজ জীবনে তাহা পালন করিতে পারি। এক্ষণে আমার এ বিষয় আর একটু জানিবার বাসনা হইয়াছে, যদি আদেশ করেন তবে বলি।

প্রেমা।—বৎস! বেশ বুঝিতেছি তোমাদ্বারা এই সকল বিষয় প্রচারিত হইয়া জীব জগতের অশেষ কল্যাণ হইবে, তুমি তোমার যাহা বক্তব্য থাকে অকপটে আমাকে বল।

রসিক।—প্রভু! এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রিপু সকল দমিত হইয়া কি প্রকার ভাবে উহারা সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির দেহে অবস্থান করে। উহারা কি থাকে, না একেবারেই মরিয়া যায়?

প্রেমা।—বৎস! ঠিক উপযুক্ত প্রশ্নই করিয়াছ, যেটীর পর যেটী বলা দরকার, ভগবান তোমার মুখ দিয়া সেইটীট বাহির করিয়া দিতেছেন। বলিতেছি একটু স্থির ভাবে শুন।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে কমাদি থাকে বটে কিন্তু তাহাদের খুব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। প্রথমতঃ উহারা আর স্বাধীন ভাবে জীবকে পরিচালনা করিতে পারে না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে প্রয়োজন মত নিজ কার্য্য করে। গৃহস্থ মুনিঋষিগণ এইভাবে রিপুগণকে নিজ বসে রাখিতে পারিতেন বলিয়াই তাহারা স্ত্রীপুত্র গৃহ বিত্তাদির মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে থাকিতেন। শাস্ত্র-বিধিমত সংসার করিতেন; রিপুর উত্তেজনায় কাতর হইতেন না।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"


২৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | ভক্তি — ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | চৈত্র ১৩৩৬


# শ্রীপাদ কেশব ভারতীর স্মৃতিপূজা।

( শ্রীপাট দেনুড়ে আবির্ভাব-মহোৎসব সভায় পঠিত। )

বাঙ্গলার এক মহাগৌরবের পরিচায়ক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পরমাদরের পুণ্যতীর্থ এই দেনুড়ের ভারতী ভবনে আজ আবার আমরা একটি বর্ষ পরে মিলিত হইয়াছি। আনুমানিক ৪৭০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে আজিকার এই দিনে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই এই স্থান বৈষ্ণবের এক মহাতীর্থ এবং এই দিন বৈষ্ণবের পক্ষে চিরস্মরণীয়। সেই মহাপুরুষের মহাপুণ্যময় স্মৃতি-পূজার উৎসবে আজ আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি।

এই পুণ্যস্মৃতির স্মরণে আমাদের আবশ্যকতা আছে। আছে বলিয়াই আমরা প্রতি বৎসর ভারতী প্রভুর স্মৃতিপূজার এই আয়োজন করিয়া থাকি। আমরা অবশ্যই জানি—শুধু আমরা কেন—বাঙ্গলা দেশের এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষের সবাই হয় তো জানে যে, কেশব ভারতীর স্মৃতিপূজার জন্য নূতন করিয়া কোনও আয়োজন করিবার প্রয়োজন

হয় না। যেহেতু ভারতী প্রভুর মহামহিমময়ী পূত স্মৃতি জগতের ধর্ম্মক্ষেত্রে চির জাগ্রত হইয়াই রহিয়াছে। তথাপি এই নির্দ্দিষ্ট দিনে এইরূপ বিশিষ্ট ভাবে প্রভুর স্মৃতিপূজা করিতে হয়। কেন হয় তাহা ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথি বৎসরের মধ্যে অনেকগুলিই হয়, কিন্তু রামনবমী একটা বই দুটা হয় না। ঐ নবমীটী মাত্র শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিপূজার জন্যই নির্দ্দিষ্ট। তাই ঐ নবমীটার বিশেষভাবে নামকরণ হইয়াছে,—রামনবমী। কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি আরও অনেক থাকিলেও ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী যেমন জন্মাষ্টমী নামে অভিহিত এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূজার জন্যই নির্দ্দিষ্ট;—সেইরূপ রাধিকার স্মৃতিপূজার জন্য রাধাষ্টমী, শ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতিপূজার জন্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা প্রভৃতি এক একটী বিশিষ্ট তিথি। বিশিষ্ট ভাবে স্মৃতিপূজার জন্যই নির্দ্দিষ্ট,—সেই অসাধারণ তিথিতেই সেই মহাপুরুষের বিশিষ্টভাবে স্মৃতিপূজা করিতে হয়। ইহা একটা জাগতিক বিধান। সেই জন্যই জন্মাষ্টমীর দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষভাবে স্মৃতিপূজা করিতে হয়। সেইরূপ রামনবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের, রাধানবমীতে শ্রীরাধার, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের এবং অদ্যকার এই পুণ্যতিথিতে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভুর বিশিষ্টভাবে স্মৃতিপূজা করিতে হয়।

মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার খুবই আবশ্যকতা আছে। ব্যক্তিত্ব এবং জাতীয়তা উভয়ের দিক দিয়াই ইহার ফলে প্রভূত উপকার হয়। তার উপর যদি আবার এইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং বিশিষ্টভাবে তাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ব্যক্তি বা জাতি যে ফল লাভ করে তাহা অতুলনীয়। এইভাবে মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার ফলে আপনহারা ব্যক্তি আত্মস্থ হয়, অধঃপতিত মোহগ্রস্ত জাতির চৈতন্যশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া

উঠে। দুঃখের শত আঘাত সহিয়া, দুর্দ্দশার সহস্র দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া, দুর্ভাগ্যের বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া অথবা পরদাসত্বের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ব্যক্তি বা জাতি যখন দুর্ব্বহ জীবনভার বহনে কাতর হইয়া পড়ে; তখন মহাপুরুষগণের মহনীয় কীর্ত্তির স্মৃতিই তাহার ব্যর্থ জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনার উপায় বিধান করিয়া দেয় এবং ব্যক্তি বা জাতির বিভ্রান্ত চক্ষুর সম্মুখে আশার আলোক জ্বালিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে।

শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভু আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহা কি আমাদের বাঙ্গলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির কম গৌরবের কথা? তাঁহার এই স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠানটাও কি আমাদের সামান্য আশা-আশ্বাসের বিষয়? তিনি কিরূপ মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা যখন আমরা চিন্তা করি এবং সে হেন মহাপুরুষ আমাদের এই জাতির মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া যখন আমরা মনে করি; তখন কি গৌরবে আমাদের বক্ষঃ স্ফীত হইয়া উঠে না? আজ এই বাঙ্গালী জাতি আমরা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও বিড়ম্বিত হইলেও সেই অতীত দিনে আমাদের এই জাতি হইতেই উদ্ভূত সেই মহাপুরুষের মহিমাময় কীর্ত্তিস্মৃতি যখন ধ্যান করি, তখন কি আমরা বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দশার সান্ত্বনা পাই না? তখন কি আমাদের এই হতাশ জীবনে আবার আশার আলোক জ্বলিয়া উঠে না? যখন আমরা মনে করি যে, আমরা বাঙ্গালী এবং শ্রীপাদ কেশব ভারতীও ছিলেন এই বাঙ্গালী;—তখন কি বাঙ্গালীত্বের গৌরবে আমরা আমাদিগকে ধন্য মনে করি না? আজ আমাদের জাতির সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিপূজার দিন; আমরা সেই পুণ্য স্মৃতির পূজা করিতে এখানে মিলিত হইয়াছি।

শুধু বৈষ্ণব বলিয়া নয়। বৈষ্ণব ত এই পুণ্যস্মৃতির পূজা করিয়াই থাকে। ভারতী প্রভু সমগ্র বাঙ্গালীরই গৌরব। সুতরাং তাঁহার এই স্মৃতিপূজা বাঙ্গালীর একটী জাতীয় উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। যেহেতু তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস-জীবনে বাঙ্গালীর জাতীয়তার দিক দিয়া কি করিয়া গিয়াছেন, সেইটুকু বুঝিতে পারিলেই তদীয় সন্ন্যাসগুরু এই ভারতী প্রভুর মহিমার কথা এবং তাঁহার স্মৃতিপূজার প্রয়োজনীয়তা বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনে উপলব্ধি হইবে।

এস্থলে সংক্ষেপে সেই কথা একটু বলিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা ভগবদ্বিশ্বাসী, শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বে যাঁহারা বিশ্বাসবান্, যাঁহারা ভক্তিমার্গের উপাসক,—সেই সকল মহাজনগণের জন্য এ কথা নয়। তবে যাহারা দেশের কথা লইয়াই থাকেন এবং জাতীয়তা প্রভৃতির আলোচনা করেন; মাত্র সেই সকল দেশপ্রেমিক মহোদয়গণকেই আমি এই কথা বলিতে চাই যে, আজ দেশের যে সকল জটীল সমস্যার কোনরূপ সমাধান করিতে না পারিয়া তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব স্বকীয় সন্ন্যাসজীবনে বহুদিন পূর্ব্বে সেই সকল সমস্যার সুন্দররূপে সমাধান করিয়া গিয়াছেন। দেশের আভ্যন্তরীন্ গঠনমূলক কার্য্যই এখন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া এতদ্দেশের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল্ মণীষিগণও মত প্রকাশ করিতেছেন; অথচ সে গঠনের কার্য্য তেমনভাবে অগ্রসর হইতেই পরিতেছে না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বহুদিন পূর্ব্বে এই সকল গঠন মূলক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। শুদ্ধিসংগঠন, জাতিগঠন, পথের দাবীরক্ষা, স্বাধিকার বজায়, অহিংস মন্ত্র প্রচার অথবা অসহযোগ, সত্যাগ্রহ যে দিকেই দেখা যায়, সকল

দিক দিয়াই কার্য্য করিয়া তিনি দেশের মধ্যে এক অখণ্ড জাতীয়তার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বাপর-কলির সন্ধিক্ষণে যখন কুরুক্ষেত্রে মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, ভারতের সেই ভয়াবহ দুর্দ্দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবে ভারতের জাতীয় জীবন-তরীর কর্ণধাররূপে থাকিয়া অসামান্য রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, এই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও সেদিন তেমনিভাবে বাঙ্গালাদেশকে বাঁচাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষা করিয়া স্বকীয় অলোকসামান্য রাজনীতিকুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও শ্রীচৈতন্যের জীবন বর্ত্তমানে অস্মদ্দেশের রাজনীতিকের আদর্শ হওয়া উচিত।

আমার মনে হইতেছে, এ প্রসঙ্গ অনেকের পক্ষে ভাল লাগিবে না। প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রাজনীতিকের আসনে দেখাইতে গিয়া আমি বোধ হয় ভক্তগণ সমীপে অপরাধী হইয়াছি। আমার ভয় হইতেছে। তাই আমি কৃপাময় ভক্তগণের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, এ প্রসঙ্গ তাঁহাদের জন্য নহে। যাহারা রাষ্ট্রনীতিটাকে সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন এবং রাজনীতি ব্যতীত অন্য কিছু মানিতে চাহেন না, তাঁহাদের জন্যই এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম এবং তাহাদিগকে এই কথাই বলিতে চাই যে, তাঁহাদেরও একমাত্র আদর্শ ঐ মহাপ্রভুর জীবন।

রাষ্ট্রনীতির আলোচনাই দেশের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের একমাত্র কাম্য হইলেও তাঁহারা কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথোপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিতেছেন না। অথচ এই শ্রীচৈতন্যদেব একদিন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাফল্য লাভ কিরূপে হয় তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। রাজনীতির আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে

আর বেশী কিছু বলিব না। তবে যে সকল দেশপ্রেমিক রাজনীতি ভিন্ন বর্ত্তমানে অন্য কিছু আলোচনা করিতে চাহেন না এবং তাঁহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে বলিয়া কেশবভারতী প্রমুখ মহাত্যাগী সন্ন্যাসীর কথায় থাকা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্যই প্রসঙ্গতঃ এইটুকু বলিলাম।

শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য, লোকশিক্ষা বা বিশ্বের হিতসাধন। যে যুগে যেমনটী প্রয়োজন, সেই যুগে সেই ভাবেই তিনি অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়া এই বিশ্বহিত সংসাধন করিয়া থাকেন। যুগে যুগে তিনি এমনই করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যাবতারে তিনি প্রেম বিলাইতে আসিয়াছিলেন। প্রেমের অবতার, কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিতপাবনরূপে তিনি জগতের জীবকে, সমগ্র পাপী তাপী-পতিতকে তরাইতে আসিয়াছিলেন। ফলকথা তাঁহার অবতারত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল ঐ সন্ন্যাসজীবনে। গৃহস্থাশ্রমে নয়। তাঁহার অবতারত্বের যাহা কিছু লীলা, সকলই ঘটিয়াছিল সন্ন্যাসাশ্রমে। রাষ্ট্রনীতি বল, ধর্ম্মনীতি বল, নাম প্রচার, পতিতোদ্ধার যাহা কিছু বল সমস্ত লীলাই বিকাশ পাইয়াছিল সন্ন্যাসাশ্রমে। গৃহস্থাশ্রমে যিনি মাত্র শচীমাতার স্নেহের দুলাল, সন্ন্যাসাশ্রমে তিনিই যে বিশ্বমাতার সার্থক বীর তনয়। গৃহস্থাশ্রমে যিনি ছিলেন নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত, সন্ন্যাসাশ্রমে তিনিই হইলেন সারা বাঙ্গলার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। গৃহস্থাশ্রমে থাকিবার সময় লোকে যাহাকে জানিত একজন অসামান্য প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং একজন পরম ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সন্ন্যাসী হওয়ার পর সেই তাঁহাকেই লোকে দেখিল, ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু। যে সন্ন্যাসজীবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বের যথার্থ বিকাশ; সেই সন্ন্যাসধর্ম্মে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন,—এই শ্রীপাদ কেশবভারতী প্রভু।

এ স্থলে একটা কথা আমরা মনে করিতে পারি যে, ভগবানের আবার গুরু কি? কিন্তু শ্রীভগবান যখন লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই অবতাররূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে আবির্ভূত হন তখন তাঁহারও অবশ্য গুরুর প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভগবানের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যই হইল,—লোকশিক্ষা। মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনি যে মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন, তাহার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ অথবা মনুষ্যজীবনের চরমাদর্শ প্রদর্শন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি ধরাতলে আসিয়া মনুষ্যের মধ্যে আবির্ভূত এবং মানুষেরই মত সুখদুঃখাদির অধীন হইয়া পড়েন। মানব জীবনের লীলা দেখাইতে আসিয়া সেই মায়াতীত মায়াধীশকেও তাই মানুষের মতন মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়িতে হয়। লোকশিক্ষার জন্যই যখন তাঁহার অবতার গ্রহণ, তখন সেই লৌকিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাকে গুরু গ্রহণও করিতেই হইবে। তাই ভক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে গুরুর নিকট যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল এবং সেই দীক্ষার গুরু তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন,—এই কেশব ভারতীকে। লৌকিক বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান যে শ্রীপাদ ভারতী প্রভুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রভুপাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহা সত্য কথা। কিন্তু এ কথাও ত ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিশ্বহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসদীক্ষা তিনি কেশবভারতীর নিকট লইতে গেলেন কেন? দেশে ত আরও লোক ছিল! আর কাহারও কাছে তিনি যান নাই কেন? ইহাতে কি মহাপ্রভুই আমাদিগকে বুঝাইতেছেন না যে, বিশ্বহিত-সাধন মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষাপ্রদানের যোগ্যতা দেশের মধ্যে এক কেশব ভারতী ব্যতীত আর কাহারও ছিল না? ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে

পারে যে, ভারতী প্রভু কিরূপ মহাপুরুষ ছিলেন। সে হেন মহাপুরুষের অলৌকিক মহিমার কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। আজ সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিপূজার দিন। সেই স্মৃতিপূজা আমরা করিতে আসিয়াছি। আমাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে?

আবার বলি এ হেন মহাপুরুষের স্মৃতিপূজা আবার নূতন করিয়া করিব কি? ওই ত দেখিতেছি, গগনে-পবনে অণুক্ষণই কেশবভারতীর নাম ধ্বনিত হইতেছে; দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়াই ত ভারতী প্রভুর মহীয়সী কীর্ত্তির কথা ঘোষিত হইতেছে; জাতির অন্তরে চিরদিনের জন্যই ত সে মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত রহিয়াছে! তথাপি আমরা প্রতিবৎসর আজিকার এই নির্দ্দিষ্ট দিনে এই পুণ্যস্থানে আসিয়া এইরূপ বিশিষ্টভাবে সেই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে ভক্তির কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হই। আমাদের জীবন সার্থক করিবার জন্যই এই আয়োজনটা আমাদিগকে করিতে হয়। যেহেতু সেই মহাপুরুষ এই দিনে এই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দেনুড়ের ব্রহ্মচারী ভবন শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রম। এই দিনে এই পুণ্যতীর্থ দর্শন করিলে জীবের মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই দেখিতে পাই প্রতিবৎসর এই দিনের এই ধর্ম্ম সভায় বহুতর ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও সাধুসজ্জনের সমাবেশ হইয়া থাকে। আর এই সকল সাধুসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইবার আশায় আমার মত দীনাতিদীন অযোগ্য ব্যক্তিও তাই এই পবিত্র ধর্ম্মসভার এক পার্শ্বে একটু স্থান পাইবার জন্য প্রতি বৎসরই আসিয়া থাকে।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি আর বেশী কিছু বলিব না। একটী মাত্র কথা নিবেদন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা এত দিন দেখিয়া আসিতেছি, শ্রীপাদ

কেশবভারতীর স্মৃতিপূজা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাহা থাকিলে আর চলিবে না। ভারতী প্রভু যখন বাঙ্গালী জাতির গৌরব, তখন এই জাতির মধ্যেই সার্ব্বজনীন্ ভাবে সেই মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গালীর আপামর সাধারণকেই আমরা এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হইতে বলি। তবে আমরা যেমন করিতেছি তাহা ত করিবই। আমরা এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া প্রতি বৎসর যেমনভাবে তাঁহার মহিমময়ী স্মৃতির ধ্যানে ধন্য হইতেছি, তাহা হইতে কেহই আমাদের বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যেহেতু দেনুড়ের এই ব্রহ্মচারী ভবন তাঁহার বাল্যাশ্রম। তাঁহার এই বাল্যাশ্রমে তদীয় বাল্যলীলার কথা আমরা আলোচনা করিবই; কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে কর্ত্তব্য—সার্ব্বজনীনভাবে এই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজা—বাঙ্গালী কি সে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবে? তা যদি হয়, তবে সেটা জাতির দুর্ভাগ্য বই আর কি বলিব?

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# কুম্ভমেলার যৎকিঞ্চিৎ

বিগত কুম্ভমেলায় বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য এবং জ্ঞাতব্য বিষয় কতকগুলি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে দিলাম।

(১) পানীয় জলের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বৈদ্যুতিক আলো অসংখ্য দিয়া চাঁদের আলোর অভাব দূর হইয়াছিল।

( ২ ) এলাহাবাদ মেন্ ষ্টেশন হ'তে ব্রাঞ্চ লাইন সংগম পর্য্যন্ত আনিয়া এবং মটর বাস্ লরির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী থাকায় যাত্রিদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু এক্কা টাঙ্গা ইত্যাদি স্বদেশী জানওলাদের জান মারা হইয়াছে।

( ৩ ) Airoplane কোম্পানীরা আকাশ হ'তে মেলা দেখাইয়া যাত্রীদের রক্ত বেশ করিয়া শোষণ করিয়াছেন।

( ৪ ) বিলাতী সিগারেট কোম্পানীরা যাত্রীদের ধুমপান করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন এবং রস চুষিয়া খাইয়াছেন।

( ৫ ) যাত্রী, কল্পবাসী এবং বড় বড় দাতারা সাধুসেবার জন্য ব্যয় কমাইয়া বিলাসিতায় অধিক অর্থব্যয় করিয়াছেন।

( ৬ ) সমস্ত মেলার জন্য যে জমী ছিল তাহার এক তৃতীয়াংশ সাধুদের জন্য দিয়া তিন ভাগের দুইভাগ জমী নানা আফিস, কোতোয়ালী সেবাসমিতি প্রদর্শনী দোকান পাটের জন্য এবং পাণ্ডাদের বিলি করিয়া সাধুদের একটু কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গভর্ণমেন্টের অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়াছে বটে।

( ৭ ) পায়খানা এবং প্রস্রাবের জায়গা প্রচুর ছিল না, ডাক্তার খানা হাঁসপাতাল প্রচুর ছিল না বরং কমই। জল নিকাশের ব্যবস্থা ভাল না থাকায় অতিরিক্ত কাদা হইয়া রাস্তা মধ্যে মধ্যে অচল হইয়াছিল।

( ৮ ) আলোকচিত্র এবং লাউড্ স্পিকারের সাহায্যে অনেক বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উহার দ্বারা সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

( ৯ ) বৈরাগী এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ ঘটে নাই বেশ শান্তি ছিল।

( ১০ ) এবার অনেক ধর্ম্মশালা এবং অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল তাহার

মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাঞ্জাবের সক্করেড়ীর সাতবেলা মট কালীকম্বলিওয়ালা এবং ভোলাগিরির আশ্রম ইত্যাদি আশ্রম হইতে প্রতিদিন হাজার হাজার সাধু, গৃহস্থ, সন্ন্যাসীকে ভোজন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

( ১১ ) এবার সাধু সম্মিলনীর অনুষ্ঠান ২।৩ জায়গায় ছিল। তাহাতে অনেক বিচার মীমাংসা হইয়াছে তাহাতে বিশেষ বিষয় ছিল ১। আগামী সুমারির সময় সাধু ও ভিখারী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গণনা করিয়া পৃথক করা হইবে। ২। যে সকল দেবত্তর সম্পত্তির মালিক সাধু মহান্তরা আছেন তাঁহারা যাহাতে কোনরূপ বিলাসিতা বা অন্যায়ভাবে নষ্ট করিতে না পারেন বা দেবসেবার কোন ত্রুটি না হয় তাহা সনাতন ধর্ম্মসভা বা সাধুসম্মিলনী হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন কোন আইন কানুন দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে না পারেন তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ৩। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা।

( ১২ ) সেবাসমিতির সাহায্যে যাত্রীদের কোন কষ্ট হয় নাই তাহাদের কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনক।

( ১৩ ) একটা Propagunda work বেশ ভালরকম চলিয়াছিল তাহাতে বোধ হয় নব্যযুবক এবং রাষ্ট্রনায়ক বা কর্ম্মিগণ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মাইতে চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু নাস্তিকের সংখ্যা বৃদ্ধ হইয়াই কি স্বরাজ লাভ হইবে ?

( ১৪ ) পণ্ডিত মালাজীর গীতা সঙ্ঘে, গীতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতারও ব্যবস্থা ছিল। গীতা প্রদর্শনী একটা নূতন জিনিষ ছিল। যজ্ঞস্থলে নিত্য চারি বেদ অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

( ১৫ ) শ্রীবৃন্দাবন বাসী মাধ্বগোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীহরিনাম

মহাযজ্ঞ করিয়া সাধারণকে অত্যধিক আনন্দ দিয়াছেন। কলিকালে নাম যজ্ঞের মত কোন যজ্ঞই নাই "কলৌ হরের্ণামৈব কেবলম্" হরিনাম বই গতি নাই।

( ১৬ ) মধ্যে কয়েকদিন বৃষ্টি ও পাথর ( শিল ) পড়ায় সাধুদের এবং কল্পবাসিদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল সেই জন্য শ্রীবসন্তপঞ্চমীর পরই অনেকে চলিয়া গিয়াছিলেন।

( ১৭ ) সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে কিছু কলেরা বেশী হইয়াছিল।

( ১৮ ) এই ঘোর কলিকালে মন্ত্রপুতঃ করিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া গীতাসজ্ঞ মেলাস্থানে মহাহোম করিয়াছিলেন।

( ১৯ ) এলাহাবাদবাসী বাঙ্গালী এবং অন্যান্য সকলেই বলিলেন, এত ভিড় অর্থাৎ এত লোকসংখ্যা কখন হয় নাই। এবার ৫০ লক্ষেরও বেশী লোক হইয়াছে অন্যবার ২৫ লক্ষের বেশী কখন হয় নাই। যদি ভারতবাসী রাষ্ট্র কর্ম্মিরা হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা জন্মাইবার চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে আরও কত বেশী লোক হইত বলা যায় না। এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সাধারণের ধর্ম্মে মতিগতি বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়াই সকলে বলেন।

( ২০ ) এবার নিখিল ভারত মাধ্ব গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ স্নানের দিন তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণব বৈরাগী খোল করতাল সংযোগে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া বড় মিছিলের সহিত গিয়াছিলেন। (বায়স্কোপে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,) এ সৌভাগ্য বা সম্মান উপসম্প্রদায়ের ঘটে নাই বা কোন কালেও ঘটিতে পারে না। উক্ত সম্প্রদায় এই একমাস নিত্যই ৪০০।৫০০ শত বৈষ্ণব ও ভক্তকে ভোজন দিয়াছেন এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদের জন্মোৎসব এবং শ্রীনাম যজ্ঞের উৎসব উপলক্ষে কয়দিন প্রায় দশ হাজার মূর্ত্তিকে পুরী, কচুরী, ফুলকপির

তরকারী, লাড্ডু, মোহনভোগ ইত্যাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া ভূরিভোজন করাইয়াছেন।

( ২১ ) অনেকেই অনেক রকম যজ্ঞ করিয়াছেন কিন্তু কল্পবাস সমাপ্তির পরদিন অর্থাৎ ১লা ফাল্গুন ব্রহ্মা তাঁর নিজের যজ্ঞ করিয়া অর্থাৎ আগুন লাগিয়া কয়েকটি সরকারি আফিস ইত্যাদি ভস্মিভূত করিয়াছেন। অন্যান্যবার অপেক্ষা অনেক কমই আগুন লাগিয়াছিল।

বলিবার অনেক বিষয় থাকিলেও বিস্তৃতিভয়ে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করিলাম।

বৈষ্ণব দাসানুদাস পরিব্রাজক বাবাজী
শ্রীগৌরগোপী দাস।

# স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধুত মহারাজের জন্মভূমিতে স্মৃতিমন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা

কালীঘাট মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধুত ( শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ) মহারাজের পবিত্র নাম সুধী ও ভক্তজনের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। তিনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন এবং সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় মতের প্রচারকল্পে বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সাহিত্যজগতে সেই সকল গ্রন্থ অপূর্ব্ব সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপদেশামৃতে একদিন সর্ব্বদেশবাসীই ধর্ম্মের পুণ্যালোকে আলোকিত হইয়া কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত হইয়াছিলেন এবং মানবজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তাঁহার পবিত্র নামে সহস্র সহস্র মানব প্রাণে সুশীতল শান্তিধারা বর্ষণ করিতেছেন।

এই মহাপুরুষ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ই, বি, রেলওয়ে সোদপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে পুণ্যতোয়া ভাগিরথীর পূর্ব্বকূলে শ্রীধাম পাণিহাটি গ্রামে সন ১২৬১ সালের ১৩ই চৈত্র রবিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ পাণিহাটি গ্রাম বৈষ্ণব জগতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি প্রিয়স্থান। শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের শ্রীমুখের বাণী—"পাণিহাটি রাঘবভবনে, নিত্য মম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে।" কিন্তু উক্ত পাণিহাটি গ্রামে ধর্ম্মালোচনার ও সাধুগণের বাসের কোন মঠ বা আশ্রম নাই এবং এতাবৎ উপরোক্ত মহাপুরুষের পুণ্য জন্ম-স্থানটীও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সাধারণের অজ্ঞাতভাবে পড়িয়াছিল। বড়ই আনন্দের বিষয়—সম্প্রতি তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য পরমভাগবত শ্রীমৎ গুরুগৌবরানন্দ অবধূত মহারাজ ঐ স্থানটী সংস্কার করিয়া তথায় একটী স্মৃতি-মন্দির ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধুগণের অবস্থিতির জন্য **কৈবল্য মঠ** নামে একটী সুবৃহৎ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ঐ আশ্রমের সঙ্গে একটী পাঠশালা, একটী চতুষ্পাঠী, একটী ধর্ম্মগ্রন্থাগার, একটী চিকিৎসালয় এবং বিদ্যার্থী বালকদিগের জন্য একটী বাসস্থান থাকিবে, সেখান হইতে তাহারা স্কুল কলেজেও যাইতে পারিবে। যাহাতে বৃদ্ধেরা শেষ জীবনে একটু শান্তিতে থাকিতে পারেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদের জন্যও ঐ আশ্রমের সঙ্গে তিনি একটী বাসস্থান রাখিতে মনস্থ করিয়াছেন।

স্বামী মহারাজের এই মহদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত জন্মভূমির স্বত্বাধিকারী পাণিহাটির কায়স্থকুলভূষণ মাননীয় ঘোষ মহাশয়গণ তাঁহাকে আনন্দের সহিত উক্ত জমি রেজিষ্টারীকৃত দানপত্র দ্বারা প্রদান করিয়া বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এক্ষণে স্থানীয় ও বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা—এই মহদনুষ্ঠানে যিনি যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, করিয়া এই জন-হিতকর মহৎ কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই প্রীতির দান যত অল্পই হউক না কেন, স্বামী মহারাজ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন

এবং অর্থাদি সমুদায় দানের জন্যই সহৃদয় দাতাগণকে স্বীকার পত্র প্রদান করিবেন। মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিত টাকার প্রাপ্তিও তিনি এইরূপ স্বতন্ত্র স্বীকারপত্র দ্বারা স্বীকার করিবেন। মনিঅর্ডার করিবার পর ১ মাসের মধ্যে কেহ ঐ স্বীকারপত্র না পাইলে তাঁহাকে জানাইবেন—তিনি তদন্ত করিবেন।

সাহায্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীমৎ স্বামী গুরুগৌরবানন্দ অবধূত।

কৈবল্য মঠ, পোঃ পাণিহাটি ( ২৪ পরগণা )

# বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

**আনন্দ সংবাদ।**—ভক্তি পত্রিকার বিশেষ উৎসাহদাতা বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস মহাশয়কে বিগত ৺সরস্বতী পূজোপলক্ষে সাঁইথিয়ার সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী "কবিকণ্ঠ" উপাধি দান করিয়াছেন এবং মেমারী ইনষ্টিটিউট হইতে শ্রীযুক্ত ত্রিপথনাথ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয় "কাব্যগুণাকর" উপাধী দান করিয়াছেন। আমরা যোগ্যপাত্রে যোগ্য উপাধী প্রদানদৃষ্টে যথার্থই আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীভগবান শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বাবুর সর্ব্ববিধ মঙ্গল বিধানকরুন ইহাই প্রার্থনা।

**আবির্ভাব মহোৎসব।**—বিগত ২৬ মাঘ ভৈমী একাদশীতে শ্রীপাট দেনুড়ে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর বাল্যাশ্রমে অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও তদীয় আবির্ভাব-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ২৬শে মাঘ অষ্টপ্রহর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন, রসকীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ২৭শে মাঘ প্রাতে কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন হইয়া ধুলোট উৎসব হয় এবং মধ্যাহ্নে অন্ন-মহোৎসব অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হওয়ার পর সন্ধ্যার সময় যথারীতি ভারতী প্রভুর স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় কেশব ভারতী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা মূলক প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। স্থানান্তরে আমরা উক্ত সভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিলাম।

**আগমন উৎসব**—১২ই চৈত্র ইং ২৬শে মার্চ্চ বুধবার কৃষ্ণা বাঞ্জুলী মহাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীপাট বরাহনগর মালীপাড়া শ্রীল ভাগবত

আচার্য্যের পাঠবাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ মহোৎসব। তদুপলক্ষে ৯ই চৈত্র ২৩শে মার্চ্চ রবিবার সায়াহ্নে মহোৎসবের শুভ অধিবাস। ১০ই চৈত্র ২৪শে মার্চ্চ সোমবার হইতে ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত চব্বিশ প্রহর ব্যাপী অহোরাত্র শ্রীশ্রীনাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ। ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ বুধবার বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ। রাত্রে **শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাগমন স্মরণ কীর্ত্তন**। ১৩ই চৈত্র ২৭শে বৃহস্পতিবার প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন। ১৪ই চৈত্র ২৮শে মার্চ্চ শুক্রবার বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও রাত্রে কীর্ত্তন। ১৫ই চৈত্র ২৯ শে মার্চ্চ শনিবার বৈকালে ৫টার সময় শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন। পরম পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ভক্তিশাস্ত্রব্যাখ্যা। ১৬ই চৈত্র ৩০শে মার্চ্চ রবিবার প্রাতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন ও মধ্যাহ্নে **শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ-আরাধনা** ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও মহোৎসব সমাপ্ত। শ্যামবাজার হইতে আলম বাজারের মোটর বাসে যাইয়া আলম বাজারের সন্নিকট তাঁতিপাড়ার সম্মুখে নামিয়া দক্ষিণদিকে অল্প দূর গেলেই পাঠবাটী।

**শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমিতি** :—বরিশাল জিলার অন্তর্গত ভোলা মহকুমার বৈষ্ণব সম্প্রদায় ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্ম জীবন গঠন সহায়ক উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব বহুকাল যাবত অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। উক্ত অভাব দূরীকরণার্থে বর্ত্তমান ১৩৩৬ সনের ১৩ই আষাঢ় তারিখে ভোলাতে **শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণব সমিতি** নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উকীল, মোক্তার, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি উক্ত সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মালোচনা, নাম সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পীড়িত ও দুস্থ ব্যক্তি দিগেকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং সমিতি ঐ সকল কার্য্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। স্থানীয় ৺মদন মোহন জিউর আখড়া বাড়ীতে উক্ত সমিতির অধিবেশন ও অন্যান্য কার্য্যাদি চলিতেছে। এই সমিতির বিষয় কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, এম-এ, বি-এল, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

# প্রেমানন্দ-সংবাদ

( প্রথম প্রকরণ )


কীর্ত্তন-গীতি-সংগ্রহ, শিক্ষাষ্টক, পঞ্চগীতা, প্রাণের-কথা প্রভৃতি

পুস্তক ও "ভক্তি" মাসিক পত্রিকার সম্পাদক

পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন

সম্পাদিত।



জেলা—হাওড়া, পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী

মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"

হইতে

শ্রীনিমাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[ ১৩৩৬ মাঘী পূর্ণিমা ]

মূল্য ।।০ আনা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—

ভক্তি-কার্য্যালয়, মাসিলা "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ—আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।

এবং

মহেশ লাইব্রেরী, বরাহনগর, কলিকাতা।

অথবা

১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৭নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট "মানসীপ্রেস" হইতে

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

# সম্পাদকীয় বক্তব্য।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

ভক্তগণের আগ্রহে ও মঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের অপার করুণায় "প্রেমানন্দ-সংবাদ" গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইলেন। যে মহাপুরুষের মনোভাব ও শুভইচ্ছা এই গ্রন্থ-দ্বারে আজ প্রকাশ হইল বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহাকে আজ প্রত্যক্ষ জগতে দেখিতে পাইতেছি না। জীবের দুঃখ দেখিয়া—মানব জীবনের ব্যাভিচার দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাই প্রাণের ভাব যতদূর সঙ্ক্ষেপে হয় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া জন সমাজে প্রচার করিয়া যাইতে ছিলেন, কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্যনীয় বিধিতে তাঁহাকে অতি শীঘ্রই এ নরজগতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া যাইতে হইল। ভাবিয়া ছিলাম তাঁহার এই অসম্পূর্ণ কার্য্যভার কোনও যোগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া পূর্ণ করিবেন; কিন্তু আজ সুদীর্ঘ ২০ বৎসরের মধ্যে কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াও তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ছিলাম, জানি না কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। যাহা হউক পাঠকগণ আমার ভাষার শত দোষ থাকিলেও বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া গ্রন্থখানির রসাস্বাদ করিয়া আনন্দ লাভ করুন ইহাই আমার পাঠকগণের নিকট করযোড়ে বিনীত নিবেদন।

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব একদিন বলিয়াছিলেন "মানুষ,—যতই দুরাচারী হউক না কেন, উত্তম আদর্শ পাইলে তাহার অনুকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সে নিজের জীবন উন্নত করিতে সমর্থ হয়।" আমি আজ সেই অমোঘ বাণী স্মরণ করিয়া এক মহাপুরুষের চরিত্র অঙ্কনে লেখনী ধরিয়াছি, আমার অজ্ঞতার দোষে যদিও—যদিও কেন নিশ্চয়ই, চিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই,

তবু এই ভরসা আছে যে, ভবিষ্যতে কোনও যোগ্যব্যক্তি যেখানে যেরূপ করিলে চিত্রটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিবেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আর কিছু নাই, কেবল্ এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখি যে, নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন দাদা মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে "ভক্তি" পত্রিকায় যে "ক্ষ্যাপা ও প্রেমানন্দ" লিখিয়াছিলেন আমার এই "প্রেমানন্দ-সংবাদ" তাহারই একপ্রকার পুনরাবৃত্তি। তবে তিনি যে ভাবে লিখিয়াছিলেন আমি কেবল মাত্র বর্ত্তমান পাঠকগণের রুচিকর হইবে বলিয়া একটু রং চাপাইয়াছি এবং আবশ্যকবোধে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি মাত্র। এই পরিবর্ত্তনে অনেক নূতন কথা আছে। যে সকল মহাত্মাগণের সঙ্গীত এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ।

প্রেমের জগতের কোন সংবাদই আমি রাখি না, তবু আজ কেন জানি না, ভক্তগণের নিকট "প্রেমানন্দ-সংবাদ" লইয়া উপস্থিত হইলাম। ভক্তগণ যদি ইহাতে আমাকে মূর্খ—পাগল বলিয়া পদাঘাতরূপ কৃপা করেন, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই বরং আমি ভক্তগণের ঐরূপ কৃপা পাইয়া আমার ভোগ-বিলাসমত্ত নিজের জীবন ধন্যই মনে করিব।

প্রথম প্রকরণ প্রকাশ হইল, দ্বিতীয় প্রকরণ প্রস্তুত হইতেছে, পাঠক-গণের আগ্রহ বুঝিলে শীঘ্র শীঘ্রই উহা প্রকাশ হইবে। অলমিতি—

ভক্ত-পদরজঃ প্রার্থী

দীনহীন কাঙ্গাল—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক

দ্বিতীয়তঃ কামাদির লক্ষ্য একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তন পরম বৈরাগ্য-প্রাপ্ত ভক্তগণের জীবনে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি সবই থাকে কিন্তু অন্যভাবে। সাধারণ ব্যক্তির কাম যেমন আত্ম-প্রীতি ও নশ্বর বিষয় ভোগাদিতে আসক্তি জন্মাইয়া ব্যাকুল করে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, কুল শীলাদির প্রতি লক্ষ্য রাখে না, ভক্তগণের কিন্তু তাহা নয়; সেখানে কাম রিপু তাহাদের পরম বন্ধুর ন্যায়ই কার্য্য করে। তাহাদের নিকট ঐ কাম জীবের একান্ত উপাস্য শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য সতত চেষ্টাপর হয়। অন্য চেষ্টা এমনকি কুল শীল মান মর্য্যাদা সকল পরিত্যাগ করাইয়া চিত্তকে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য উন্মুখ করাইয়া দেয়, তখন তাহাদের কামনার বস্তু হয় সেই প্রেমময় শ্রীভগবান। সাধারণ ব্যক্তির যেমন বিষয় সম্বন্ধে চেষ্টা হয় ভক্তের তদ্রূপ ভগবৎ সম্বন্ধে চেষ্টা হয়। তাঁহাকে পাইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুলতা হয়, না পাইলে অস্থির—উন্মাদ পাগল হইয়া উঠে।

অজিত অবস্থায় কাম যেমনই অনিষ্টকর, সর্ব্বদা দুঃখ কষ্ট দায়ক ছিল জিত অবস্থায় তেমনই সর্ব্বোত্তম বন্ধুরূপে তাহার সহায় হইয়া প্রাপ্য বস্তু লাভ করাইয়া জীবন জনম ধন্য করিয়া দেয়। এই প্রকারে কাম তখন আত্মসুখ বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া যায়। তখন আর কাম কাম থাকেনা প্রেম হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন,—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

এই প্রকারে কাম যদি প্রেমে পরিণত হইল, ক্রোধ তখন আপন ভীষণ

মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া কামের পিছু পিছু স্থির ধীর ভাবে সাধকের হৃদয়ে থাকিয়া তাহার সাধনের সাহায্য করে। পূর্ব্বে কামের যেমন দুইটি অবস্থা বলিয়াছি ক্রোধেরও সেইরূপ, জিতেন্দ্রিয়গণ প্রয়োজন হইলে ক্রোধকে নিজ বিক্রম প্রকাশে অনুমতি দেন, ক্রোধও অমনি প্রভুর আদেশ পালন করে। পূর্ব্বতন ঋষিগণ দুষ্ট দলনের জন্য, পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাইতে ক্রোধকে আশ্রয় করিয়া অভিসম্পাতাদি করিতেন। আর বিরক্ত ভক্তগণের নিকট ক্রোধ বৈরাগ্য নামে অভিহিত হয়; কামনার যাহা বিরোধী কামুক যেমন তাহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহারই নাশ করে বা তাহার সঙ্গ একেবারে পরিহার করে, ভক্তের কামনার বিষয় শ্রীভগবান, যাহা তাহার প্রতিকূল ক্রোধ বৈরাগ্যরূপে সেই সেই ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাসক্তি দেখাইয়া ভক্তের পরমোপকার সাধন করে। অসৎ বস্তুর প্রতি প্রবল বৈরাগ্য ভাব সঞ্চিত না হইলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না, সাধন পথে বৈরাগ্য যেমন সহায় এরূপ আর কেহই নয়। ক্রোধ যেমন হিতাহিত জ্ঞানের বিলোপক, বৈরাগ্য তেমনই হিতাহিত জ্ঞান বিস্তার করতঃ সাধ্য বস্তু শ্রীভগবানে জীবকে অতিশয় আকৃষ্ট করিয়া রাখে। অনেক মহাত্মারাই বলিয়া থাকেন "সাধন পথে চলিতে হইলে বৈরাগ্য অসি হাতে সর্ব্বদা রাখিবে।" অতএব বৎস! যদি বুঝিয়া চলিতে পারে, তবে যাহা অনিষ্টকর তাহাই হিতকর হয়, যে বিষ প্রাণ হরণ করে সেই বিষই আবার অবস্থা বিশেষে জীবন রক্ষাও করিতে পারে। কামাদি নষ্ট হয় না, কেবল জয় করিয়া অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ ও সংযম করিতে হয়।

বৎস! লোভ অজ্ঞ জীবকেই অভিভূত করিয়া রাখে। ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে ঐ লোভ ভাবান্তরিত হইয়া নামে রুচি ও সাধু-সঙ্গলিপ্সা নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি দ্বারা যেরূপ রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে যত্নবান হইত এখন ভক্তি-ভাবের উদয় হওয়ায়

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণে ও ভক্তসঙ্গে ততোধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত দিবারাত্র রসনাদ্বারা শ্রীনাম ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া অমৃত রস আস্বাদন করেন। লোভ হইতে যেমন অপর সকল রিপুর উদয় হয় ঐ লোভের পরিণতি নামেরুচি ও নাম কীর্ত্তন হইতেও তেমনি ভক্তের সকল প্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

মোহও ঐরূপ। আমার গৃহ, আমার পুত্র, আমার কন্যা ইত্যাকার ভাবে গৃহাদিতে অত্যন্ত আকৃষ্ট মুগ্ধ জীব যেমন ধর্ম্মালোচনায় ক্ষণকালের জন্যও যোগ দিতে সময় পায় না, কেহ সাধুসঙ্গের কথা বলিলে অমনি উত্তর করে "মহাশয়! কখন যাইব, সময় নাই।" সেইরূপ ভুবন মোহন শ্রীভগবানের সেবায় একান্ত নিষ্ঠাই ভক্তের মোহ। কেহ যদি পার্থিব বিষয়ালোচনার নিমিত্ত ডাকে বিনীতভাবে ভক্ত গদ্গদস্বরে বলেন "বন্ধুগণ কখন যাইব—আমার সময় নাই।" তিনি মোহকে জয় করিয়া ভগবৎ সেবায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন কাজেই দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সেবার কার্য্য রহিয়াছে। মোহ বিমুগ্ধ জীব আমার গৃহ, আমার ক্ষেত্রাদি মনে করিয়া অহর্নিশি মত্ত থাকে, ঐ মত্তাবস্থায় যমদূত আসিয়া সজোরে বন্ধন করিয়া লইয়া যায় "আমার এখন সময় নাই", "কি এক্ষণে আমি যাইব না" ইত্যাদি কাতর বাক্যে দৃক্পাতও করে না, কিন্তু শ্রীভগবৎ সেবাপরায়ণ ভক্ত যখন ইষ্ট সেবায় নিযুক্ত ও বিমুগ্ধ থাকেন তখন আর যমদূতের সাধ্য হয় না যে, তাঁহাকে স্পর্শ করে। ঠাকুর সেবার কার্য্যও মোহ বটে কিন্তু বিষয় মোহের ন্যায় দুঃখজনক নয় পরন্তু উহা পরমানন্দ-প্রদ ও পরিণাম বিরস-দুঃখজনক অজ্ঞতার বিনাশক। তাই ভক্ত প্রার্থনা করেন "বিষয়ী যেমন বিষয়ে মুগ্ধ, হে পতিতপাবন! কবে আমি সেইরূপ তোমার কার্য্যে, তোমার সেবায় বিমুগ্ধ হইব।"

বৎস! মদ বলিতে অহঙ্কার পূর্ব্বে শুনিয়াছ, ঐ অহঙ্কার যে পরম শত্রু তাহাও জান। কিন্তু শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রভাবে অহঙ্কারও অন্যরূপ ধারণ

করে, "আমি ভগবানের দাস, আমি শ্রীহরির সখা, আমার কৃষ্ণ" ইত্যাদি অভিমানের উদয় হয়। দাস্য, সখ্য, মধুর ও বাৎসল্যাদি ভাবের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইলে এইরূপ মদের ( অহঙ্কারের ) উদয় হয়, ঐরূপ ভাবের নিষ্ঠায় ভক্ত মহা বলবানের ন্যায় বলিয়া থাকেন "রে কামাদিরিপুগণ। আমার প্রতি তোদের অধিকার নাই, আমি হরিদাস।" বৎস! বলিবার সময় হইল না, সংক্ষেপে বলিলাম, তুমি এবিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবে। ভাবের নিষ্ঠায় যে অহঙ্কার হয় তাহাতে পতন হয় না, বরং সকল বিঘ্ন বিপত্তি বিনাশ করিয়াই দিয়া থাকে।

এইবার মাৎসর্য্যের কথা। মাৎসর্য্য ভক্তের দেহে এক অভিনব ভাবে অবস্থান করে। নিজের পাপস্মরণ করিয়া হা হুতাশ করে এবং শ্রীভগবান অসংখ্য পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন মনেকরিয়া প্রাণের আবেগে বলেন—

"পতিতপাবন! তুমি আমায় দয়া করিবে না কেন? তুমি মহাপাপী অজামিলকে তরাইলে, বালক ধ্রুবকে দেখাদিলে, বিদুরের ক্ষুদ খাইয়া প্রীতি লাভ করিলে, চণ্ডালকে কোলদিলে,অতি কপট খল কালিয় নাগকেও চরণ দিলে, তবে আমায় দিবে না কেন? এইরূপ ভাবকে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঈর্ষাব্যঞ্জক ভাব মনে হয় প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এ ঈর্ষা ঈর্ষা নয়, ইহা পরমানন্দের ভাব। ভক্তের শরীরে মাৎসর্য্য এইরূপ ভাবেই বাসকরে।

বৈষ্ণব কবি নরোত্তমদাস ঠাকুর তাঁহার প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায় রিপুগণের নিয়োগ প্রণালী বড়ই সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষী জনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে মদকৃষ্ণ গুণগানে
নিযুক্ত করিবে যথা তথা॥

বৎস! তোমার আগ্রহে সংক্ষেপে বলিতে যাইয়া বক্তব্য একটু দীর্ঘই হইল। যাহা হউক এই সকল বিষয় খুব নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিলে যে, রিপু মরে না, কেবল ভাবান্তরিত হইয়া ভক্তগণের নিকট থাকে।

রসিক।—গুরুদেব আপনি রিপুদমনের উপায় যাহা বলিলেন যদিও উহা অতি সহজ পরন্তু যাহাদের শাস্ত্র জ্ঞান আছে এবং সৎসঙ্গে বেড়ায় তাহারাই ঐ সকল অনুষ্ঠান করিয়া নরকের দ্বার স্বরূপ কামাদির হাত হইতে রক্ষা পায়; আর যাহাদের কোনই জ্ঞান নাই, সৎসঙ্গাদির সম্ভাবনাও নাই, অতি দীন দরিদ্র, তাহারা কি প্রকারে দুর্দ্দমনীয় রিপুকুলকে দমন করিবে? সংক্ষেপে তাহা একটু বলুন।

প্রেমা—বৎস! যাহার যেমন অবস্থা, যেমন জ্ঞান, যেমন ভাষা সেই সেই ভাবেই সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীভগবানকে জানাইবে। অন্যান্য উপায় না থাকিলেও গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র যাহার লাভ হইয়াছে, তাহার আর কোনই অভাব নাই। যেমন রিপুকুল প্রবল হইয়া উঠিবে, অমনি যথাসাধ্য জপ করিলেই রিপুর অসৎভাব দূরে পলায়ন করিবে। পূর্ব্বোক্ত উপায় হইতেও এই উপায় অতি সহজ ও উত্তম। শ্রীভগবানের নাম উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলে রিপু দমন হয়। বৎস! বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া প্রখর রৌদ্র-তাপ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে গিয়া বুদ্ধিমান পথিক প্রথমে করতালি দিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বৃক্ষের উপর যদি কাক কিম্বা সর্পাদি থাকে তাহারা ঐ শব্দ শুনিয়া পলায়ন করিবে, তিনি নিরাপদে ছায়ায় বিশ্রাম করিবেন। শাস্ত্র বলেন, সংসার একটী বৃহৎ বৃক্ষ, ইহার শাখা প্রশাখা অনেক. উহাতে নানাবিধ জীব-ভাব বাস করে, উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অসদ্ভাবরূপ পাখী পলায়ন করে, প্রাণ সুশীতল হয় ও মন অন্য চিন্তা রহিত হয়। নামে

যে ফল, মন্ত্র জপেও সেই ফল ; বরং নামে বেশী ফল বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন—

শুনিয়া গোবিন্দ রব, আপনি পালাবে সব
সিংহরবে যেন করিগণ।

এইরূপে যাঁহার যেমন সম্ভব তিনি সেইরূপ করিয়া রিপু দমন করিবেন।

রসিক।—প্রভু! আজ আমার প্রাণের একটা ঘোর সন্দেহ মিটিল। আপনার অপার করুণায় যে অমূল্য সম্পত্তি আজ লাভ করিলাম, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা জীব-জগতের কল্যাণে ব্যায় করিতে পারি।

প্রেমা।—বৎস! শ্রীভগবান তোমার বাসনা পূর্ণ করুন। আজ রাত্র অধিক হইয়াছে, ছোট ছোট বালকগণ সমস্ত দিন মাতৃ-আরাধনায় ব্যস্ত ছিল এখন সকলে বিশ্রাম কর। তোমাদের জন্য কিছু প্রসাদ রাখিয়াছি, সকলে মিলিয়া আনন্দে প্রসাদ ভোজন করিলে আমার বিশেষ তৃপ্তি হইবে। তুমিই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

প্রেমানন্দের আদেশ পাইয়া রসিক চাঁদ দু' একজন বালকের সাহায্যে উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া দিয়া প্রেমানন্দকে প্রণাম করিয়া বালকগণ সমভিব্যাহারে "নিতাই শমন দমন নাম এনেছে ভয় দূরে গেছে।" এই পদ গান করিতে করিতে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। প্রেমানন্দও নিজ ক্রিয়া করিতে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

পাঠকগণ! অনেকক্ষণ আপনাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছি। এবার প্রেমানন্দ ও রসিক চাঁদ পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইলেন। আপনারাও এই অবসরে কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া লউন, আবার দেখাইবে।

——*——

( ১০ )

আজ সূর্যগ্রহণ, দলে দলে লোক সকল নানাবিধ মঙ্গলধ্বনি করিতে করিতে কেহ নদীতে, কেহ পুষ্করিণীতে, কেহ বা গ্রামান্তরে কোনও প্রসিদ্ধ দীঘিতে স্নান করিতে চলিয়াছে। বেলা ১০টার সময় গ্রহণ লাগিয়াছে, প্রায় ২ঘণ্টা স্থায়ী। এদিকে রসিকচাঁদ বালকগণকে লইয়া খোল করতাল যোগে কীর্ত্তন করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছে। প্রেমানন্দের আশ্রমেও দলে দলে লোক আসিতেছে—যাইতেছে। বেলা ৩টার সময় রসিকচাঁদ সদলে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। তখনও আশ্রমের জনকোলাহল নিবৃত্তি হয় নাই। রসিকচাঁদ আসিয়া কিছুসময় কীর্ত্তন করিয়া প্রেমানন্দের নিকট বসিলে, কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর প্রেমানন্দ বলিলেন—"বৎস রসিক! আজ তোমাকে একটী কথা বলিব, দুঃখ করিও না, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় আজ রাত্রেই আমি এস্থান ত্যাগ করিব। কবে যে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে জানি না। আমি অনেক দিন কেবল তোমার আগ্রহেই এইস্থানে ছিলাম, এক্ষণে আমার একবার তীর্থ ভ্রমণে যাইবার আবশ্যক হইয়াছে, এই আশ্রমের ভার আমি তোমার উপর দিয়া গেলাম, যদি কখনও আবার শ্রীভগবান আনেন, তবে আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিব। আমি কিছুই তোমাকে দিয়াযাইতে পারিলাম না, কেবল এই দুইটী স্তব তোমার মধুর কণ্ঠে রাখিয়া গেলাম।" এই বলিয়া প্রেমানন্দ একখানি কাগজ রসিকচাঁদের হাতে দিলেন। রসিক কাগজখানি ভক্তিভরে মস্তকে তুলিয়া লইলেন।

দেখিতে দেখিতে আশ্রমে আগত সমস্ত লোকই চলিয়া গেল,রসিকচাঁদও নিজ সঙ্গের বালকগণকে বিদায় দিয়া প্রেমানন্দের নিকট রহিলেন। সকলে চলিয়া গেলে রসিকচাঁদ প্রেমানন্দের চরণ যুগল ধরিয়া অনেক কাঁদা কাটি করিলেন--অনেক কথা হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। শেষে প্রেমানন্দের যাওয়াই স্থির হইল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই প্রেমানন্দ শ্রীগুরুদেবের স্মরণ করিতে করিতে আশ্রম হইতে বাহির হইলেন। রসিক নদীর ধার পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে গেল, তিনিও মিষ্ট বাক্যে তাহাকে আশ্রমে ফিরিবার আদেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি রসিকচাঁদ আর কোথাও যায় না, এই আশ্রমেই থাকে। প্রেমানন্দ চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই রসিকচাঁদের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল। ক্রমে প্রেমানন্দের আশ্রম রসিকচাঁদের চেষ্টায় একটী আদর্শ আশ্রমে পরিণত হইল। এখন সেখানে নিয়মিত ভাবে কীর্ত্তন ও শ্রীগ্রন্থাদি পাঠ হয়। বহুলোক সেখানে যাতায়াত করে।

সহৃদয় পাঠকগণ! আমার আলোচ্য প্রেমানন্দ ও রসিকের পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইল। এখন কিছুদিন আপনারাও বিশ্রাম করুন। আবার যদি দু'জনকে একত্র বসাইয়া আমাদের আবশ্যকীয় কোন কিছু জানিতে পারি, তবে যথাসময় আপনাদিগকে তাহা উপহার দিয়া কৃতার্থ হইব।

প্রেমানন্দ যে কাগজ খানি রসিককে দিয়াছিলেন তাহাতে নিম্ন লিখিত প্রাচীন পদ দুইটী ছিল। পদ দুইটী প্রাচীন হইলেও পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে দিলাম।

( ১ম )

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কলপতরু
অদ্ভুত যাক প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির বর জ্ঞান
সু-চন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এহেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরিনাম॥

দুরগতি অগতি আসক্ত মতি যো জন
নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
তাহে করল উপদেশ॥
নিরমল গৌর প্রেমরসসিঞ্চনে
পূরল সব মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

( ২য় )

জয় নন্দ নন্দন গোপীজন বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরমুণিগণ মনমোহন ধাম॥
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজসহচরী লোচন মঙ্গল
জয় নদীয়া বধূ নয়ন আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেমবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রমাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥

জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ ভয়ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥

—:০:—

এইখানেই আমার বর্ণিত "প্রেমানন্দ-সংবাদ"
প্রথম প্রকরণ সম্পূর্ণ হইল।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

—:*:—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণ সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

—:*:—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"


২৮শ বর্ষ | ভক্তি | বৈশাখ
৯ম সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ১৩৩৭


# শ্রীমতীর উক্তি

( গান )

মরম-কথা কহিতে তোরে সরম বাসি, লো স্বজনি!—
নন্দলালা চিকণ কালা জ্বালায় মোরে দিন রজনী।
যমুনা জলে যাইতে একা
কত না ছলে দেয় সে দেখা
পথের মাঝে মরি যে লাজে, সহজ-ভীরু কুল রমণী।
কুটিল আঁখি কি যাদু জানে!
নয়নে মম যেমনি হানে—
নিখিলে আর কিছু না হেরি কেবলি সেই বাঁকা চাহনি!
চাঁদিনী রাতে একেলা আসি
নীপ-মূলে বাজায় বাঁশী,—
আকুল সুরে আমারে ডাকে—অথির হিয়া শুনি সে ধ্বনি।
'রজনী জাগি' কাঁদিয়া মরি;
বুঝি না সখি, কি যে করি!—
কি গুণ জানে বংশীধারী, ব্রজ-বধূটী-মরম মণি॥

শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

# শ্রীল রসিকানন্দ দাস

( ২ )

দ্বিতীয়তঃ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ এক, অভিন্ন। "ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই।" তাই রসিক ভক্ত পদকর্ত্তৃগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরী ভাবে তাঁহার রূপ গুণ বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ায় গৌরগত প্রাণ রাজীবলোচন দাস মহাশয় নাগরী ভাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারাংশ গৌরপদ তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরাও পাঠকগণকে তাহা উপহার দিতেছি। দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"নদীয়ার শ্রীনিমাই চাঁদ ভুবনমোহন সুন্দর * * * তাঁহার রূপের আলোকে দশদিক প্রদীপ্ত * * * নিমাইপণ্ডিতের অতুলনীয় রূপ-মাধুর্য্যে নদীয়াবাসি বিমোহিত। * * * রূপের আকর্ষণ অতি সাহজিক —অতি বিষম। বিশেষতঃ রমণীর মন স্বতঃই রূপমুগ্ধ হয়। সুরূপে রমণীর মন কেবল ভুলে না, ভুলিয়া মজে, মজিয়া রূপবানকে ভজিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ইহা প্রামাণিক খাঁটি সত্য। এ অবস্থায় রূপাভিলাষিণী সৌন্দর্য্যপ্রিয়া নদীয়া নাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে আকৃষ্টা না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। নদীয়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত লোক পতিত পাবনী সুরধুনীতে স্নানাবগাহন করেন। তাঁহারা গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া পুকুর কি কূপের জল ব্যাবহার করিতেন না। কাজেই নাগরীবৃন্দ সময় সময় গঙ্গারঘাটে আসিতেন, বসিতেন, পরস্পর কথোপকথন করিতেন এবং যুথে যুথে গৃহে ফিরিতেন। * * * নিমাইচাঁদ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তা' ছাড়া তিনি প্রতিদিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন সুতরাং নাগরীকুল তাঁহাকে সাধ পুরাইয়া দেখিতে পাইতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রূপাকর্ষণ অতি বিষম। রূপমাধুরী অজ্ঞাতসারে নয়ন মন হরিয়া লয়। নাগরী-চকোরী গৌরচন্দ্র-সুধা পানে গৌরগতপ্রাণা। ঘাটে আসা যাওয়া ব্যাপদেশে গৌর দর্শন সুলভ হইলেও তাহা এখন তাঁহাদের নিত্যকার্য্য মধ্যে গণ্য। গৌরাঙ্গ না দেখিলে নাগরীদের প্রাণ ছট্ ফট্ করে, আন্ চান্ করে; এমন কি তাঁহারা সোয়াস্তি পান না। গৌরহরি কিন্তু নারীদের পানে অপাঙ্গ দৃষ্টিও করেন না। নারীসমূহ গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই সুখী। গৌর নাগরীদের পানে চান তাঁহাদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ছায়াপাত হয় নাই। ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য!"

এই সব মহাপুরুষগণের লেখনী হইতে যে ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনায় কাহারও অধিকার থাকে থাকুক, আমরা ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিব না। মোটকথা যে সকল প্রাচীন পদকর্ত্তৃগণ গৌরাঙ্গকে নাগর রূপে দাঁড় করাইয়া পদ লিখিয়াছেন আমাদের আলোচ্য রসিকানন্দও তাহার মধ্যে একজন। ইঁহার লিখিত নাগরীভাবের একখানি পদ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। এইবার ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদখানি সম্বন্ধে বলিব।

দ্বিতীয় পদ খানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মস্তক মুণ্ডনের সময়কার অবস্থা বর্ণনে লিখিত। যথা:—

তখন নাপিত আসি　　প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুরদিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব　　কান্দে যত লোকসব
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি হরি কি না হৈল কাঞ্চননগরে।
যতেক নগর বাসী　　দিবসে দেখয়ে নিশি
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥

মুণ্ডন করিতে কেশ ‍ ‍ ‍ ‍ হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কাঁদয়ে উভরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে ‍ ‍ ‍ ‍ হাতে নাহি ক্ষুর চলে
"প্রাণ মোর বিদরিয়া যায়॥"
মহা উচ্চ রোল করি ‍ ‍ ‍ ‍ কাঁদে কুলবতী নারী
সবাই প্রভুর মুখ চাঞা।
ধৈরজ ধরিতে নারে ‍ ‍ ‍ ‍ নয়ন যুগল ঝরে
ধারা বহে নয়ন বহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান ‍ ‍ ‍ ‍ অন্তরে দগধে প্রাণ
কাঁদিছেন অবধুত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ ‍ ‍ ‍ ‍ শোকানলে আন চান
এ দুঃখ সহন না যায়॥

তারপরেই তৃতীয় পদ খানি, ভাগ্যবান মধু নাপিতের উক্তি। যথা :—

কহে মধুশীল ‍ ‍ ‍ ‍ আমি কি দুঃশীল
কি কর্ম্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু ‍ ‍ ‍ ‍ পদ না সেবিনু
পাইয়া গোলোক স্বামী॥
যে পদে উদ্ভব ‍ ‍ ‍ ‍ পতিত পাবনী
তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত ‍ ‍ ‍ ‍ কেন বজ্রাঘাত
মোর পাপ মাথে না হৈল॥
যে চাঁচর চুল ‍ ‍ ‍ ‍ হেরিয়া আকুল
হইত রমনী মন।
হৈনু অপরাধী ‍ ‍ ‍ ‍ পাষাণে প্রাণ বাঁধি
কেন বা কৈনু মুণ্ডন॥

নাপিত ব্যবসায় আর না করিব
ফেলিনু ক্ষুর জলে।
প্রভু সঙ্গে যাব মাগিয়া খাইব
রসিক আনন্দ বলে॥

পাঠকগণ পদাবলীর রস আস্বাদ করুন। আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই খালাস। গৌরপদ তরঙ্গিণীর কৃপায় এই তিন খানি পদের সন্ধান পাইয়াছি, এতদতিরিক্ত যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন আমাদিগকে জানাইলে আমরা যথাসময় পাঠকগণকে উপহার দিয়া কৃতার্থ হইব।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

দীন—শ্রীগৌরপদ দাস।

# শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবসান।

ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া এক অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের প্রথমে লিখিয়াছেন "শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধান-সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি কথা বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে আজ তাহাই আমার আলোচনার বিষয়।" ঈশান নাগর প্রণীত অদ্বৈত-প্রকাশ, লোচনদাস প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল ও জয়ানন্দ প্রণীত চৈতন্যমঙ্গল, এই তিনখানি গ্রন্থ হইতে দীনেশ বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রথের সময় নৃত্য

করিতে করিতে চৈতন্য দেবের পায়ে ইট বিঁধিয়া যায় এজন্য তিনি গুণ্ডিচাবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেইখানেই আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে তিনি দেহত্যাগ করেন; সেইখানেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। গুণ্ডিচার মন্দির মধ্যে দরজার পার্শ্বে যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন বর্ত্তমান আছে তাহার নীচেই তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এবং দীনেশ বাবুর সৌভাগ্য-ক্রমে দেশবাসীরা বৈষ্ণব গ্রন্থ খুব কমই পড়েন। তাই দীনেশ বাবু সুপ্রসিদ্ধ সকল বৈষ্ণব গ্রন্থের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল পুস্তকের কোনটিতেই শ্রীচৈতন্য প্রভুর তিরোধানের কথা নাই। তিনি মুরারী গুপ্তের চৈতন্য চরিত, কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্য ভাগবত, নিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা-শিষ্য নিত্যানন্দ- দাস বিরচিত প্রেম বিলাস ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীনরহরি দাস রচিত প্রসিদ্ধ ভক্তিরত্নাকর মহাগ্রন্থের নাম করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরকে দীনেশ বাবু প্রসিদ্ধ মহাগ্রন্থ বলিয়াছেন। বাস্তবিক এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও সমাজের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যদি এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের বিবরণ থাকিত তবে দীনেশ বাবু নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই গ্রন্থে দীনেশ বাবু অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে কোন বিবরণ খুজিয়া পান নাই। এইগ্রন্থে যদি কোন জাজ্বল্যমান বিবরণ থাকে, তবে দীনেশ বাবু কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝিবেন। দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করি যে, তিনি একবার ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম-তরঙ্গ ৫৫০ ও ৫৫১ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখুন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য মামু-পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম ঠাকুরকে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য সকল দেখাইতে দেখাইতে বলিতেছেন—

"অহে নরোত্তম হের দেখহ নির্জ্জনে।
বসিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে॥
এইখানে গোসাঞির জীবন গৌরহরি।
একা আসি বসিতেন এ আসনোপরি॥
ভাগবত পত্মাস্বাদে হৈত অশ্রুপাত।
তাহে গ্রন্থ সিক্ত এই দেখহ সাক্ষাৎ।
এই টোটা মধ্যে যত বিলাস দোঁহার।
তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমার॥
অহে নরোত্তম এইখানে গৌরহরি।
না জানি কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥
ন্যাসী-শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥
প্রভু-সঙ্গোপন সময়ে হইল যাহা।
লক্ষমুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥
এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥
ভকতবৎসল প্রভু গৌরমণি।
সবা প্রবোধিলা যৈছে কাহিতে না জানি॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাস্থল দর্শন করিতে পুরীধামে গমন করেন॥ শ্রীগোপী-

নাথের মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে মামুপণ্ডিত সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে মহাপ্রভুর তিরোধান-লীলা বর্ণনা করিলেন। এখানে বক্তা মামু পণ্ডিত, শ্রোতা ঠাকুর নরোত্তম। আর লেখক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শিষ্য। এই বিবরণ দীনেশ বাবুর নয়নগোচর হইলে তিনি আজগুবি কথার সমালোচনা করিতে গিয়া নূতন রকমের আজগুবি কথার সৃষ্টি করিতেন না।

দীনেশ বাবু যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। এই গ্রন্থের অসংখ্য গুণের প্রশংসা করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটী কথা বলা দরকার যে, গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও সত্যপ্রিয়তা অতুলনীয়। মহাপ্রভুর লীলা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন সেই সকল গোস্বামিগণের পদ প্রান্তে বসিয়া চৈতন্য লীলা শ্রবণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আঠার বৎসর মহাপ্রভুর পার্শ্বচর ছিলেন, অন্তর্দ্ধানের দিনেও নিকটে ছিলেন। মহাপ্রভু রাজপুত্র রঘুনাথকে শিক্ষাদীক্ষার জন্য শ্রীস্বরূপ গোসাঞির নিকট সমর্পন করিয়াছিলেন। স্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। মহাপ্রভুর রসসিন্ধুর ভাণ্ডারী। স্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর রসের ভাণ্ডারটী রঘুনাথের কণ্ঠে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী সেই রস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিলাইয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরহ জ্বালায় স্বরূপ গোসাঞির হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ায় ( হৃদ্‌পিণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ) তিনি লীলাবসান করেন আর রঘুনাথ পুরুযোত্তম ছাড়িয়া উন্মত্তের ন্যায় বৃন্দাবনের দিকে ছুটিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে সকল ঘটনা নিশ্চয়ই কবিরাজ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন। রঘুনাথ দাসের মুখে মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা শুনিয়া

তিনি জাজ্বল্যমানরূপে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শেষ দিনের কথাটী নাই। কারণ নিদারুণ কথাটী লিখিতে ও শুনিতে বুক ফাটিয়া যাইত। যদিও কবিরাজ গোস্বামী শেষদিনের ঘটনা বর্ণনা করেন নাই তথাপি অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা স্পষ্ট ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তথ্য অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে কথা দীনেশ বাবুর স্মৃতিপথে না আসাতে তিনি অনেক বিপাকে পড়িয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে নদীয়া গিয়াছিলেন। তখন অদ্বৈত আচার্য্য নিম্নলিখিত তরজা প্রহেলী মহাপ্রভুকে ঠারেঠোরে বলিয়া পাঠান। আচার্য্য বলিলেন—

প্রভুরে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ১৯শ পরিচ্ছেদ।

জগদানন্দ তরজা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। এবং তিনি যখন নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুকে তরজা বলিলেন মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া "তার যেই আজ্ঞা" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। স্বরূপ গোসাঞি তরজার অর্থ অনুমান করিয়া বলিলেন 'তরজার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।' মহাপ্রভু কৌশলে উত্তর দিলেন।

প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজালাগি কথোকাল করে নিরোধন॥
পূজা নির্ব্বাহন হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥

অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা পূজা করিয়া আবির্ভাব করাইয়াছিলেন, এখন প্রেমবিতরণ কার্য্য শেষ হইলে বিসর্জ্জন দিলেন অর্থাৎ অন্তর্দ্ধান করিতে অনুমতি দিলেন। তরজা শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন। স্বরূপ গোসাঞি বিমনা হইলেন। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই তরজা শুনিয়া অন্তর্দ্দশায় প্রবেশ করিলেন। মহাপ্রভুর বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদের চরমসীমায় উপস্থিত হইলেন।

এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥

মহাপ্রভুকে তখন ভক্তেরা পাহারা দিতেন। রাত্রে বাহির হইতে না পারেন কৃষ্ণবিরহ জ্বালায় ভিত্তিতে মুখ ঘষিতে না পারেন এইজন্য শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে শয়ন করিয়া তাঁহার পা টিপিতে টিপিতে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। ইহার পর আর মহাপ্রভু কোন বাহিরের উৎসবে যোগদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাপ্রভু রথযাত্রার বহুপূর্ব্বেই লীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর সঙ্গে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরের তৃতীয় তরঙ্গে ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি ঠাকুরের আজ্ঞা নিয়া শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে দর্শন মানসে নীলাচলে গমন করিলেন। নরহরি ঠাকুর

শ্রীনিবাসকে গদগদ বচনে কহিলেন, অদ্বৈত আচার্য্য তর্জ্জা করিয়া পাঠাইয়াছেন প্রভু শীঘ্রই লীলাসম্গোপন করিবেন। শীঘ্র চলিয়া যাও, বিলম্ব করিও না।

বালক শ্রীনিবাস যাজিগ্রামবাসী চৈতন্য দাসের পুত্র। মহাপ্রভুকে কখনও দেখেন নাই। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ইনিই গৌড় দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত এই তিন ঠাকুরের ভাবে শ্রীনিবাস নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ এই তিনজনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস নীলাচলে গমন করেন মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিনে। ভক্তিরত্নাকরের তৃতীয় তরঙ্গ ৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—

যত্নপূর্ব্বক বিদায় হইয়া মাতা স্থানে।
চলিলেন নীলাচলে প্রভু দরশনে॥
মাঘ শুক্লা পঞ্চমী দিবস শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন॥

কিন্তু নীলাচলে পৌঁছিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হয়। শ্রীনিবাস পথিমধ্যে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সংবাদ পাইয়া যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভক্তিরত্নাকর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

মহাপ্রভু অদর্শন এ বাক্য শুনিতে।
যে দশা হইল তাহা কে পারে বর্ণিতে॥
কতশত করাঘাত করে নিজ শিরে।
ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ নখে বক্ষঃ চিরে॥
আপনা ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া।
সে বিলাপ শুনি যায় পাষাণ গলিয়া॥

মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
নেত্রধারা দেখি প্রাণ বিদরে সবার॥

শ্রীনিবাসকে মহাপ্রভু স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস নীলাচলবাসী সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কেবল স্বরূপ গোসাঞি ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দর্শন পান নাই। কারণ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় স্বরূপ গোসাঞি যে মূর্চ্ছিত হন্ আর চৈতন্য লাভ করেন নাই, তৃতীয় দিবসে লীলাবসান করেন। রঘুনাথ, মহাপ্রভু ও স্বরূপের বিরহ জ্বালায় উন্মত্তের ন্যায় নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন শ্রীনিবাস রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রার পর নীলাচলে পৌঁছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ৪।৫ দিন পরে শ্রীনিবাস নীলাচলে পৌঁছিয়াছেন। যাজিগ্রাম হইতে দ্রুতবেগে নীলাচলে পৌঁছিতে প্রায় পনর দিন লাগিত। রাজপুত্র রঘুনাথ যখন পলাইয়া নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি অতি দ্রুতবেগে চলিয়া পনর দিনে নীলাচলে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস ও মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের আভাস পাইয়া অতিদ্রুতবেগে চলিয়াছিলেন এবং প্রায় পনর দিনে নীলাচল পৌঁছিয়াছিলেন। এই হিসাবে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানমাঘী পূর্ণিমার দিন। তর্ক হইতে পারে যে দুই এক দিন অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে ত? আমি বলি যে হইতে পারে। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ দিনেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হইবার কথা এবং হিসাবের সঙ্গেও মিলিয়া যায়। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের দিন কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি খণ্ডে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর জন্ম ও অন্তর্দ্ধানের শক ও কত বয়সে অন্তর্দ্ধান স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমান।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥

আরও বর্ণিত আছে যে, মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর শেষে সন্ন্যাস করিয়া আরও চব্বিশ বৎসর ধারাধামে ছিলেন। তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন আর অবশিষ্ঠ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে ছিলেন। মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রগ্রহণের সময় সিংহ রাশি ও সিংহ লগ্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ অষ্টচল্লিশ বৎসর ধরাধামে থাকিয়া ১৪৫৫ শকে অন্তর্দ্ধান করিলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কাল ১৪৫৫ শকের মাঘ মাস। ১৪৫৫ শকে আষাঢ় মাসে অন্তর্দ্ধান করিলে মহাপ্রভুর বয়স তখন ৪৭ বৎসর তিনমাস। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ৪৭ বৎসর তিন মাসকে ইংরেজী হিসাকে Next birthday ধরিয়া ৪৮ বৎসর বয়স বলেন নাই। আর তিনি যখন কত বৎসর কোন্ আশ্রমে কোন লীলা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তখন বোধ হয় যে তিনি তিন মাসকে এক বৎসর ধরেন নাই। বরং তিন মাসকে বাদ দিতে পারিতেন। ৪৮ বৎসরের পরও তিনি তিন মাস ধরাধামে ছিলেন এই তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার উত্তর এই যে, তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কাল ১৪৫৬ শক হয়। কিন্তু তিনি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে অন্তর্দ্ধান হয়েন। ভক্তি রত্নাকর ও প্রেমবিলাস এই উভয় গ্রন্থে উল্লেখে আছে যে, মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে গদাধর পণ্ডিত গোসাঞিকে বলিলেন যে, শ্রীনিবাস আসিতেছে, তাহাকে সান্ত্বনা করিবে এবং তুমি তাহাকে ভাগবত পড়াইবে। শ্রীনিবাস যেন বৃন্দাবন হইতে রূপসনাতন কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল আনিয়া গৌড়দেশে প্রচার করে। শ্রীনিবাস নীলাচলে আসিলে পণ্ডিত গোসাঞি তাঁহাকে বলিলেন যে, তোমাকে ভাগবত পড়াইতে প্রভুর আজ্ঞা আছে। কিন্তু চক্ষুর জলে

ভাগবতের অক্ষরমালা মুছিয়া যাওয়ায় গ্রন্থ অপাঠ্য হইয়াছে। তুমি নরহরি ঠাকুরের নিকট হইতে ভাগবত নিয়া আস। শ্রীনিবাস নরহরি ঠাকুরের নিকট হইতে ভাগবত নিয়া কটকের নিকটবর্ত্তী যাজপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে সংবাদ পাইলেন যে পণ্ডিত গোসাঞির তিরোধান হইয়াছে। শ্রীনিবাস আর্ত্তনাদ করিতে করিতে যাজপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভক্তিরত্নাকর এই দুই প্রামাণিক গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ভক্তগণের অজ্ঞাতসারে বা অলৌকিকভাবে হয় নাই। অন্তর্দ্ধানের দিন মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে গোপীনাথের টোটাশ্রমে বিরাজমান। যাঁহারা পুরী গিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, গোপীনাথের বাগান বাড়ী হইতে সমুদ্র দেখা যায়। ভক্তিরত্নাকর ও অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থ এই বাগান বাড়ীকে অসংখ্যবার টোটা বলিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি গোপীনাথের সেবক। মহাপ্রভুর আদেশ ক্রমে ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিয়া গোপীনাথের আশ্রম কখনও ছাড়েন নাই। একবার মাত্র গৌড়দেশে মহাপ্রভুর অনুগমন করিবার জন্য গোপীনাথের সেবা ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গোসাঞি গম্ভীরায় আসিতেন না মহাপ্রভু স্বয়ং গোপীনাথের বাড়ী আসিয়া পণ্ডিত গোসাঞিকে দেখা দিতেন। এই গোপীনাথের আশ্রম প্রাঙ্গনে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে পণ্ডিত গোসাঞির মুখে অমৃত প্রবাহী ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবন করিতেন। অন্তর্দ্ধানের দিন গদাধর-প্রাণ-নাথ প্রিয় গদাধরের আশ্রমে ভক্তগণ সঙ্গে উপস্থিত, গদাধরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া অন্তর্দ্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গদাধর আঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া মহাপ্রভু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ অন্য ভক্তগণের শ্রবণ-গোচর হইলে তাঁহাদের ক্রন্দন

ধ্বনি উঠিল। মহাপ্রভু নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মদনমোহন মুরলীবদন বৃন্দাবন-চন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে লীলাবসান করিলেন।

ন্যাসী শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥

এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা, স্বকপোল-কল্পিত ঘটনা নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধানের সময় জগন্নাথের মন্দিরে না গিয়া গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন কেন? তাহার তিনটী কারণ। একটী কারণ গোপীনাথের বাড়ীতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার, গোপীনাথের সেবা মহাপ্রভুই প্রবর্ত্তন করেন। প্রিয় গদাধর তাহার সেবক। আর জগন্নাথের মন্দির সর্ব্বসাধারণের, সদাসর্ব্বদা অসংখ্য লোকের যতায়াত। দ্বিতীয় কারণ অন্তর্দ্ধানের সময় প্রিয় গদাধরের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা। তৃতীয় কারণ মহাপ্রভুর জগন্নাথ অপেক্ষা গোপীনাথ প্রিয়তর! যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব- শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, জগন্নাথ ও গোপীনাথে তত্ত্বতঃ অনেক পার্থক্য। মহাপ্রভু স্বয়ং বলিয়াছেন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দন।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দেখেন। আবার বাহ্যদশা উপস্থিত হইলে প্রলাপ করেন যে, কোথায় বৃন্দাবনে ছিলাম, এখন যে আবার কুরুক্ষেত্রে আসিলাম।

"কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম, কাঁহা বৃন্দাবন।" রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভু কাব্য প্রকাশের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন—

যঃ কৌমার হরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

কেন মহাপ্রভু এই শ্লোক পড়েন একমাত্র স্বরূপ গোসাঞি বুঝিতে পারেন। কিন্তু রূপ গোসাঞি মহাপ্রভুর অভিপ্রায় জানিয়া এক শ্লোক রচনা করিয়া ঘরের চালে রাখিয়া দিলেন, মহাপ্রভু রূপ গোসাঞির বাসগৃহে আসিয়া সেই শ্লোক পড়িয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং রূপকে বলিতে লাগিলেন যে, আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব তুমি কেমনে জানিলে? শ্লোকটী এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সখীকে বলিতেছেন,—সখি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে দেখা হইল। আর আমি সেই রাধা দুইজনের সঙ্গমসুখও আছে। তথাপি আমার মন অন্তঃ খেলম্ মধুর-মুরলীর পঞ্চমস্বর-সেবিত যমুনাতীরস্থ বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইতেছে। মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবিত হইয়া ব্যক্ত করিতেছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দেখিয়া আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না। আমার মন মুরলীবদন বৃন্দা--বিপিন-বিহারীর জন্য লুলুব্ধ হইতেছে, মহাপ্রভু তাই মুরলী-বদন গোপীনাথকে দর্শন করিতে করিতে লীলাবসান করিলেন।

ন্যাসী- শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্যকার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুন না আইলা বাহিরে॥

এখানে ন্যাসী শিরোমণি বলার অভিপ্রায় এই যে, মহাপ্রভুর শরীরে কোন ব্যাধি নাই, তথাপি হঠাৎ মায়ায় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসীর শিরোমণি তাঁহার পক্ষে একাজ অতি সহজ। অনেকের বিশ্বাস মহাপ্রভু সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। পুরীতে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা প্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু গোপীনাথের উরুদেশ ভেদ করিয়া সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। সেই বিদীর্ণ স্থান পাণ্ডাগণ কিছু দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া রাত্রে দেখাইয়া থাকেন। গোপীনাথকে পুরীতে টোটা- গোপীনাথ বলে। কেহ মনে করেন টোটা অর্থ ভাঙ্গা। তাহা নয় টোটাতে যে গোপীনাথ। দীনেশ বাবু একবার ভাবিয়া দেখুন টোটা শব্দ দ্বারা কোন স্থান বুঝায়।

ক্রমশঃ

শ্রী বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত।

# সিদ্ধ মহাত্মাগণের তিরোভাব তিথি।

আমাদের পরমারাধ্য প্রভুপাদ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের নিকট হইতে যে সকল কাগজ-পত্র শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দিরে আনয়ন করিয়াছি, সময়াভাবে তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। অদ্য উহার মধ্য হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ মহাত্মাগণের পুণ্য তিরোভাব তিথির

কয়েকটী প্রকাশিত হইল। প্রভুপাদ এগুলি গত ১৩২১ সালে বহু চেষ্টা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের নাম লিখিত হইল ইহাঁরা এক একজন ভুবন পাবন। এবং সর্ব্ব সাধারণেরই সুপরিত।

প্রভুপাদের লেখা হইতে আমরা যতটুকু পাইয়াছি প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য পরম ভাগবতগণের আরাধনা তিনি সম্বন্ধে যিনি যাহা জানেন কৃপা করিয়া "ভক্তিতে" প্রকাশ করিলে বৈষ্ণব জগতের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

১। সিদ্ধ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী) আষাঢ়ী শুক্লাতৃতীয়া।

২। সিদ্ধ শ্রীরামহরি দাস বাবাজী—তিরোভাব (শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী) ভাদ্রী শুক্লাচতুর্থী।

৩। সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী) আশ্বিনী শুক্লা চতুর্থী।

৪। সিদ্ধ শ্রীভগবান দাস বাবাজী—তিরোভাব ( কালনার ) কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অষ্টমী।

৫। মহাত্মা শ্রীহরি গোপাল দাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীসূর্য্য কুণ্ডবাসী ) কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমী।

৬। মহাত্মা শ্রীহরিবল্লভ দাস বাবাজী—তিরোভাব কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমী।

৭। মহাত্মা শ্রীবলরামদাস পণ্ডিত বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীঝাড়ু-মণ্ডলবাসী ) কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া।

৮। সিদ্ধ শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীসূর্য্যকুণ্ডবাসী ) অগ্রহায়ণী শুক্লা অষ্টমী।

৯। সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী ) অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা।

১০। মহাত্মা শ্রীগৌরকিশোর দাস শিরোমণি—তিরোভাব পৌষী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

১১। সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী তিরোভাব ( শ্রীরণবাড়ী গ্রামের ) পৌষী-অমাবস্যা।

১২। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী—তিরোভাব ( শ্রীগোবর্দ্ধন বাসী ) পৌষী শুক্লা দশমী।

১৩। মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভদাস বাবাজী ( শ্রীগৌর ভাতারী ) তিরোভাব—মাঘী শুক্লা দ্বাদশী।

১৩। সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী তিরোভাব ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদ।

১৪। সিদ্ধ শ্রীরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী বা পুরীধামের বড় বাবাজী তিরোভাব ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া।

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

# পারের সম্বল

প্রভু হে, কি আর বলিব আমি।
বিশ্বাস ভকতি বল, নিষ্ঠা রতি সৎফল,
কিছু নাহি ওহে অন্তর্য্যামি॥
সাধু গুরু বৈষ্ণবেতে, ভাগীরথী তুলসীতে,
সর্ব্ব যজ্ঞ সার হরিনামে।
না হইল শ্রদ্ধা রুচি, চিত্ত না হইল শুচি,
একাগ্রতা নাহি আসে মনে॥

ভোগ সুখ লালসায় আত্ম সুখ বাসনায়,
মন মোর সদাই চঞ্চল।
কি করিব হায় হায়, জনম বিফলে যায়,
আত্মঘাতী মুই সে পাগল ॥
সাধু ভক্ত নাম ধরি, বৃথা অভিমানে মরি,
নাহি মোর পরকাল জ্ঞান।
চক্ষে দিয়া মায়া ঠুলি, করিতেছি কত কেলি,
অশান্তি অনলে দহে প্রাণ ॥
দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে, তত্ত্ব বস্তু নাহি মানে,
সংসার বিষম ফাঁদে পড়ে।
দৃঢ় করি সত্য ধনে ধরিতে কভু না জানে,
নিকটে পাইয়া ফেলে দূরে ॥
কাঁদি কাঁদি ঘরে ঘরে, নিতাই সদাই ফিরে,
বলে ভাই "গৌরহরি বল"।
বিনামূলে বিকাইব, ভবপারে ল'য়ে যাব,
"গৌর নাম" পারের সম্বল ॥
নাম নিলে প্রেম হবে, অশ্রু কম্প দেখা দিবে,
প্রেমানন্দে হবে মাতোয়ারা।
অনন্ত কালের তরে, গৌরদাস নাম ধ'রে,
নেচে গেয়ে ভজিবেক গোরা ॥
হা গৌরাঙ্গ হা নিতাই, মোর আর কেহ নাই,
নাহি মোর কোনই সম্বল।
নিজগুণে কৃপা কর, পদযুগ মাথে ধর,
ভব রোগ করহ নির্ম্মূল ॥

দাসানুদাসের দাস　　আমার আমিত্ব নাশ,
কর গৌর নিতাই সুন্দর।
যোগেন্দ্রের গতিদাতা,　　কৃপাময় পরিত্রাতা,
কি বলিব ভাষা নাহি মোর ॥

দীনহীন—শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

# জীবের স্বরূপতত্ত্ব ও ভজনসার গোরা।

জন্মান্তর সহস্রেষু তপোজ্ঞান সমাধিভিঃ।
নরানাং ক্ষীণ পাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

—যোগবাশিষ্ঠ।

বহুজন্ম জ্ঞান, যোগ ও তপস্যাদি সাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে জীব 'কৃষ্ণ-ভক্তিযোগ' লাভের যোগ্য হয়। সমস্ত পুরাণসার শ্রীমদ্ভাগবতেও গরুড় বলিতেছেন, সহস্র যাজ্ঞিক এক বেদান্তীর সম নহে কিন্তু বিষ্ণুভক্ত হইতে সে বেদান্তীও অধম এবং সহস্র বিষ্ণুভক্ত হইতে একজন একান্তি ভক্ত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অগণিত প্রাণী পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাকে কিন্তু শুভ চিন্তা একমাত্র মানবেরাই করিয়া থাকে। তার মধ্যে অধিকাংশই মোক্ষ কামনা করিয়া কশ্চিৎ কেহ মুক্তি লাভ করে; এরূপ মুক্তসিদ্ধ মধ্যে কেহ কশ্চিৎ বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন। এরূপ সৌভাগ্যবান, অতি সুদুর্ল্লভ বলিয়াই সর্ব্বশাস্ত্র ও মহাজনগণ বলিয়া থাকেন। সর্ব্ব শাস্ত্রাদি সুমীমাংসা কারী শ্রীমদ্ভগবত গীতা গ্রন্থে, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে একজন হয়ত জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়ত আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপ-তত্ত্ব বিদিত হয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত জগৎই বাসুদেব-রূপ, এই প্রকারে বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড়ই দুর্ল্লভ। উক্ত শ্লোক দ্বয়ের ইহাই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। জীবাত্মা অনন্ত সাধন বলে মুক্তি লাভ করিলে পর সেই শুদ্ধ জ্ঞানী, মুক্ত জীবের কৃষ্ণে ভক্তি জাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতাতেই বলিয়াছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

"যেজন ব্রহ্মভূত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃতাষ্টগুণ স্বরূপ এবং প্রসন্নাত্মা অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাদির বিগমে অতি স্বচ্ছ তিনি আমা ভিন্ন কোন বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, আর আকাঙ্ক্ষাও করেন না। এবং আমা ভিন্ন ভাল মন্দ সমস্ত ভূতে সম হইয়া আমায় পরাভক্তি অর্থাৎ মদনুভব লক্ষণা মদ্বীক্ষন সমানাকারা সাধ্যাভক্তি লাভ করেন।" অনন্ত শাস্ত্র এক বাক্যে বলিতেছেন যে, অনন্ত জীবনের সাধন সৌভাগ্যে জীবের অনাদি কর্ম্ম বন্ধন ছিন্ন হইয়া কশ্চিৎ জীব মুক্তি লাভ করে এবং সেই মুক্তসিদ্ধ গণের মধ্যে কশ্চিৎ কোন পরম জ্ঞানী, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মহতের কৃপা ব্যতীরেকে জীবের সংসার বাসনাই বিদুরিত হয় না এবং বিষয়াসক্ত চিত্তে কৃষ্ণের আবেশই হয় না।

মহতের কৃপা ভিন্ন কোন সাধনেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই সর্ব্বাগ্রে মহতের কৃপা লাভই ভবপার গমনেচ্ছু ও ভক্তিপিপাসু নির্ম্মল ব্যক্তিগণের একমাত্র অন্তম সোপান। তাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পরম ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবাণী। যথা—

মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য্য নাহি হয়।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ।।

মহাযোগী ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, শিবাবতার শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য মোহমুদ্গরে সর্ব্ব জ্ঞানাদি শাস্ত্রের সুমীমাংসাসার শ্লোকে বলিয়াছেন—

নলিনী দলগত জলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ।।

অর্থাৎ জীবের প্রাণ, পদ্ম-পত্রের বারিবিন্দুর ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল, অতএব এই ভববারিধি উত্তরণের একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গরূপ তরণীর আশ্রয় ক্ষণকালের জন্য নেওয়াও কর্ত্তব্য। অনন্ত সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান ।।
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয় ।।

অনন্ত সাধন সিদ্ধির সুকৃতির ফলে কোন ভাগ্যবান জীব সাধুসঙ্গ লাভের জন্য ঐকান্তিক শ্রদ্ধাজাত হইলে, ভগবৎ কৃপায় তাহার বাসনা পূর্ণ হয়। এবং এই মহতসঙ্গ প্রভাবে জীবের সর্ব্বানর্থ চিরকালের জন্য

বিনষ্ট হইয়া অকৈতব কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়। এই মতই গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব রূপে দীক্ষা ও শিক্ষাদি দানে, ভাগ্যবান জীবের সুকোমল হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিলতা বীজ বপন করেন। যথা—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥

এ হেন সংসারমুক্ত কৃষ্ণভজনোন্মুখ ভাগ্যবান জীব অতি দুর্লভ। যিনি অষ্ট পাশাদি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহার অনন্ত বাসনা বিশুদ্ধ জ্ঞানাগ্নিতে সম্যক রূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, রাজৈশ্বর্য্যকে অসার মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া যাহার প্রাণ পরম পুরুষের জন্য আকুল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছে, তিনিই প্রকৃত মুক্ত, জ্ঞানী ও ভক্তি লাভের অধিকারী। এরূপ মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিই প্রকৃততত্ত্ব লাভের জন্য চির পিপাসিতাবস্থায় উন্মত্ত হইয়া পরেন, তখন কৃপালু ভগবান স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তাহার পিপাসা মিটাইয়া, অনন্ত শান্তির পথে লইয়া যান। এবং ভক্তি-রাজ্যের সাধন ভজনের স্তর ও রস সেবাদি শিক্ষা প্রদান করেন। তদ্রূপ অধিকারী শ্রেষ্ঠ মহাত্যাগী চুড়ামণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহা আবেগ ভরে সর্ব্ব প্রথমেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

কে আমি ? আমায় কেন জারে তাপত্রয়।
কৃপা করি কহ প্রভু কৈছে হিত হয় ॥

আমি কে ? এই তত্ত্বসার প্রশ্নটীর সম্যক আলোচনা চিত্তে জাগ্রত হইলে ও অনুভব করিতে পারিলে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠে। ইহা ভক্তি রাজ্যের কথা। নতুবা চির অন্ধঅভিমানী জীব মায়াকল্পিত অহং রাজ্যে রাজা, প্রজা, মন্ত্রী, সুন্দর, কুলীন, বিদ্বান, শত্রু, মিত্র, স্ত্রী, পুরুষ, ভূত, প্রেত, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ ও দেব দৈত্যাদি সাজিয়া, হাসি, কান্না ও

স্বর্গ নরকাদির কত অভিনয়ই নিত্য করিতেছে। আমি বস্তুটী কি? এবং আমার বলিতে কি আছে? প্রকৃত তত্ত্ব বিচারে দেহ, গেহ, ধন, জন স্ত্রী, পুত্র ও সাম্রাজ্যাদি কিছুরইত অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। সমস্তই পঞ্চভূত ও অবিদ্যার খেলা মাত্র। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই পরিণামে ধ্বংশশীল। জীবের নাম, রূপ, জাতি, মহত্ত্ব, যৌবন ও ঐশ্বর্য্যাদিতে এত অভিমান আসে কেন? তাহা শুধু অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দৈবী মায়া-মোহে। মহৎ কৃপায় একান্ত প্রাণে ভগবচ্চরণে শরণ না নিলে জীবের মায়াপাশ বিদূরিত হইয়া স্বরূপতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয় না। অবিদ্যার দাস অন্ধ জীব অভিমানের ঢক্কা নিনাদ দ্বারা, এই পুণ্য ভূমিকে সয়তানের লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলে মাত্র। অবিদ্যাবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীব, কৃষ্ণ ভক্ত এবং তাহাদের আচরণ দেখিয়া গাত্র জ্বালায় মরিয়া থাকে এবং অনর্থক হিংসা ও নিন্দাবাদ করিয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম দাস মহাশয় "প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকায়" লিখিয়াছেন—

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট,　　দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট,
　　গুণ বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ বিমুখ জন,　　স্ফুর্ত্তি নহে হেন ধন,
　　লৌকিক করিয়া সব জানে॥
অজ্ঞান-বিমুগ্ধ যত,　　নাহি লয় সত মত,
　　অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন,　　জগ মাঝে সেই দিন,
　　বৃথা তার অশেষ ভাবনা।

আত্মাভিমানী, অজ্ঞানী, বিষয়াসক্ত জীবগণ অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এবং এই সমস্ত ভক্তিহীন, নরপশুগণ কৃষ্ণভক্তের মর্য্যাদা ও মহিমা বুঝে না। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবগণ নিত্য ত্রিতাপাদি জ্বালাময় সংসার

দুঃখে ডুবিয়া থাকে। আর কৃষ্ণভক্তগণ নিত্য সেবানন্দরস আস্বাদন করিতে থাকেন। কায়মনোবাক্যে বিষয় হইতে নির্লিপ্ত হইতে না পারিলে চিত্তই শুদ্ধ হয় না; আর অশুদ্ধচিত্তে কৃষ্ণের শরণ মননাদিও হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শিখাইয়া গিয়াছেন—

বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি জ্ঞানে, সমস্ত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগে অর্থাৎ কৃষ্ণপদে অর্পণ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণ সেবার জন্য কৃষ্ণ ভক্তগণ কৃষ্ণের সংসার করেন মাত্র।

সর্ব্ব শাস্ত্র ও মহাজনগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন সর্ব্ব অনাচার পরিত্যাগে কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণভজন কর। সমস্ত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল তৎপদে অর্পণ কর। রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগী বৈরাগী চূড়ামণি শ্রীল সনাতনের প্রাণের মহাবিবেক গম্ভীর প্রশ্নোত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।"

জীবের প্রকৃত স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, এবং তাহার প্রকৃত কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ ভজন। কৃষ্ণ ভজিতে আসিয়া যখন জীব আমিত্ব অভিমানে তাঁহাকে ভুলিয়া গেল; তখন দৈব মায়া আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিল। তাই, জীব-দুঃখ অনুভবশীল মহাজন কবি গাহিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছা মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষ সম হৈনু ॥

জীব শ্রীকৃষ্ণ ভজন স্মৃতি বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং কর্ত্তা সাজিল ; তাই মায়ার দাপটে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ অবিরত জন্ম মরণ ও ত্রিতাপাদি জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্ত জন্ম নানা যোনি পরিভ্রমণরূপ প্রবাহে পতিত

হইয়া, জীব মায়াকল্পিত স্বর্গ নরকাদি নানা রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

*　　*　　*

দৈবী হ্যেষাগুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মে তাং তরন্তিতে॥

গীতা, ভাগবতাদি সর্ব্ব গ্রন্থে শ্রীভগবান ও ভক্ত মহাজনগণের এক মাত্র উপদেশ, একান্ত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে মায়া হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। সাধু, গুরু, বৈষ্ণব ও সদ্ গ্রন্থাদির কৃপায় যখন জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, মায়া তখন আপনিই সরিয়া পড়েন। আর জীবের কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি বহির্ম্মুখ জীবের প্রতিই মায়ার প্রভাব। কারণ অকৃতজ্ঞ, বিরুদ্ধাচারী কুসন্তানগণের প্রতিই পিতা মাতার শাসন। এই শাসন ও শুধু সন্তানকে পথে আনিবার জন্য। প্রকৃত পথে জীব যে পর্য্যন্ত না আসিবে, সেই পর্য্যন্ত মায়ার শাসন দণ্ড থাকিবে। পরম পিতা কৃষ্ণের ভজন বিমুখ হইয়া। পিতৃদ্রোহী পাতকীগণ জন্ম জন্ম ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিয়া থাকে, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে :—

জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

কৃষ্ণোন্মুখ জীবের সাধন ভজনের পরম সহায়কারিণী হন মায়াদেবী। তখন তিনি যোগমায়ারূপে অর্থাৎ পরমাবৈষ্ণবী শক্তি স্বরূপিণী বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিতা। কৃষ্ণ ভক্ত জীব যোগমায়া সাহায্যে নিত্য নব নব রসানন্দে কৃষ্ণ ভজনে আত্মহারা। আর বহির্ম্মুখ জীব নিত্য সংসায় দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত। জীববহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত মায়াকবলে পতিত হইয়া আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে থাকে। আর, "কামক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়"।

এইরূপ লাথি খাইতে খাইতে, অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণার চরম সীমায় পৌঁছিয়া, যদি কোন সৌভাগ্য বশে সাধু বৈদ্যের সঙ্গ পায় এবং আশ্রয় নেয়, তাহা হইলে :—

তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণ ভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। আর সমস্ত অবতারই তাঁর অংশ কলা, বিভূতি মাত্র। তাই সর্ব্ব পুরাণাদি সার শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত করিলেন :—

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

বহু গ্রন্থ ও সার গ্রাহী নিত্য সিদ্ধ মহাজনগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি সাহায্যে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জগতকে জানাইলেন :

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥
স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ গোবিন্দ যাঁর নাম।
সর্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলক নিত্যধাম॥

আর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটী জীব নিচয় তাহার কণাংশের কণা মাত্র। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যৈছে জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কন॥

শ্রীভগবান মায়াধীশ ও সর্ব্বশক্তিমান। আর জীব মায়াধীন ও জন্ম মৃত্যুরূপ কালচক্রে নিষ্পেসিত। সচ্চিদানন্দময় ভগবান অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড জীবের সেব্য আর অনু হইতে অনু জীবচয় তাঁহার সেবক। এই সম্বন্ধটুকু ভুলিয়া পুনঃ পুনঃ চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে, কোন ভাগ্যে কেহ উদ্ধার পায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

বহু জন্মের পর কোন ভাগ্যবলে জীবের হৃদয় নির্ম্মল অর্থাৎ ভজনযোগ্য হয়। তখন সে সদ্‌গুণের জন্য আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়ে; আর তাঁহার ঐকান্তিক প্রাণের টানে শ্রীভগবানই সদ্‌গুরু-রূপে উপস্থিত হন, এবং ভজনে সহায়তা করেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :

গুরু কৃষ্ণরূপ হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করে ভক্তগণে॥
কৃষ্ণ যদি করে কৃপা কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

# বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

**ঢাকা হরিসভা।**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বিগত ৩০শে ফাল্‌গুন হইতে ৬ই চৈত্র পর্য্যন্ত উক্ত হরিসভার বার্ষিক উৎসব হইয়াছে। এবার সভার ষোড়শ বার্ষিক উৎসব। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় এবার তিন দিন যথাক্রমে

"শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিশ্ব-সমস্যা, ছয় গোস্বামী ও বৈষ্ণব সাহিত্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও প্রেমধর্ম্ম।" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। ভক্তি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভার শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব সুলভ সুমধুর কণ্ঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাগুণ কীর্ত্তনে সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ মহোদয় "শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব" বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ মহোদয় অসুস্থ থাকায় বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ তিন দিন ছায়াচিত্রে গৌর-লীলা দেখাইয়া সকল দর্শকেরই প্রাণ গলাইয়া দিয়াছেন। সময়োপযোগী সঙ্গীত শ্রীমৎ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ও দীনেশবাবু উভয়েই করিয়া ছিলেন। সভার উদ্যোক্তৃবর্গের ব্যবস্থা ও পরিচালক বর্গের যত্নে সভার কার্য্য বেশ নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইয়াছে। শেষ দিন অনেক ভক্ত ও দরিদ্রগণ প্রসাদ ভোজন করিয়া পরমানন্দ পাইয়াছে। সভার ঠাকুর সেবার ব্যবস্থা দর্শনে বড়ই আনন্দ হইল; যাহাদের উপর সেবার ভার ছিল তাহাদের বয়স বেশী না হইলেও এমন প্রাণ দিয়া সেবা কার্য্য করিতে খুব কমই দেখিয়াছি। মঙ্গলময় শ্রীগৌরভগবান সভার সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান করুন ইহাই প্রার্থনীয়। ( জনৈক দর্শক। )

**বরাহনগর পাটবাড়ীর** উৎসব গত ১৬ই চৈত্র শেষ হইয়াছে। এবার ভক্ত সমাগম অসম্ভব হইয়াছিল। আমরা গত বারের উৎসবের পর বিস্তৃত স্থানের জন্য আবেদন করিয়া ছিলাম, এবার উৎসব দর্শন করিতে যাইয়া শ্রীমন্দিরের ও অন্যান্য কার্য্যের ব্যবস্থা দেখিয়া খুবই আশা হয় যে, আগামী বারের উৎসবের পূর্ব্বেই বিস্তৃত নাটমন্দির ও বৈষ্ণব খণ্ড সম্পূর্ণ দেখিতে পাইব। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বইচ্ছায় বহু ভক্ত সেবাকার্য্যের ভার লইয়া নিজেকে ধন্য

করিতে প্রস্তুত, তার উপর প্রধান উদ্যোগী আমাদের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দে মহাশয় যে ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে খুব শীঘ্রই পাটবাড়ীর সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা হয়। বৈষ্ণব-জগতের যে সকল্ স্থান লুপ্ত প্রায় হইয়া যাইতেছে সকলগুলি একে একে এই ভাবে সংস্কার হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে।

**কটক, শ্রীশ্রীরাসবিহারী মঠ** হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম এ মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ৩০শে চৈত্র ১৩ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাস দেবের শুভ আবির্ভাব তিথি। তদুপলক্ষে ১৬ই চৈত্র অধিবাস ১৭ই হইতে ২৮শে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ অহোরাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন ২৯শে প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন ও ৩০শে প্রাতে মহাভিষেক ও জন্মোৎসব কীর্ত্তনাদি ১লা বৈশাখ চৌদ্দমাদল যোগে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব হইয়াছে।

**ইউরোপীয়ের বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রীতি।**—মিঃ নিক্‌সন নামক একজন ইংরাজ কিছুদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতার 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে' গমন করিয়া হিন্দীতে একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে এই জানা যায় যে, ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ, ডিগ্রীধারী। ইনিই উরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজ সৈন্যের বিমান-পোত বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। যুদ্ধকালে ইঁহাকে একাকী বিমানপোতযোগে একটী সংবাদ দিবার জন্য ফরাসীদিগের সৈন্যদল মধ্যে পাঠান হয়। ইনি একাকী ঐ বিমানপোতে থাকিয়া নিজেই ঐ পোত চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু বিমানপোতখানি জার্ম্মাণ লাইনের উপরে যাইয়া পড়ায় ইনি ভীত হইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিতে পান যে, ইনি অভীপ্সিত ফরাসী সৈন্যদলের মধ্যেই

আসিয়া পড়িয়াছেন। তখন হইতেই ইনি এই অলৌকিক ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে অত্ম-নিয়োগ করেন। পরে ভারতবর্ষে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার বর্ত্তমান নাম "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম।" ইনি সন্ন্যাসীর ন্যায় গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছেন। ললাটদেশে ইহার তিলক আছে এবং কণ্ঠদেশে তুলসীর মালায় বিলম্বিত দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটী হস্তীদন্তের শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজমান। ইনি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন এবং গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠিত মিঞাপুর, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের প্রকাশিত প্রাচীন মায়াপুর ধাম ও নবদ্বীপের অন্যান্য শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ইহার মতে সাধনা ও সত্য উপলব্ধিই ধর্ম্মের সার। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল প্রেমময় বিগ্রহ, এইজন্য ইনি শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

(হিতবাদী।)

**বৈষ্ণব সভা।**—বহুবাজার ৭নং দুর্গাপিতুড়ি লেন হইতে শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয় জানাইয়াছেন যে, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত ও পণ্ডিত লইয়া "বৈষ্ণব সভা" নামক একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সহিত নটবরবাবু বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পৃথক সভা করিয়া সে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন কিনা জানি না, যদি সম্মিলনী ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে তিনি এই সভা করিয়া থাকেন তবে ইহার কারণ কি, তাহা ভাবিবার ও জানিবার বিষয় বটে। ঘরে ঘরে ধর্ম্মালোচনার জন্য সভা প্রতিষ্ঠা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করিবার জন্য নূতন কিছু করিতে যাওয়া আমরা যেন যুক্তিযুক্ত মনে করি না। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সম্মিলনী যাহা রহিয়াছে কর্ম্মীর অভাবে তাহাই বিশেষ অচল বলিয়া মনে হয়, যদি যথার্থ কার্য্য

করিবারই ইচ্ছা থাকে তবে তাহার মধ্য দিয়া করা যায় কিনা ভাবিয়া দেখা উচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়। যাহা হউক নব প্রতিষ্ঠিত সভার সভাপতি হইয়াছেন মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহোদয়। বক্তা ও কীর্ত্তনকারী গণের নাম যাহা দেখিলাম তাঁহারাতো গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীরই অধিকাংশ। যে ভাবেই হউক ধর্ম্মপ্রচারের মধ্য দিয়া দলাদলি না হয় ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরাও সভার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, সময়াভাবে যাইতে পারি নাই। প্রতি সপ্তাহেই রবিবার অধিবেশন হইতেছে। কার্য্যকারী সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের লিষ্ট পাইয়াছি স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কোন বিষয় জানিতে হইলে ৭নং দুর্গাপিতুড়ি লেন, বহু-বাজার কলিকাতা শ্রীযুক্ত নটবর দত্ত মহাশয়কে লিখিলেই জানিতে পারিবেন।

**শ্রীধামনবদ্বীপ, রাধারমণবাগে** শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ-চরণ দাস দেবের অষ্টধাতুময় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তাঁহার শুভাবির্ভাব তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাণ পাগল হইয়া উঠে, শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় কয়েকদিনই তথায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনামযজ্ঞ, পাঠ, কীর্ত্তন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

**প্রাচীন মায়াপুর।**—শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রমে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রাচীন মায়াপুর উদ্ধারের যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহা যথার্থই প্রসংশার্হ কিন্তু দেশ-বাসী এখনও তাঁহার প্রতি তাদৃশ সহানুভূতি দেখাইতেছেন বলিয়া মনে হইল না। আমরা এবার তাঁহার শ্রীশ্রীনিতাই গৌর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমির নিদর্শন স্বরূপ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলাম। ঠাকুর সেবার ও আশ্রমের যেরূপ অবস্থা

দেখিলাম তাহাতে বড়ই দুঃখ হইল। যে মহাত্মা নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া বাঙ্গালির প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের স্থান নির্ণয় জন্য এমন করিয়া বেড়াইতেছেন তিনি কি অবস্থায় যে আছেন তাহা একবার না দেখিলে বুঝান যায় না। সামান্য কুঁড়েটী হেলিয়া পরিয়াছে, বৃষ্টি হইলে বোধহয় ভূমিস্মাত হইবে। শ্রীবিগ্রহ যুগল তখন কোথায় থাকিবেন? বাঙ্গলায় ধনীর অভাব নাই, ভক্তের অভাব নাই, একাধারে ধনী ও ভক্ত বহু আছেন। তাঁহারা যে নবদ্বীপে যাতায়ত করেন না এমনও নহে; এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই কেন? বাবাজী মহাশয় আমাদিগকে সমস্ত স্থানগুলি বিশেষ ভাবে দেখাইলেন। শ্রীযুক্তবিশ্বরূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীযুক্ত নীলাচলচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্গে আনন্দে আমরা স্থান গুলি দর্শন করিয়া আসিলাম। স্থানটী যথার্থই মনোরম। বাবাজী মহাশয় বহু প্রমান প্রয়োগ দ্বারা ঐটীই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান তাহা স্থির করিয়া গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিয়াছেন, যাঁহারা এ বিষয় কিছু জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীযুক্তব্রজমোহন দাস বাবাজী প্রাচীন মায়াপুর পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া, এই ঠিকানায় সন্ধান করুন।

---

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভক্তির বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হইতে আর তিন মাস বাকী, ভাদ্র হইতে ভক্তির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইতেছে। যাঁহাদের নিকট বর্ত্তমান বর্ষের মূল্য বাকী আছে এই সংখ্যা পাইয়া পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

# ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

## "প্রেম"

শ্যামের বাঁশী বাজিল আজি
গভীর বনে শ্রীরাধা ব'লে,
ঘরের কোণে রাধারাণী
বাঁশরি শুনে আপন ভুলে।
পাগল বাঁশী মোহন তানে
প্রাণে নবীন প্রেম আনে
উতলা মনে ব্যাকুল-প্রাণে
চলে রাণী যমুনা কূলে॥

গলিত বসনা স্খলিত চরণা
নয়ন দৃষ্টি-হারা,
নাহি গো জানে বিশ্ব-বাঁধন
আকুল-পাগল-পারা।
প্রাণে কালো ওরূপ নয়নে
সেরূপ হেরে বিশ্ব ভুবনে
গগনে বিজনে গহন-বিপিনে
কালো হেরে হয় সারা॥

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী।

# শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব।

স্বধুর্ন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণি কনক সদ্ম সঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ প্রণয় ভর লসৎ কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে॥

নবদ্বীপ রমাস্থল অভিন্ন ব্রজমণ্ডল
শ্রীধাম অতি জগ অনুপম।
নাম স্মরণে যার হয় প্রেম ভক্তি সার
হৃদয়ের নাশে পাপ তম॥

শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমির তত্ত্বালোচনা করিতে হয়। শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয় বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ লীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাও তাহাতে॥

ধামতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেশ ও কাল সম্বন্ধে একটী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, Kant প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেশ ও কালের জ্ঞেয় সত্ত্বা (objective Reality)

স্বীকার করেন নাই। ইহাদের মতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ অজ্ঞেয় (unknown and unknowable) কিন্তু দেশ ও কালের একটা রীতি সৃষ্টি করিয়া আমরা বস্তুর পরিচয় দিয়া থাকি ও উহাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকি।

এইরূপ Idealist আমাদিগের দেশেও আছে। আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁহার মতাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকেই দেশ কাল কর্ম্ম প্রভৃতি কোন বস্তুরই পারমার্থিক সত্ত্বা স্বীকার করেন না। এক ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সকলই মায়া কার্য্য—অবস্তু, অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে উহাদের ব্যবহারিক সত্ত্বা না মানিলে কোন কার্য্যই চলে না। ঈশ্বর বলিয়া যাহাকে বলা হয় উহাও মায়াতে উপহিত চৈতন্য ; অতএব সৃষ্টি, লীলা, অবতার প্রসঙ্গ সকলই মায়িক —উহাদের পারমার্থিক কোনও সত্ত্বা নাই। ব্রহ্মের পরাবস্থারূপ—নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নিরঞ্জন।

যোগিগণ পরমাত্ম তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তরে—হৃদয় আকাশে (উহাকেই ছান্দোগ্য উপনিষদে "দহর আকাশ" বলা হইয়াছে সেই "দহরাকাশে") আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা অন্য দেশ, কাল সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু নহেন। তাঁহারা হৃদয়ে আত্মার আনন্দেই বিভোর। অন্তরে পরমাত্মার সত্ত্বানুভব তাঁহাদিগের চরম লক্ষ্য। এই যোগানুসন্ধান বৃত্তির সহিত ভক্তির মধুময় মিলনে হৃদয়ই বৃন্দাবনরূপে বর্ণিত ও অনুভূত হইয়া থাকে।

সাধারণ জন শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে চাহেন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বৃন্দাবন অন্যান্য দেশেরই মত একটী দেশ বিশেষ, লীলা সাধারণ বা কিছু অসাধারণ কর্ম্ম সমষ্টি।

শ্রীভগবানের ধাম রহস্য বা লীলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পূর্ব্বেই একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সে কথাটি এই, যে বস্তু যে জাতিয় সেই

বস্তুর পরিমাপক যন্ত্রবিশেষ বা অনুমাপক প্রমাণ দ্বারাই তাহার পরিমাণ করিতে হয়। যেমন কাপড় মাপিবার গজকাটী দিয়া তরল পদার্থ দুগ্ধাদির পরিমাণ করা যায় না তেমনই তরল পদার্থের পরিমাপক ভাণ্ড দিয়া কঠিন স্বর্ণ রৌপ্যাদি তুলিত করিতে যাওয়াও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎতত্ত্ব ও তাঁহার ধামতত্ত্ব পরিমাণ করিবারও তদনুরূপ পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন। আচার্য্যপাদগণ বলিয়াছেন পরতত্ত্বানুসন্ধানে একমাত্র বেদ—শব্দ—অপ্রাকৃত—অপৌরুষেয় শব্দই নিঃসন্দেহ প্রমাণ। সেই বেদ শ্রীভগবানের ধামকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

এই পরম পদ প্রকৃতির বাহিরে। প্রকৃতির রাজ্য আর কতটুকু। ইহা অতীব মহান্। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একাংশ। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "একাংশেন স্থিতং জগৎ।" ঋগবেদ সংহিতা পুরুষসূক্তে বলিয়াছেন—

এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া সেই মহাপুরুষ-মহিমা। ইহা হইতেও সেই পুরুষ মহানতর। বিশ্বের নিখিল চরাচর তাঁহার একপাদ বিভূতি আরও ত্রিপাদ বিভূতি অমৃতময় দিব্যলোকে বিরাজিত।

এক পাদ বিভূতির নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ॥ ( চরিতামৃত। )

এই ত্রিপাদ বিভূতির মহিমা জ্ঞানীগণের মধ্যেও অনেকে পরিজ্ঞাত নহেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় দ্বারী পরিচয় চাহিলেন। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবিতেছেন "আমি চতুর্মুখ ব্রহ্মা—বেদের যোনি—সনকাদির পিতা, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা আমার আবার পরিচয় চাওয়া কেন?" কোনমতে

পরিচয় দিয়া ক্ষুন্নমনে শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাত করিলেন। ভগবান তাহার মনের সন্দেহ নিরসন করিবার ইচ্ছা করিয়া, অন্তরের সকল গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিবার জন্য দ্বারকার রাজসভায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাগণকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আনাইলেন। শত-সহস্র অযুত সংখ্যক বদনধারী ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁফরে পড়িয়া গেলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বুঝিলেন তিনি ভগবৎ তত্ত্বের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন, উহা বহু, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় নহে। পরম পুরুষের মহিমার পূর্ণ পরিচয় কেহ জানে না। একপাদ বিভূতির রাজ্য প্রাকৃত রাজ্য—নশ্বর রাজ্য—ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনের রাজ্য—পরম সত্যের সম্বন্ধে ইহা মায়ার রাজ্য। পরম সত্যরাজ্য নিত্য—শাশ্বত—সনাতন—অমৃতময়। এই আনন্দময় রাজ্য বিরজার পারে—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্॥

শ্রীভাগবত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ এই ত্রিপাদ বিভূতিময় রাজ্যকে একটী অপূর্ব্ব কমলের ন্যায় অনুভব করিয়াছেন। এই অভিনব কমল বিরজা নদীর জলে অপূর্ব্ব দীপ্তি বিস্তার করিয়া বিরাজিত আছে, উহাকে ভক্তগণ শ্রীভগবানের ধাম বলিয়া অনুভব করেন। কমলের দলসমূহের প্রতি স্তরে ভগবানের অবস্থানের বৈচিত্র ও ইঁহাদের স্বীকৃত। কমলের উপরিভাগে শ্রীভগবানের পরম প্রিয় মিলন স্থান। এই কমলটি সহস্রদল। উহার কর্ণিকার উপরে ছয়টী কোন বিশিষ্ট মহৎযন্ত্র। ছয়টী কোণে ছয়টী খুঁটী। উহারা কীলক বলিয়া কথিত। যিনি যে সাধনাই করুন না কেন, যখন যন্ত্র আঁকিয়া তাহার উপর শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করা হয়, তখনই জানিতে হইবে উহা সেই শ্রীভগবানের ধামগত মিলন-পীঠেই আহ্বান। এই ধাম সাধারণ লোকলোচনের অদৃশ্য। যাহা অদৃশ্য তাহার সত্তা অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে যে সকল দেশান্তরে গমন করিয়া

সেই সকল দেশ প্রত্যক্ষ করা হয় নাই সেগুলিকেও অস্বীকার করিতে হয়। ঐসকল দেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া যাঁহারা সেই দেশে গমন করিয়াছেন তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া অথবা গ্রন্থাদিতে সেই দেশের বিবরণ পাঠ করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। যে সকল ঋষিগণ সাধারণের অদৃশ্য ধাম দর্শন করিয়াছেন তাহাদের কথা এই—

সহস্র পত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম।
তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবম্॥
কর্ণিকারং মহদ্ যন্ত্রং ষট্‌কোণং বজ্রকীলকং।
ষড়ঙ্গ ষট্‌পদীস্থানাং প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্॥

এই পরম রমণীয় বৃন্দাবন ধাম শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়। ইহাকে ভগবানের দেহ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে।

পঞ্চ যোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃত বর্ষিণী॥

আরও কত অবর্ণনীয় মহিমা এই ধামের আছে। ধাম শ্রীভগবানের স্বরূপের ন্যায় বিভু।

প্রকৃতির পরে পরব্যোম নামে ধাম।
শ্রীকৃষ্ণ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান
সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম॥
তাহার উপর ভাগে কৃষ্ণ লোকখ্যাতি।
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজ লোকধাম।
শ্রীগোকুলে শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥

শ্রীভগবান যোগমায়ার অবলম্বনে মরজগতে নামিয়া আসেন। যোগমায়া—কৃপাশক্তি—মিলন ঘটকিনী জীবের দুয়ারে ভগবানকে মিলাইয়া দেন।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি　　বিশুদ্ধ সত্ত্বা পরিণতি
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন　　ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

শ্রীভগবানের প্রকাশিত স্বরূপে—অনাবৃত স্বরূপে বিহারের কালে তাঁহার অপ্রাকৃত—প্রকৃতির অপর পারের—অচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত ধাম সেই সময়ে অনাবৃত স্বরূপে লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়া ভৌম বৃন্দাবনরূপে প্রকাশ হয়। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য ইহা সকলের—সাধারণের কাছে পাওয়া ধাম। অপ্রকাশিত ধাম জীব-জগত যোগে-ভাগ্যে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়, আর এই প্রকট বিহারের সুযোগে প্রাকৃত রাজ্যের জীব পশুপাখীও অনাবৃত আনন্দ স্বরূপের প্রেমের টানে পড়িয়া কৃতার্থ হইয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া রসিক ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবন আউর গোলোক তৌলে তুলসী দাস।
যো ভারী উহ্ রহ্ গিয়া হাল্‌কী চঢ়ে আকাশ॥"

শাস্ত্র বলিতেছেন—অতি সূক্ষ্মরূপে জীবের অন্তরে ভগবৎশক্তি খেলা করিতেছে। "সূক্ষ্মাণামপি অহং জীবঃ" স্থানান্তরে দেখা যায়, একটী কেশাগ্রের শতাংশের শতাংশ বলিয়াও এই সূক্ষ্মতার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া

হইল বলিয়া তত্ত্বদর্শি ক্ষান্ত হয়েন নাই। অথচ এই সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপই যতক্ষণ দেহকে জ্ঞান-চেতনাময় স্পন্দনে আনন্দময় করিয়া উদ্ভাসিত করিয়া রাখিতেছে ততক্ষণ এই দেহের কতই না যত্ন আদর। এই সূক্ষ্ম স্বরূপও আবার একটি দুইটি করিয়া অস্থি,মজ্জা, প্রভৃতি কতকগুলি আবরণে আবৃত; এই আবৃত চৈতন্যস্বরূপকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমাদিগের প্রাণে টান কত! একবার ভাবিয়া দেখুন। যাঁহাকে আমরা এত ভালবাসি সে কে? সে কি ঐ দেহ? না তাহা কখনও হইতে পারে না। মৃতদেহকে কে আদর করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে? যে তাহা করে, সে বাতুল—পাগল। আমরা ভালবাসি চৈতন্যকে—সে আছে ঐ দেহের পরতে পরতে লুকাইয়া—অন্তরের তলে ডুবিয়া তাহাতেই উহার অনুসন্ধান এত তীব্র—আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল। কেমন করিয়া সেই আনন্দ চৈতন্যকে বাধাহীন ভাবে—অনাবৃতরূপে বুকের কাছে পাইতে পারি তাহারই নিমিত্ত এরূপ চেষ্টা। তাহাতেই জীবের অন্তরে অনুসন্ধান। জীব যে সুখের খোঁজ—যে চৈতন্য স্বরূপের খোঁজ করিতে যাইতেছে উহা কতটুকু—চৈতন্য-সমুদ্রের যে এক ফোটাও নয়। উপনিষদ বলিয়াছেন "অস্য ( আনন্দস্য ) মাত্রামুপজীবন্তি লোকাঃ।" ছিঁটে ফোঁটাতেই জগতটা বাঁচিয়া আছে। পূর্ণ আনন্দকে পাইয়াছে কবে?

বৃন্দাবনেই এই পূর্ণানন্দের পূর্ণ বিকাশ—অনাবৃত প্রকাশ। তাহাতেই পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ সকলেই এই বৃন্দাবনের দিকে আকৃষ্ট। উহা আনন্দের অনাবৃত বিচরণ ভূমি। পথে, ঘাটে, জলে, স্থলে, বৃক্ষে লতায় সর্ব্বস্থলে আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী।

# অনুতাপ।

এ কোন্ বিপাকে সংসারে এসে শত অপমান সহিয়া,
মরিতেছি হায় আমি দুর্ভাগা শতেক দুঃখে দহিয়া,—
ঘৃণা অবহেলা লাঞ্ছনা কত নিন্দার বোঝা বহিয়া,
চলিয়াছি হায়, জানি না কোথায়, কথাটীও নাহি কহিয়া!
নীরবে চলেছি আপনার মনে হৃদয়ে দুঃখ ভরিয়া,
ব্যথা কে বুঝিবে,— বুঝাইব কা'রে, মরমেই থাকি মরিয়া।
এ দারুণ ব্যথা দিয়ে কেন বিধি পাঠায়েছ মোরে এ ভবে?
আর ত পারি না সহিতে এ জ্বালা,—জুড়াবে এ জ্বালা বল কবে?
লও টেনে লও সংসার হ'তে আমারে করুণা করিয়া.
হে করুণাময়, এই প্রার্থনা করি গো চরণ ধরিয়া।
রাখিও না মোরে আর এ সংসারে,—আমারে টানিয়া নাও গো!
পুণ্য শীতল চরণের ছায়ে একটুকু স্থান দাও গো!
এত জ্বালা স'য়ে, এত ঘৃণা ল'য়ে থাকিতে পারি না আর গো!
আর ত এ বোঝা বহিতে পারি না,—হ'য়েছে বড়ই ভার গো!
এ পাপের বোঝা বহিয়া আমার, বল আর কোথা যাইব?
ত্রাণ কর মোরে,—তুমি না তারিলে কিসে নিস্তার পাইব?
গত জনমের কত দুষ্কৃতি ছিল গো আমার নিশ্চয়,
এ জনমে তাই এই দুর্গতি দুর্দ্দশাটুকু সমুদয়।
স্বীকার করিনু এই কথা আমি মানিলাম এ সকল গো;
তুমি তবে কেন আছ পাপহারী ব্যথিতের সম্বল গো!

পাপী তাপী যদি ডেকে নাহি পাবে, তরাবে না যদি তুমি হায় !
শুধাই তোমারে,—তুমিই বল গো, তাহাদের হবে কি উপায় ?
শুধু পাপহারী দয়াল শ্রীহরি নামটী নিলে ত হবে না ;
পাতকীর গতি না করিলে তব কলঙ্কের বাকী র'বে না।
পাপী তাপী আমি, তুমি পাপহারী,—ঘুচাও আমার পাপ গো !
তোমার চরণে কাতরে জানাই আজি মোর অনুতাপ গো !!

শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাবসান

( শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস লিখিত। )

( ২ )

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, মহাপ্রভু সশরীরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন কি না ? আমার উত্তর যে, মহাপ্রভু কখনও ভেল্কীবাজি দেখাইতে চান নাই। যদিও নদীয়ায় শ্রীবাস প্রাঙ্গণে একবার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পর তিনি ভক্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন, মহাসিন্ধুর ন্যায় মহাভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা লোকাতীত। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট ম্লান, ভগবানের ভগবত্তা তাঁহার নিকট হেয়। ঐশ্বর্য্য লুকান যাঁহার স্বভাব যিনি ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তিনি কখন এমন ব্যাপার করেন নাই। তবে মহাপ্রভুর ভুবনমোহন দিব্যতনু কোথায় সমাধিস্থ হইয়াছিল ? আমার মনে হয় গোপীনাথ যে উচ্চ বেদিকার

উপর দণ্ডায়মান মহাপ্রভু সেখানে সমাধিস্থ। অথবা পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে যেখানে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি বিদ্যমান, মহাপ্রভু সেই স্থানে সমাধিস্থ। মহাপ্রভুই গোপীনাথ, একাধারে রাধাকৃষ্ণ। তাই মহাপ্রভুর দিব্যতনু গোপীনাথের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছেন। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির সমাধিও এই গোপীনাথের মন্দিরে। গদাধর কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধিকা, তাই হয়ত মহাপ্রভুরই পার্শ্বে সমাধিস্থ। একচক্রাবাসী কোন এক বৈষ্ণব আমার এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর সাধারণ লোকে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা প্রচার করে। তাহার মধ্যে প্রধান প্রবাদ যে, তিনি গোপীনাথের উরুদেশ ভেদ করিয়া সশরীরে অন্তর্দ্ধান করেন। প্রকৃত ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে, এইরূপ প্রবাদের যথেষ্ট কারণ আছে। গোপীনাথ গোপীনাথ নহেন যদি মহাপ্রভু তাঁহার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট না হয়েন। তাই গোপীনাথের পাণ্ডারা ঐকান্তিক বিশ্বাসের সহিত এই প্রবাদটী প্রচার করিতে লাগিলেন। জগন্নাথের পাণ্ডারা দেখিলেন যে, জগন্নাথের প্রাধান্য কমিয়া যায়, তাই তাহারা প্রচার করিলেন যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের সঙ্গে মিশিয়া গিয়ায়ছন। একজন পাণ্ডা সেই দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। লোচন ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের শেষে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে ধানসী রাগ শীর্ষক পদ্যে একটী গল্পের যোজনা করা হইয়াছে। অনেকদিন পূর্ব্বে যখন গ্রন্থখানি পড়িলাম, তখন মনে হইয়াছিল যে, লোচন দাস ঠাকুর প্রচলিত প্রবাদটী অবলম্বন করিয়া গান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন পয়ারগুলি মনোযোগের সহিত পড়ামাত্র প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হইল। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রসঙ্গ জোর করিয়া অবতারণা করা হইরাছে। ভাষা অস্পষ্ট—দুর্ব্বোধ্য। কাজেই দীনেশ বাবু মনগড়া অর্থ করিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত অংশের বিষয়গুলি অসংবদ্ধ। মাঝে

মাঝে লোচনদাস ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত ভাষা অবিকল আবৃত্তি করা হইয়াছে। এই অংশটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধারণা হইবার পর দেখিলাম যে, মূল গ্রন্থখানি লোচনদাস ঠাকুর এই প্রক্ষিপ্ত অংশ বর্ণনার পূর্ব্বেই শেষ করিয়াছেন।

শুন সর্ব্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শেষখণ্ড সার কহে এ লোচনদাস॥

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পুস্তকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, একখানি সংস্কৃত লাইব্রেরীর পুঁথিতে এবং ১৭৪৪ শকাব্দায় মুদ্রিত পুস্তকের এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদ্যগুলি কেবল মাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং আর কোন রকম দ্বিধা রহিল না যে, আধুনিক গ্রন্থে অতিরিক্ত বর্ণনা যাহা গ্রন্থ শেষে আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। যাহা হউক মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥
বিস্তারিতে পুস্তক যে হয়ত অনেক।
সংক্ষেপে কহিব কথা শুন সর্ব্বলোক॥
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্রঘরে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে চলিলা মহাপ্রভু।
এমন ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কভু॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে।

সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বর মন্দির ভিতরে উত্তরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এ দেহ ত শরণ॥
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥
গুঞ্জা বাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইলা তখন॥
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুনহ পাড়িছা।
ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা॥
ভক্ত আর্ত্তি দেখি পাড়িছা কহয়ে তখন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

এ বোল শুনিয়া ভক্তে করে হাহাকার।
শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর দত্ত সে মুকুন্দ।
গৌরিদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ॥
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস।
উৎকলের সভে কান্দি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥

লোচনদাস ঠাকুর শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের শিষ্য এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে লোচনদাস ঠাকুরকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলখানি অতীব ভাবপ্রবণ ও মধুর। লোচনদাস দেশে দেশে চৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদের নিয়ম অনুসরণ করিয়া অন্তর্দ্ধান লীলা বর্ণনা করেন নাই। আর তিনি যদি করিতেন, তবে পাষাণ গলান গানের সৃষ্টি করিতেন। এমন কষ্টসাধ্য কবিতা রচনা করিতেন না। আর মহাপ্রভুর মুখে "কলিযুগ আইল এ দেহত শরণ" বলিয়া কলিযুগের ভয় দেখাইতেন না। মহাপ্রভুরগণ কলিযুগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। "প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার" (কোন একটী গানের প্রথম চরণ।) মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় কলিযুগ আসে নাই। ঘোর কলিকালে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন। নয়নানন্দের একটী সুপ্রসিদ্ধ গানের প্রথম দুই চরণ এই—

কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন ধরম করম রহুঁ দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় লেখক কয়েকজন ভক্তের নাম করিয়াছেন, তাহাতে লেখকের জ্ঞানের (?) পরিচয় পাওয়া যায়। সনাতন আর হরিদাসের নাম করিয়াছেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

জানেন যে সনাতন তখন বৃন্দাবনে। এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। কিন্তু একথা সকলেই জানেন যে হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে। মহাপ্রভু স্বয়ং সমুদ্রতীরে তাঁহাকে সমাধি দিয়াছিলেন। আর ছোট হরিদাসকে তিনি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ছোট হরিদাস শোকে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। মহাপ্রভু সংবাদ পাইয়া বলিলেন "স্বকর্ম্মফল-ভুক্ পুমান্"। পুরীতে দুইজন হরিদাস মাত্র ছিলেন।

বড হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভু পাশ॥ (চরিতামৃত।)

লোচনদাস ঠাকুরের এমন স্মৃতিভ্রম ও মতিভ্রম হইবার কথা নয়। গৌরপদ তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় লোচনদাস ঠাকুর সম্বন্ধে যে সমালোচনা আছে, তাহাতে দীনেশ বাবুর প্রবন্ধ হইতে তাঁহার মতের উল্লেখ আছে। দীনেশ বাবু চৈতন্য মঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার গতি কবিত্বের ফুল্লপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দীনেশ বাবু লোচন দাসের নিকট হইতেই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের তারিখ তিথি নিয়াছেন। অবশ্য জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে না থাকিলে তিনি গ্রহণ করিতেন না। লোচনদাস ঠাকুর ভাবে উন্মত্ত। তিনি দিন তারিখের ধার ধারেন না। আর একটা কথা যে, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম তাহার অর্থ দীনেশ বাবু বুঝিতে পারেন নাই অথবা নিজের মত সমর্থন করিবার জন্য মনগড়া অর্থ করিয়াছেন। বৈশাখের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "চৈতন্যদেবের তিরোধান শীর্ষক প্রবন্ধে দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একথা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত অংশের লেখকের স্পষ্ট মত এই যে, মহাপ্রভু জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সেইখানেই অন্তর্হিত হন। গুঞ্জাবাড়ীতে

একজন পাণ্ডা দেখেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। তখন জগন্নাথদেব রথযাত্রার পর গুঞ্জাবাড়ীতে বর্ত্তমান। ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থে এই প্রবাদটীর বর্ণনা এইরূপ আছে—

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল হা নাথ বলিয়া॥
প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল।
ভক্তগণ মনে বহু আনন্দ জন্মিল॥
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিয়া।
গৌরাঙ্গ প্রকাশ সভে অনুমান কৈলা॥

এখানে শ্রীমন্দির জগন্নাথদেবের মন্দির। গুঞ্জাবাড়ী নহে। সিংহদ্বার বলিতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারকে বুঝায়, আর কোন দ্বারকে বুঝায় না। পুরীবাসী সকলেই একথা জানেন। গুঞ্জাবাড়ীতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান, এটা দীনেশ বাবুর আবিষ্কার। দীনেশ বাবু পুরীতে অন্ততঃ একবারও গিয়াছেন এবং গুঞ্জাবাড়ীতে "শত-শতদল-নিন্দিত মহাপ্রভুব চরণচিহ্ন" দেখিয়া মোহিত হইয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলেন ঠিক এই স্থানে পাণ্ডারা তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সমাধি পাণ্ডারা দিতে গেলেন কেন? দীনেশ বাবু তাঁহার বান্ধব কাহাকেও খুঁজিয়া পাই-লেন না? দীনেশ বাবু কি জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহে মহাপ্রভুর শত-শতদল বিনিন্দিত পদচিহ্ন দেখেন নাই? যে প্রস্তরের উপর মহাপ্রভু অষ্টাদশ বৎসর দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া-ছিলেন, সেই প্রস্তরে তাঁহার পদচিহ্ন আছে। সেই প্রস্তরখণ্ড মন্দির হইতে তুলিয়া বাহিরে ছোট একটী দালানের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন ভক্তিমতী মহিলাগণ মহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন পুষ্পচন্দনে সুশোভিত করেন। এই চরণচিহ্ন এত প্রকাশ্য স্থানে যে, দীনেশ বাবু অবশ্যই তাহা দেখিয়াছেন।

অনেকে সেই চরণচিহ্ন দেখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। দীনেশ বাবু কেন অনুমান করিলেন না যে, মহাপ্রভুকে ঐস্থানে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। মহাপ্রভুর পদধূলিতে পুরীর কোন্ স্থান পূত হয় নাই? বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করিতেছেন যে, গম্ভীরায় মহাপ্রভুর সমাধি— সেখানে মহাপ্রভুর কমণ্ডলু ও কাঁথা আছে এবং মহাপ্রভুর মূর্ত্তি আছে। সেইখানেই মহাপ্রভুর সমাধি, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমান তো দোষের নয়। কিন্তু তিনি দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার সমালোচনা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু তিনি ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ পড়েন নাই বলিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

দীনেশ বাবু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের এক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, গুণ্ডিচাগৃহে যে মহাপ্রভুর সংগোপন হইয়াছিল তাহার আভাস ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সোঽয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ গুণ্ডিচা।
তে তে দিগ্বিদিগাগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ।
আরামাশ্চ ত এব নন্দনবন শ্রীণাং তিরস্কারিণঃ।
সর্ব্বাণামেব মহাপ্রভুং বিনা শূন্যানি মন্যামহে॥

দীনেশ বাবু "দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ" বাদ দিয়া গিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সূত্রধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে নটরাজ, দেখ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ নীলগিরীশ্বর জগন্নাথদেব সম্মুখে বিরাজমান, সেই গুণ্ডিচা যাত্রা বা রথযাত্রা উপস্থিত। দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত পুণ্যাত্মা ভক্তগণ জগন্নাথ দেবের দর্শনাভিলাষে দণ্ডায়মান। আর নন্দনবনের শোভা অপেক্ষাও শোভাশালী সেই উপবন সমূহ বিরাজমান রহিয়াছে। তথাপি মহাপ্রভু বিনা আমার সমুদয় শূন্য বোধ হইতেছে। এখানে গুণ্ডিচা যাত্রার কথা

আছে, সুতরাং দীনেশ বাবুর দৃঢ় ধারণা হইল, মহাপ্রভুকে ঠিক গুণ্ডিচা বাড়ীতেই সমাধি দেওয়া হইয়াছে। কবিকর্ণপুর আর কেহ না বুঝিতে পারে এইরূপভাবে দীনেশ বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়াছেন। এই শ্লোকে প্রতাপরুদ্র বুঝাইয়াছেন যে, আনন্দের সব জিনিষ আছে, কিন্তু মহাপ্রভু বিনা আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত। গুণ্ডিচা যাত্রাকে আনন্দকর বিষয়ের সঙ্গে এক পর্য্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। গুণ্ডিচায় মহাপ্রভুর সমাধি থাকিলে গুণ্ডিচা শোকোদ্দীপক, আনন্দকর নহে। সুতরাং দীনেশ বাবুর তর্ক তাঁহার বিরুদ্ধ-মত স্থাপন করে। এখন দেখা যাক্, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে কি আছে এবং এই গ্রন্থখানি কি জাতীয় পুস্তক। ঐ গ্রন্থের বিজয় খণ্ডে আছে যে, যম একদিন ব্রহ্মার নিকটে মন্ত্রণা করিতে গেলেন। তিনি নিবেদন করিলেন যে, যমালয় শূন্য হইল, চৈতন্য ঠাকুর সব পাপী উদ্ধার করিলেন, আর পাপী নাই।

যমালয় শূন্য হইল আর পাপী নাই।
শমনের কথায় ব্রহ্মা হাসেন সে ঠাঞি।
ইন্দ্র শঙ্কর সঙ্গে চলিলা আপনে।
সকল দেবতা মেলি করিয়া ধরণী॥
নীলাচলে নিশাএ চৈতন্য টোটা গ্রামে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল ক্রমে ক্রমে॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি শুক্ল অঙ্গীকার করি।
রথ পাঠাইহ যাব বৈকুণ্ঠ পুরী॥
নিত্যানন্দ গেলা রথযাত্রার নিকট।
অদ্বৈত চন্দ্রেরে সব কহিলা নিষ্কপট॥

এখানে বলিয়া রাখি যে, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ কেহই তিরোধানের সময়

পুরীতে ছিলেন না। অদ্বৈত গোসাঞি মহাপ্রভুকে তরজা করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

আটাইস বৎসর আমি নীলাচলে রহি।
স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি॥

তারপর—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটায় বাজিছ বাম পাএ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্ব পারিষদ-সঙ্গে।
চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানা রঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা বর্ণে দিব্যমাল্য আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আন, রথ আন, ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু কৈল আরোহণ॥
মায়ার শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥
অনেক সেবক সর্প দংশাইঞা মৈল।
উল্কাপাত বজ্রপাত ভূমিকম্প হৈল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেল শচী ঠাকুরাণী॥

এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সাহিত্য পরিষদ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তক প্রচার করেন। জয়ানন্দের নাম কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে নাই। জয়ানন্দের নামে কোন সঙ্গীতও কেহ কোন দিন শুনে নাই। কিন্তু জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম সুপরিচিত। এই গ্রন্থে এমন কয়েকটা কথার উল্লেখ আছে, যাহা আধুনিকেরা জানিতে ইচ্ছুক। যথা হরিদাস ঠাকুরের পিতামাতার নাম, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান ইত্যাদি। পুস্তক পাঠে বোঝা যায় যে, জয়ানন্দ ঠাকুরের বৈষ্ণবতা খুব আছে। কিন্তু যাহা প্রধান বৈষ্ণবেরা বর্ণনা করেন নাই, তাহা তিনি কেন করিলেন, জানি না। এই পুস্তকের লেখক যিনিই হউন, তাঁহার ভাবের বর্ণনা ব্যতীত বিষয়ের বর্ণনার উপর নির্ভর করা চলে না। একটী সর্ব্ববাদিসম্মত সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা যে, মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস করেন। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লিখিত আছে যে, তিনি রাত এক প্রহরের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস করিয়াছিলেন। এইরূপ গ্রন্থে যদি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কাল ও তিথি নির্দ্দেশ থাকে, তাহা কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য সহজেই বোঝা যায়। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে হরিদাস ঠাকুরের পিতা-মাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পিতামাতার নাম অন্য আধুনিক গ্রন্থে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অদ্বৈত গোসাঞি মহাপ্রভুকে তরজা করিয়া বিদায় দিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরও সেই কথায় সায় দেন। কিন্তু জয়ানন্দ বলেন যে, অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে অদ্বৈত গোসাঞি নীলাচলে ছিলেন এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ও নিত্যানন্দকে বলিলেন "আমি ঠিক বলিতেছি যে আমি ইহলোক ত্যাগ করিব।" তার পরই রথের সময়

নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পায়ে একটী ইষ্টকের আঘাত লাগে। তাহার পর নরেন্দ্র-সরোবরে পারিষদ সঙ্গে জলক্রীড়া করেন। ষষ্ঠীর দিন পায়ের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। এদিকে অদ্বৈত গোসাঞির বাড়ী হইতে বুঝি কোন টেলিগ্রাফ (?) আসিয়াছিল যে, তিনি অতি সত্বর চলিয়া না আসিলে তাঁহার চাকরী (?) থাকে না, তাই তিনি মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় রাখিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন 'এই আমার সঙ্গে শেষ দেখা'—

অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড় দেশে।
নিভৃতে তাঁহারে কথা কহিল বিশেষে॥

মহাপ্রভু গোপীনাথের টোটাশ্রমে শয়ন করিলেন এবং পণ্ডিত গোসাঞিকে বলিলেন, 'আগামী দশদণ্ড রাত্রে আমি মায়ার শরীর ত্যাগ করিব! এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মহাপ্রভু লীলা সম্বরণ করিলেন।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি শুনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা শচী ঠাকুরাণী।

অদ্বৈত গোসাঞি বৃদ্ধ লোক। সপ্তমীর দিন তিনি বেশী দূর যাইতে পারেন নাই। হয়তঃ সাক্ষীগোপাল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন পথে না নবদ্বীপে? নিত্যানন্দও মহাপ্রভুকে মৃত্যুশয্যায় রাখিয়া অদ্বৈতের অনুগমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের দুই একদিন পূর্ব্বে অন্ততঃ নবদ্বীপ রওনা হইয়াছিলেন। আরও একটী কথা যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে কেহ লীলা সম্বরণের কথা পথে বলে নাই। পাছে হয়তঃ একজন লোক গিয়াছিলেন। যেই নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত নবদ্বীপে পৌছিলেন, সেই তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিলেন এবং তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইলেন। এই সকল অসংলগ্ন কথার মধ্যে একটী সত্য কথা

আছে যে, মহাপ্রভু গোপীনাথের টোটায় অন্তর্দ্ধানের সময় ছিলেন। এবং টোটার অধিকারী প্রিয় গদাধর পণ্ডিতকে লীলা-সম্বরণের কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের সঙ্গে এ সম্বন্ধে জয়ানন্দের একমত।

গোপীনাথের বাড়ীকে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থই টোটা বলিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন। টোটা আরও ছিল। কিন্তু পণ্ডিত গদাধর গোসাঞি যেখানে ছিলেন তাহা গোপীনাথের টোটা। কেহ কোনদিন গুণ্ডিচাকে টোটা বলেন নাই। দীনেশ বাবুই এ কথা মৌলিক আবিষ্কার করিবার জন্য সকল গ্রন্থকে অগ্রাহ্য করিয়া গুণ্ডিচা বাড়ীকে টোটা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কাশীমিশ্রের বাড়ীই টোটা। কিন্তু কাশীমিশ্রের বাড়ীও টোটা নয়। তিনি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে উল্লেখ করিয়াছেন—

সিন্ধুতটে চৈতন্য বিশ্রাম স্থান টোটা।
তাঁহারে পাঠাও ভোগ অন্ন ব্যঞ্জন পিঠা॥

সিন্ধুতটেই গোপীনাথের টোটা অবস্থিত। কাশীমিশ্রের বাড়ী সিন্ধু-তটে নয়। ভক্তিরত্নাকর অসংখ্যবার গোপীনাথের বাড়ীকে টোটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান গোপীনাথের মন্দিরে আর লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গলের শেষভাগে প্রক্ষিপ্ত অংশের লেখকের মতে এবং অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থ মতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান জগন্নাথ-মন্দিরে। গুঞ্জাবাড়ীতে অন্তর্দ্ধান একথা কেহই বলেন নাই। দুই পক্ষ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দীনেশ বাবু তাঁহার স্বাধীন মত স্থাপন করার জন্য গুঞ্জাবাড়ীকে টোটা বলিয়াছেন এবং জয়ানন্দের ও চৈতন্যমঙ্গলের প্রক্ষিপ্ত অংশের মনগড়া অর্থ করিয়া বলিয়াছেন, মহাপ্রভু গুঞ্জাবাড়ীতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

শ্রীমন্ জীব গোস্বামীপাদ বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তালপাতার লেখা দেখিলেই লোকে শাস্ত্র মনে না করে, এবং যে সে অসদুপায়ে নিজের মত প্রকাশ করিতে না পারে এজন্য তিনি এমন কঠোর শাসন প্রবর্ত্তন করেন যে, কেহ নূতন গ্রন্থ লিখিলে তাহা বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত করাইতে হইত। এই শাসন যে কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সেই অনেক দিনের শাসন দূরীত হইলে অনেক গ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে রচিত হয় এবং সেই সকল গ্রন্থে গ্রন্থকারের মত ব্যতীত অন্য লোকের মতও স্থান পাইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। দীনেশ বাবু গোস্বামীগণের শাসনের বিরুদ্ধে ঈঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ যদি দীনেশ বাবুর মতের বিচার করেন, তবে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন যে, তিনি ইতিহাস বর্ণিত ঘটনা, প্রামাণিক গ্রন্থ, যুক্তি, তর্ক, ন্যায় সকল অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তির জোরে এমন এক আজগুবি মতের অবতারণা করিয়াছেন যে, অন্য কেহ করিলে হাস্যাস্পদ হইতেন। অলমতি বিস্তরেণ।

---

# জীবের স্বরূপতত্ত্ব ও ভজনসার গোরা।

## (২)

কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিতে হইলে কোটী কোটী জন্মের সাধন সুকৃতির দ্বারা হৃদয় প্রস্তুত করিতে হয়, এবং মহৎ কৃপায় তাহাতে ভক্তিলতা বীজ বপন করিয়া সদা সৎসঙ্গে শ্রবন-কীর্ত্তনরূপ জল সিঞ্চন করিতে হয়। বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ, ও নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে

হয়। "তৃণাদপিসুনীচ" শ্লোক পালন করিয়া সর্ব্বদা ভক্তি ধর্ম্ম যাজন করিতে হয়। নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রজবধুর আনুগত্যে মানসে সিদ্ধ দেহ ভাবনা করিয়া, পরম নাগর কৃষ্ণের প্রেমসেব লাভ করিতে হয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও প্রেম সেবাদি অতি গূঢ়তর; তাহা দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের গোচর নহে। একমাত্র সখিগণেরই এই লীলায় অধিকার এবং সখিগণ হইতেই এই লীলা প্রকাশিত হয়, সখিগণ হইতেই এই লীলা পুষ্টি হয় এবং সখিগণই এই লীলারস বিস্তার করিয়া আস্বাদন করেন। সখি অনুগতি বিনে এ লীলারস আস্বাদনে অন্যের অধিকার নাই। শুধু রাগ মার্গে সখির আশ্রয় নিয়া, তদানুগত্যে বস্ত্র, বয়স, নাম রূপাদি ভাবভূষণে ভূষিত হইয়া, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহে, স্বীয় যুথেশ্বরীর অধীনে প্রেমসেবা করিতে হয়। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
তাহাকে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

যোগমায়া আচ্ছাদিত পরকীয়া রসে নিয়ত রসের নব নব তরঙ্গ উঠিয়া থাকে; কিন্তু শুধু ব্রজ বধুগণ নব নব রসোল্লাসে, ব্রজমণ্ডলেই এ প্রেম খেলা খেলিয়া থাকেন। ব্রজের বাহিরে এবং ব্রজবধুগণ ভিন্ন এই লীলা কোথাও বিকাশ হইতে পারে না। অনধিকার চর্চ্চা করিলেই ব্যাভিচার দোষ আসিবে; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা নাহি তার অন্যত্র বিকাশ॥
ব্রজ বধুগণের এই ভাব নিরবধি।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য সেবা লাভের জন্য অজ, ভব, নারদ, শুকদেব,

লক্ষ্মীআদি সর্ব্বদা লালায়িত। বহু তপস্যাদি করিয়া মুনি ঋষিগণও দাস্য-সেবা পাইতেছেন না। অতএব মধুরাদি প্রেম সেবা আত্ম সুখকামি কলি-জীবের পক্ষে আকাশ কুসুম। কোটী জন্মের সুকৃতিতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইলেও তাহা রক্ষা করাই সুকঠিন। আর নিকুঞ্জে সেবা ত বহু দূরের কথা। অসৎ সঙ্গ, অনাচারাদি সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন পূর্ব্বক, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে দাস্যসেবাভিলাষ সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সাধু মহাজনগণ। যদি ভক্ত হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তিআদি অপশাখা জাত হয় কিম্বা বৈষ্ণব অপরাধাদি সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে ভক্তিলতা নষ্ট হইতে থাকে। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃপা প্রসাদে পান ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপন।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদিযায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপ'র গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম ফল।
ইহা মালী নিত্য সেচে শ্রবনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপারে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ।
অপরাধি হাতী যৈছে না হয় উদ্গম॥

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্যতার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটী জীব হিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

কলিহত জীবের শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রেম লাভ করা সুদুর্লভ এবং কোনভাগ্য বলে লাভ করিতে পারিলেও তাহা রক্ষা করিয়া পোষনাদি করা অতি সুকঠিন। ইহাতে দ্বাপরের নিত্য সিদ্ধা গোপীগণেরই একমাত্র ছিল অধিকার। তদ্ভিন্ন অন্যান্য গোপীকাকুলের সম্যক অধিকার ছিল না। রাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনী শুনিতে পাইয়াছিল শুধু মধুর রসাশ্রিতা গোপীবৃন্দ। সর্ব্ব বাধা বিপত্তি পায়ে ঠেলিয়া সকলেই কৃষ্ণান্তিকে ছুটিয়াছিল। কিন্তু সাধকসিদ্ধাদি ব্রজরমণীগণ স্বামী কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া ধ্যানে নিত্য রাসলীলায় কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়াছিলেন। দ্বাপরে ভু-বৃন্দাবনে প্রকট কৃষ্ণলীলার সঙ্গিনীগণও সর্ব্বস্ব দিয়া পরিপূর্ণ ভাবে তাহাকে পাইল না। তাই আসিলেন তাঁহারা নদীয়ায়। এখানে গোরা যেচে যেচে যাকে তাকে প্রেম বিলায়। না চাহিতে প্রেমধন দেয় আমার গৌর নিতাই। দ্বাপরে স্বীয় প্রেয়সীগণ কঠোর ভজনাদিদ্বারা যাহা পায় নাই, আর কলিতে মার খেয়ে হেন প্রেমধন বিলায় আমার প্রেম দাতা নিতাই চাঁদ। অবতারের চরমোৎকর্ষ হইলেন গৌরাঙ্গ। কলির জীব তাহার অতি প্রিয়, কারণ সর্ব্ব ভাবে তাহারা দুর্ব্বল ও অনুপযুক্ত। পিতা মাতার অধিক স্নেহ ও কৃপা থাকে সর্ব্বশেষের দুর্ব্বল সন্তানগণের প্রতি। পিতার লুকান ধন পায় তাহারাই। তাই শ্রীগৌরসুন্দর গোলোকে অতি গোপনে রেখেছিলেন যে নাম প্রেমধন; তাহা অকাতরে বিলাইলেন কলির

সর্ব্বজীবে। পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গাদি করিয়া। ঘোর বিষয়াসক্ত কলিজীব কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর নিত্যদাস এবং রোগ শোকাদি ত্রিতাপ জ্বালায় অশান্তি পারাবারে নিয়তমগ্ন। তাহাদের উচ্চ সাধনা করিবার অধিকারইবা কোথায়? অনির্দ্দিষ্ট অল্পায়ু ও নানা ব্যাধি সঙ্কুল দেহ নিয়া কিরূপে পাইতে পারে সে ব্রহ্মাদি দুর্লভ গোপীপ্রেম। দেহ গেহাদির চিন্তা ক্ষণকালের জন্য যাহারা বিস্মৃত হইতে পারে না কি ভাবে সিদ্ধ মঞ্জরী দেহেচিন্তা করিবে ব্রজের অপ্রাকৃত প্রেম সেবা? তাই গোলোকের প্রেমের ঠাকুর ভক্তিব্রজ নবদ্বীপে উদয় হইলেন আপন পরিকর গণ সহ। শচী গর্ভ সিন্ধুমাঝে বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে অনন্ত ভুবন প্রেম জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ ও সুশীতল হইয়া আলোকিত হইল। তিনি ব্রজগোপীর বাঞ্ছিত দুর্লভ প্রেমধন আপামর সকলকে বিলাইলেন অকাতরে ঘরে ঘরে গিয়া। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রথম লীলায় তার বিশ্বম্ভর নাম।
ভক্তি রসে ভরিল, ধরিল ভূত গ্রবন॥
প্রভুকহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্বভরি॥

কলিযুগের ধর্ম্ম এক মাত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। এবং তাহার জনক শ্রীগৌর। তিনি সর্ব্বত্র হরিনাম মহাযজ্ঞ প্রচার করিলেন এবং প্রিয় পাত্রগণ দ্বারা করাইলেন। সর্ব্ব-জীব ধন্য হইল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, গোলকের নিজ ভাণ্ডারের লুকায়িত প্রেম সম্পত্তি। ঠাকুর নরোত্তম দাসের শ্রীমুখের বাণী ঃ—

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চৌষট্টি অঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সদাচারাদি শ্রীল সনাতন

গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া শিক্ষা দিলেন প্রথম। তৎপর চৌষট্টী অঙ্গ হইতে ছাঁকিয়া নবধা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিলেন। আবার এই নবধা ভক্তিকে বিশেষভাবে ছাঁকিয়া অসাধনের ধন চিন্তামণি গৌরাঙ্গসুন্দর সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন ঃ—

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম নিলে পায় প্রেমধন॥ ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

সর্ব্বভাবে নিরপরাধী না হইলে, বহু জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও প্রেমধনে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। অনন্ত মহিমাগুণ সমন্বিত প্রেমের স্বরূপ, কৃষ্ণনাম গ্রহণে অপরাধী জীবের প্রেম হওয়া দুর্লভ। কারণ কৃষ্ণনামে অপরাধ বিচার করেন। কলির জীব অনন্ত অপরাধে নিরন্তর রত। আর অনন্ত জনমের সঞ্চিত অনন্ত অপরাধ ত আছেই। অপরাধ প্রধানতঃ পিতা, মাতা, গুরু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও ভগবানের নিকট হইয়া থাকে। অন্যান্য অবতারে অসুর সংহার ও যুগধর্ম্মাদি প্রচারের জন্য নানা ভাবে ভগবান আসিয়া থাকেন। কিন্তু এই কলিতে আসিলেন, সম্পূর্ণ অভিনব ভাবে। এই প্রেমাবতারে অস্ত্র ধারণ করিলেন না, কারে ও প্রাণে মারিলেন না। হরিনামে চিত্তশুদ্ধি হৃদয়ের আসুরিক বৃত্তি ছেদন করিয়া ছিলেন। কারণ দেহ ধ্বংশ করিলে আসুরিক ভাব নষ্ট হইবে না। পুনঃ পুনঃ যদি এই ভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে অনন্তজীবনেও উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

কলি জীবকে সর্ব্বভাবে অপরাধ মুক্ত করিয়া, অবিচারে প্রেমধন বিলাইতে, গোলোক হইতে ভূলোকে আসিলেন দীনদয়াল জীববৎসল গৌরবিশ্বম্ভর। দ্বিজ কুলচূড়ামণি গৌরহরি জগজ্জননীরূপে চন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে প্রকাশ হইয়া ভক্তগণকে স্তন পান করাইয়া, পরিপূর্ণ বাৎসল্য রসে নিমগ্ন করিলেন। গয়াধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অনন্ত ভুবন দুর্ল্ভ বৈষ্ণব

ও ভক্ত ভাবে বিভোর হইলেন। সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশে জগতপিতা, পরমেশ্বররূপে সমস্ত ভক্তকে দর্শন দিয়া মহা কৃপা করিলেন অমায়ায়। সমস্ত ভক্তই স্বীয় আরাধ্য ইষ্টদেব রূপে দর্শন ও লীলা বিলাস, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাদি উপভোগ করিয়াছিলেন। আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে জগজ্জীবকে উদ্ধার করিলেন সংসারকূপ হইতে। অর্থাৎ অনন্ত জনমে এবং ইহ জনমে জীবের যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে যাহার নিকট, তৎসমুদয়ের পরিপূর্ণ ভাব মূর্ত্তি হইয়া আসিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর। তাই তিনি জীবকে দর্শন দিয়া ও কোলে নিয়া সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং প্রেমধন দিয়া ধনী করিলেন। বহু জন্ম কৃষ্ণনাম লীলা শ্রবন কীর্ত্তন করিয়া, অপরাধী জীব সে প্রেম লাভ করিতে পারিল না ;—

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা সারগর্ভ ও রসালতা অনুভবে অনন্ত শাস্ত্রদর্শী পরম রসিক ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত আবেগ ভরে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন :—

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তার অসুরে গণন॥
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিস্তারিত ভাবে কৃষ্ণ তত্ত্ব, লীলা ও মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :—

চৈতন্য প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।

কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে। ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

কারণ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র গৌর দেহে বিরাজ করিয়া থাকেন। গৌর দেহে সর্ব্ব অবতারের স্থিতি এবং তিনিই পরতত্ত্ব। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো যঃ ইহ ভগবান স স্বয়ময়ম্

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অশেষ শাস্ত্রদর্শী, মহাভজন বিরত, পরম বৈষ্ণবচূড়ামণি মহাজন, সর্ব্বতত্ত্বাদির মীমাংসা সার সিদ্ধান্ত বাণী প্রচার করিলেন ঃ—

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।

কৃষ্ণ ব'লতে অপরাধির না হয় বিকার॥

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।

নাম লৈতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥ ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রেম গ্রহীতা আর কলিতে হইলেন গৌরাঙ্গ প্রেমদাতা। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণ গৌরদেহ বিলাসী হ'লেও উভয় লীলা মধ্যে গৌর লীলাতেই অধিক রসালম্ভে অবিচারে প্রেমদান কার্য্যাদির অধিক ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সর্ব্বজীবকে নিরপরাধী করিয়া প্রেমধন বিলান! তিনি নব-নবদ্বীপে প্রেমের হাট বসাইলেন, পাত্র মিত্রাদি নিজ অন্তরঙ্গ লইয়া। বিশ্বম্ভর নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন নদীয়া লীলায়। মহামাদক মহামৃত মধুরাতি মধুর প্রেম ফল অবিচারে স্বয়ং যথা তথা বিলাইতে লাগিলেন এবং পার্ষদগণকেও আদেশ করিলেন, যারে তারে অবিচারে বিলাইতে। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঃ—

মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি, জানে দিব মাত্র॥

* * * *

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেম ফল দেহ যারে তারে॥

* * * *

অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥

* * * *

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেম ফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল॥
মহা মাদক প্রেম ফল পেট ভরি খায়।
মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥

* * * *

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥

প্রেমেররমণী দাস নরহরি প্রেমের গাগরী কক্ষে লইয়া প্রেমের হাটে নৃত্য করিতে করিতে প্রেম রস বিলাইতে লাগিলেন সবাকারে। সমস্ত গৌর ভক্তই প্রেম ফলাস্বাদে মাতোয়াল হইয়া যথা তথা সবাকারে প্রেম ফল বিলাইতে লাগিলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধন রত্ন মণি আদি, এক প্রেম ফলের নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর ও তুচ্ছ ছার। প্রেমের মূর্ত্তি মোর সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ রায়। নিশি দিশি জ্ঞান নাই, কেঁদে কেঁদে তাঁহার চক্ষু ফুলিয়াছে। প্রেম ফল সর্ব্বজীবে পাইল কিনা এই চিন্তায়। নিতাই ভাবিলেন জনে জনে প্রেম ফল বিলাইয়া সাধ মিটিতেছে না; স্থাবর

জঙ্গম ও অন্যান্য জীব জন্তু বাদ পরিয়া যায়। তাই তিনি গৌরপ্রেম বন্যায় জগত ডুবাইয়া ফেলিলেন। যাহারা শুষ্ক তৃণ সম ভাসিতে লাগিল, উত্তাল প্রেম তরঙ্গে তাঁহাদিগকেও ডুবাইলেন। যাহারা শূণ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহাদিগকেও প্রেমের ঝড় তুফানে প্রেমসমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিলেন। নিতাইর কৃপায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী গৌর প্রেমরস পাইয়া প্রেমিক ভক্ত হইল। কোটীমুখে নিতাইচাঁদের কৃপার কথা নারদ, শুক, ব্যাস, পঞ্চাননও বলিয়া ওর পাইতেছেন না। নিতাই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্বধন। নিতাইর কৃপাধনে ধনী না হইলে, গৌর পাওয়া সুদুর্লভ। তাই ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন যে, নিতাইর সঙ্গে যাঁর সম্বন্ধ নাই সে বড় দুরাচার পশু। আর প্রাণ ভরিয়া গাইয়াছেন :—

ধনমোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র।
প্রাণ মোর যুগল কিশোর॥

নাম ও নামী অভিন্ন এবং নামী হইতেও নাম বড়। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র ও ও মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সার মত। গৌর নিতাই অদোষদরশী অবতার এবং সর্ব্ব অপরাধনাশী প্রেমদাতা। সুতরাং তাঁহাদের নাম আরও অধিক গুণ ও মহিমাব্যঞ্জক এবং অধিকভাবে প্রেম ফলদাতা। সে জন্যই প্রেমদাতা, পরম দয়াল নিতাইচাঁদ "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম" এই মহামন্ত্র সার বাণী, একমাত্র অবলম্বন করিয়া, ত্রিজগত ভরিয়া প্রেম দিলেন। প্রেমের রমণী ঠাকুর নরহরি আপনি আস্বাদন করিয়া জগতে প্রচার করিলেন :—

'গৌর নাম, অমিয়া ধাম, পিরিতি মূরতি দাতা।"

ক্রমশঃ

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"


২৮শ বর্ষ ভক্তি আষাঢ়
১১শ সংখ্যা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ১৩৩৭


# মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ভজন

——)*(——

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহিয়ে
জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়ে,
মন অভিমান ন আনে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে,
নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে রাখে,
ধন ধন জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টিনে তৃষ্ণাত্যাগী
পর স্ত্রী জানে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে,
পর ধন নব ঝালে হাত রে॥

মোহ-মায়া ব্যাপে নহি জেনে,
দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মন মাঁরে।
রাম নাম শুঁতাকী লাগী,
সকল তীরথ তেনা তন মাঁরে॥
ধন লোভী নে কপট রহিত ছে,
কাম ক্রোধ নিবার্য্যা রে।
ভণে নরসৈয়োঁ তেন্থু দরশন,
করতাঁ কুল একোতের তার্য্যারে॥
("আশ্রম-ভজনাবলী" হইতে উদ্ধৃত।)

মহাত্মা গান্ধী শৈশবকাল হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী। তাঁহার পিতা মাতা বৈষ্ণব এবং তিনিও আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি রামনাম জপ করেন এবং তাঁহার আশ্রমে প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার সময়ে নিম্নলিখিত পদটি কীর্ত্তন করা হয়ঃ—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত পাবন সীতা রাম॥

উপরে যে গুজরাতী ভজনটি লিখিত হইল, উহাতে কবি, "প্রকৃত বৈষ্ণব কে?" তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উহার প্রতি ছত্রে ছত্রে মহাত্মাজীর অলৌকিক চরিত্র ও জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত দেখিতে পাই। বস্তুতঃ, এই ভজনটি মহাত্মাজীর অতি প্রিয়। তিনি যখনই কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখনই এই গানটি তিনি নিজে আবৃত্তি করেন অথবা অপরকে গাহিতে বলেন। ইহাতে অনেক সময়েই তিনি নূতন শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। ১৯২২ সালের মার্চ্চ মাসে যখন মহাত্মাজী বন্দীভাবে আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার অনুরোধে এই গানটী তাঁহাকে গাহিয়া শোনান হয়। এই ভজন

গাহিয়াই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত "লবণ অভিযান" আরম্ভ করেন। পরে, বিগত ৫ই মে রাত্রি ১টার সময় যখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখনও পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তিনি পণ্ডিত খারে মহোদয়কে এই গানটি গাহিতে অনুরোধ করেন আর নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অবনত মস্তকে, নীরবে, শ্রদ্ধাসহকারে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করেন। মহাত্মাজীর প্রিয় ভজন বলিয়া এই গানটির বিশেষ মূল্য আছে; তজ্জন্য নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। আশা করি, "ভক্তির" পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ এই ভজনটিকে বাঙ্গালা গানে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিবেন।

## অনুবাদ

প্রকৃত বৈষ্ণব তাহাকেই বলি, যিনি পরের বেদনা বুঝিতে পারেন এবং পরের দুঃখে উপকার করিয়া মনোমধ্যে অভিমান পোষণ করেন না। যিনি সকলকে মর্য্যাদা দান করেন, কাহারও নিন্দা করেন না এবং বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার জননীই ধন্য ধন্য। যিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও তৃষ্ণাত্যাগী, পরস্ত্রী যাঁহার নিকট মাতৃতুল্য, কিছুমাত্র অসত্য বলিতেও যাঁহার রসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং পরধনে যাঁহার স্পৃহা নাই, যিনি মায়া মোহ বিবর্জ্জিত ও দৃঢ় বৈরাগ্যবান্ এবং যিনি সর্ব্বদা রামনাম জপে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার শরীরে সর্ব্বতীর্থ বিরাজমান। যিনি লোভ কপটতা, কাম ও ক্রোধ জয় করিয়াছেন, নরসৈয়া বলে সেইব্যক্তির দর্শনে লোকের একাত্তর পুরুষ অবধি উদ্ধার হইয়া যায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়।

# রূপানুরাগ

[ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত ]

( নীলাচলে ব্রজমাধুরী হইতে )

নীলাচলে রথ যাত্রা। চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়াছেন, বঙ্গদেশের ভক্তগণ রথযাত্রার বহুপূর্ব্বেই শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত। রথযাত্রা দর্শন তাঁহাদের উপলক্ষ মাত্র, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্দর্শনের জন্যই সারা বৎসর তাঁহাদের প্রাণে উৎকণ্ঠা, ইহাঁরা কেবলই বৎসর ভরিয়া দিনগণনা করেন, কবে রথযাত্রা হইবে; আর সেই সময়ে সকলে মিলিয়া নীলাচলে যাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ—আত্মায় আত্মা শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া প্রাণ জুড়াইবে। তাই তাঁহারা অন্যান্য দেশীয় যাত্রীদের অনেক পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া দিন রজনী তাঁহাদের হৃদয়ের ধন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে দর্শন করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছেন।

কিন্তু তাঁহাদের দুঃখ এই যে, পূর্ব্বে যেমন প্রভু তাঁহাদের সঙ্গে মনের উৎসাহে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন—সর্ব্বদাই মহাসঙ্কীর্ত্তন করিতেন—সর্ব্বদা হাসিমুখে কথা বলিতেন—এখন আর সে ভাবটী নাই। শ্রীমুখে যেন কেমন এক গভীর বিরহ-ব্যাকুলতা—সর্ব্বদা সজল নয়ন, মুখখানি পাণ্ডুর। তিনি লোকজন সঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন স্থান প্রিয়। বহিরঙ্গ লোকের সহিত যখন নেহাৎ কথা না বলিলে নয় তখনই দুই একটি কথা বলেন—পরক্ষণেই মস্তক অবনত করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করেন।

এই অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণে একটুকুও সুখ নাই। গম্ভীরা মঠের সুবৃহৎ প্রাঙ্গনে ভক্তগণের যথেষ্ট সমাবেশ। নামকীর্ত্তনের তরঙ্গও

যথেষ্ট, প্রভু কিছুক্ষণ সে কীর্ত্তনে যোগদিয়াই রোদন করিতে করিতে গম্ভীরা মন্দিরে চলিয়া যান। প্রভু জানেন যে, ইহাতে ভক্তগণের ক্লেশ হয়, তাঁহাদের উৎসাহ দমিয়া যায় কিন্তু উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মোহন রূপের ভাবছবি তাঁহার হৃদয়ে উঠে, তাঁহার প্রাণ সেই রূপদর্শনে ব্যাকুল হয়, এই ভাবে তিনি বিবশ হইয়া পড়েন। প্রিয় ভক্তগণের প্রতি সকল সময়ে সমান দৃষ্টি রাখার সামর্থ আর থাকে না।

ভাবাবেশের পরে যখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়েন, তখনই অতি কাতর কণ্ঠে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন—"তোমরা সকলে কত ক্লেশ সহিয়া এখানে আসিয়াছ, আর আমিও সারাবৎসর রথযাত্রার আশায় আশায় থাকি। তোমরা আসিবে তোমাদিগকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিব—নামকীর্ত্তন করিব—তোমাদের সঙ্গ করিব। সেই তোমরা আসিয়াছ, কিন্তু এই দেখ আমার কি হইয়াছে—আমার প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল—আমার মন আর আমাতে নাই—ভাল করিয়া দুইটি কথা বলিতে পারিলাম না। অতি প্রিয়জনের সঙ্গও ভাল লাগে না, সকল ছাড়িয়া বিরলে বসিয়া কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা হয়—চেষ্টা করিয়াও নয়নজল সংবরণ করিতে পারিনা। মনে করি মনের ভাব চাপাদিয়া তোমাদের সহিত হাসিমুখে দুইটি কথা কই, কহিয়া তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করি, কিন্তু কি করিব—হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলি।

কি নব এক অপরূপ রূপ ঝলক আমার নয়ন সমক্ষে ক্ষণে আসিতেছে, আবার তখনই চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি। একথা বলিবার নয়—লুকাইবারও নয়; এই রূপটী আমার চিত্ত টানিয়া লইতেছে। উহা কি মধুর—কি সুন্দর—উহার কি আশ্চর্য্য শক্তি! ভক্তগণের সঙ্গে অনন্ত মনে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিব—এই আশায় সংসার ছাড়িয়া আসিলাম—তোমরা আমার প্রাণের প্রিয় কৃষ্ণভক্ত—তোমাদের

সঙ্গে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে আমার কতসুখ, আর সেই তোমরা আসিয়াছ—আর আমার অবস্থা দেখ, কৃষ্ণনাম করিব কি—ও নাম শুনিলেই আমি অধীর হইয়া পড়ি—মনে হয় বিরলে বসিয়া কেবল উহার সেই ভুবন ভোলানো বঙ্কিম নয়নের কি জানি কেমন এক ইঙ্গিতের মত সেই কটাক্ষের ধ্যান করি। আসল কথা বলিতেকি—ঠিক যেন সেই নয়নের কটাক্ষে আমায় ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়—আর আমি তাঁহার জন্ম পাগল হইয়া রোদন করি। সে এমন করে কেন? ঐ দেখ—ঐ সে—"

বলিতে বলিতে প্রভু উত্তান নয়নে আকাশেরদিকে চাহিয়া বাহ্যজ্ঞান হারা হইলেন—বজ্রাহতের ন্যায় শ্রীঅঙ্গ নিস্পন্দ ও নিশ্চল হইল।

বসু রামানন্দ, শিবানন্দ ও মুকুন্দ তাড়াতাড়ি প্রভুকে ধরিয়া বক্ষে লইলেন, তাঁহার মস্তক মুকুন্দের স্কন্ধে ঢুলিয়া পড়িল, নয়ন যুগল সেই উত্তান ভাবেই রহিয়াছে—বাম নয়ন ঈষৎ বক্র, নয়নের তারা স্থির অথচ কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত—মুখমণ্ডল ভীষণ পাণ্ডুর—শ্বাস-রুদ্ধ।

অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কাশীশ্বর ভক্তগণকে অনুনয় করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন—আপনারা এরূপ দেখিয়া সহিতে পারিবেন না—অল্পক্ষণের জন্য বহিরাঙ্গিনায় যাইয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করুন।" কাশীশ্বরের কথায় ভক্তগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বাহিরে আঙ্গিনায় যাইয়া ব্যাকুল ভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—একরূপ বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

শিবানন্দ সেন প্রভুর মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। মুখ ঢাকাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথায় বাতাস দিতে লাগিলেন। স্বরূপ বলিলেন, "কাশীশ্বর তুমি ভাল করিয়া প্রভুকে ধরিয়া বসো, মুকুন্দকে অবকাশ দাও মুকুন্দের প্রয়োজন আছে।"

কাশীশ্বর অতি যত্নে প্রভুকে নিজের বুকে ধরিয়া লইলেন। স্বরূপ ও মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের নাসিকার অগ্রে তুলা ধরিয়া দেখিলেন, নাসিকায় মৃদু ভাবে শ্বাস বহিতেছে, নয়নের তারা নামিয়াছে—উত্তান ভাবও অনেকটা কম হইয়াছে। আবার উভয়ে সমস্বরে চেতনারজন্য কৃষ্ণনাম জপ করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নে জলবিন্দু ও ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দু দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু নয়ন যুগল হইতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মুকুন্দদত্ত স্বরূপকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইলেন—প্রভুর ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

একজন ভক্ত তাড়াতাড়ি বাহির অঙ্গনে গিয়া ভক্তগণকে সংবাদ দিলেন "আর চিন্তা নাই, প্রভুর চেতনা লক্ষণ দেখা যাইতেছে, আপনারা খুব কীর্ত্তন করুন।" ভক্তগণ নামকীর্ত্তন ছাড়িয়া এক নূতন পদ গাহিতে লাগিলেন—

যো মুখ জিতল কমল অতি নিরমল
সো অব হেরি সে মৈলান
যো বর অধর বিম্বতল নিন্দল
তছু রাগ হেরি আন ভান॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী
নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান॥

কাঞ্চন বরণ মলিন হেন হেরইতে

মঝুহিয়া বিদরিয়া যায়।

কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরকো

বিরহকো তাপ পলায়॥

ভক্তগণ নয়নজলে বুক ভাসাইয়া এই গান গাহিতে লাগিলেন। গানটী শেষ হইতে না হইতেই বসু রামানন্দ ভাবে বিভোর হইয়া কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া গান ধরিলেনঃ—

আরে মোর গৌর কিশোর।

সহচর কন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া

নবমী দশায় ভেল ভোর॥

পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে

সাহসে পরশে নাহি কেহ।

সোনার গৌরহরি কাহে হায় মরি মরি

তন্তুক দোসর ভেল দেহ॥

থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি

রোঅয়ে হা নাথ বলিয়া।

বসুরামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে

না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥

শত শত শ্রোতা কীর্ত্তন শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। পুলক, কম্প, স্তম্ভ, অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক বিকারে গায়ক ও দর্শকবৃন্দ সকলেই ব্যাকুল। শ্রীমন্দিরে স্বয়ং ভাবময় বিগ্রহ যে ভাবে বিভাবিত—বাহির অঙ্গনে তাঁহারই প্রিয় ভক্তগণের সেই ভাবময় কীর্ত্তনে ভাবরস একবারে মুর্ত্তিমান হইয়া উঠিল।

ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর চেতনা সঞ্চার হইল। তিনি মৃদুস্বরে স্বরূপের

কণ্ঠ ধরিয়া বলিলেন, "স্বরূপ! কি দেখিলাম, আ—মরি মরি—কি মধুর! কি মধুর!

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

স্বরূপ!—কৃষ্ণের মাধুর্য্য হয় অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য পুর মধুর হইতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর।
তার-যেই স্মিত জ্যোৎস্না ভর॥

কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি মন মাতানো মধুর রূপ!

মারঃ স্বয়ং নু মধুর-দ্যুতি মণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেবনু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিত বল্লভোনু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥

স্বরূপ!—শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গল ঠিক ব'লয়াছেন, "এরূপ দেখিয়া প্রথম ভাবিলাম এই বুঝি স্বয়ং কন্দর্প। যিনি রূপের ছটায় ত্রিভুবন শাসন করেন ইনি বুঝি সেই মহামারক কামদেব। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, ইনি মারক কন্দর্প নহেন, ইহাতে পূর্ণমাধুর্য্য বিরাজমান—যেন এক মধুরদ্যুতি-মণ্ডল। মারক মদনে এ মাধুর্য্য কোথায়? তার পরে মনে হইল ইহাকে মাধুর্য্যদ্যুতি বলিয়াই বা বলি কেন—ইনি স্বয়ংই মাধুর্য্য। তাই বা বলি

কেন—ইনি মন ও নয়নের অমৃত। পরে বুঝিলাম—ইনি শ্রীরাধার সেই মনচোরা বেণীমোচক জীবিত বল্লভ নবকিশোর মোহনমুরলিধর ব্রজজন নয়ন রঞ্জন মদন মোহন শ্রীকৃষ্ণ।

স্বরূপ, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের এমন বিজুরি চমকে আমি যে কোন্ অমৃত সাগরে ভাসিয়া গিয়াছিলাম তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না।

প্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অতীব আগ্রহ সহকারে স্বরূপ গান ধরিলেন :—

বিকচ সরোজ- ভঙ্গি মুখ-মণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম-নট-খঞ্জন ঘোর।
কিয়ে মৃদু মাধুরী হাস উগারই
পিই-পিই আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥

মহাপ্রভু স্বরূপের মুখে হাত দিয়া গানে বাধা দিয়া বলিলেন – স্বরূপ, একটু থাম, আমি দেখিয়া লই,—

"বিকচ সরোজ ভঙ্গি মুখ-মণ্ডল"

আর তাহার উপরে—

"দিঠি-ভঙ্গিম-নট-খঞ্জন ঘোর"

নয়ন যুগল খঞ্জনের ন্যায় নৃত্যশীল। এই বঙ্কিম নয়নের কটাক্ষ-নৃত্যেই তো আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি, যদি আমি তাহার নয়ন সঙ্কেত না বুঝিতাম, যদি এমন ভাবে তিনি আমার পানে না চাহিতেন, তবে মনে হয় আমার এমন দশা হইত না।

আর সেই মুখ খানির মৃদু মধুর হাসি সেত অমৃতের খনি।—

"পিই পিই আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর"

* * *

হাঁ-হয়েছে স্বরূপ,—ঠিক—অতি ঠিক কথা। আমি ভাবিয়াছিলাম

তোমায় বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তা—তুমি বুঝেছ—ঠিক বুঝেছ। তবে গাও – আবার গাও—তার পর ?

স্বরূপ।—বুঝিনাই—কিছু বুঝিনাই, তবে গান গাইতে পারি—সেও তোমারি কৃপা।　　ক্রমশঃ

---

# মথুরাপুরি গেছেন শ্যাম।

আজি আমার হৃদয় কুঞ্জে
　　পশে না আসি বাঁশির তান।
কুঞ্জ-গুল্ম উচ্ছ্বাসী পাখি
　　গাহে না আজি মিলন গান॥
কুঞ্জে ফোটে না নূতন ফুল
　　তরু লতা আজ নিরস সব।
ধেনু কুল আজ না যায় চরিতে
　　ভূলে গেছে তারা হাম্বা রব॥
নিত্য নবীন নিত্য নূতন
　　খেলে না লহরী ভাবের মালা।
মান অভিমান ফুরাইয়া গেছে
　　প্রাণময় শুধু রয়েছে জ্বালা॥
বিরহ জ্বালা বিরহ জ্বালা
　　জীবনে আর কোন্ কাম্।
হৃদয় গোকুল আঁধার করিয়া
　　মথুরাপুরি গেছেন শ্যাম॥

দীনহীন—শ্রী

# চা পান না বিষ পান ?

## ( শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখিত )

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে)

৩৩কোটী ভারতবাসীর মধ্যে যদি ১৬৷৷৹ কোটী ভারতবাসী অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক প্রত্যহ ১ পয়সার চা পান করে বলিয়া ধরা যায় তবে প্রতি-দিন ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বৎসরে ৯০ কোটী টাকা আমরা চা পানে নষ্ট করি। এদিকে ভারতবাসীর গড়ে দৈনিক আয় ৬ পয়সা মাত্র। চা বিষ, প্রাতঃকালে খালিপেটে সেবন করিয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগি। চা পানের ফলে ভাত প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য বেশী খাওয়া যায় না। ১ পয়সা চায়ের লোভে আয়ু হ্রাসের ব্যবস্থা করি। (সঞ্জীবনী ২৬শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬।) আমাদের বেশ মনে পড়ে, দেশে অন্ততঃ এই কলিকাতায় চা কি প্রকারে ছুঁচের আকারে ঢুকিয়া এখন ফালের আকারে বাহির হইতেছে। এক সময়ে দেখা গেল চায়ের কাটতি বড়ই কমিয়া গিয়াছে, ইংরাজী বণিক মহলে এবং সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন পড়িল, কিসে চায়ের কাট্‌তি বাড়ানো যায়। সেই সময় Tea-cess আরম্ভ হইল কি না মনে পড়ে না, অন্ততঃ Tea-cess হইতে কাট্‌তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করাই স্থির হইল। তখন এক মস্ত বিলাতী কোম্পানী এই আন্দোলনের নেতৃ স্বরূপ ভার লইলেন। প্রথম প্রথম এক মহা রব উঠিল যে, যে কেহ চায়ের দোকান খুলিবে সাহেবেরা সেই দোকানের ভাড়া দিবে এবং সমস্ত সরঞ্জাম যোগাইয়া দিবে। এত প্রলোভন এই দুর্ভাগ্য দরিদ্র দেশের কয়জন অতিক্রম করিতে পারে ? সহরের চারিদিকে হু হু করিয়া চায়ের দোকান খুলিল যখন এই সমস্ত দোকানের পসার বেশ জমিয়া

গেল তখন শুনি ১ পয়সায় দুই প্যাকেট চা বিক্রয় হইতেছে। এই Pice Packet চায়ের কি কাট্‌তি ! যে চায়ের জন্য ধনীরা লালায়িত, সেই চা যখন সকলেই এত সস্তায় পাইতে লাগিল, তখন কি আর রক্ষা আছে ?

চায়ের দোকানে চা তো দিন রাত চড়ানোই থাকে, মধ্যবিত্ত লোকেরা দোকানে বসিলেন, পাঁচ জনের সঙ্গে খোস গল্প অশ্লীল তামাসা জুড়িয়া দিলেন, ইতিমধ্যে দোকানদার সেই সিদ্ধ চায়ের জল ঢালিয়া তাহাতে টিনের অসার দুধ ও চিনি মিশাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া হাজির করিল। চা-পায়ী ভাবিয়া দেখিলেন না যে, তিনি চা খাইতেছেন, না তীব্র বিষ গলাধঃকরণ করিতেছেন। ইহার উপর আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেক চা-বিক্রেতা একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ সেই চা কুণ্ডে ফেলিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ইহার ফলে চা সেবী ত্রিবিধ স্বর্গ সুখ লাভ করেন।

(১) ঘরের কড়ি স্বেচ্ছায় উড়াইয়া দেওয়া। (২) বিষপান করা এবং (৩) মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া।

চা পানের একটু মজা আছে। চা পানের ফলে অজীর্ণ রোগ চোরের মত দেহে প্রবেশ করে এবং দুর্ব্বলতা আনয়ন করে; দুর্ব্বলতা আসিলেই চায়ের ন্যায় Mild Stimulant বা নরম উত্তেজক কিছু দরকার হয়, এই রূপে রোগেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

চা পান না ছাড়িলে দাঁড়াইবে এই যে, যে দিক দিয়া হউক চায়ের দাম হিসাবে অথবা রোগের ঔষধ হিসাবে বিলাতকে পয়সা দেওয়া দেশে দারিদ্র্য আনা এবং জীবন্মৃত হইয়া দিন যাপন করা।

আজকাল কারকয়জন জানেন, বোধ হয় কেহই জানেন না যে, চা বাগানের কুলিদের প্রতি চা-কর ইংরাজগণ কি ভীষণ অত্যাচার করিত। আজ কাল যেমন নারী ধর্ষণের ব্যাপার সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যায়,

সেকালেও চা-কর ইংরাজদের সবুট পদাঘাতে কুলিদিগের প্লীহাফাটা, কথায় কথায় বিচারে বেকসুর খালাস পাওয়া এবং কুলি রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার কাহিনী সংবাদপত্র খুলিলেই দেখা যাইত। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, ব্রাহ্ম সমাজের স্বাধীনতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত নির্ভীকহৃদয় ও শক্তিমান দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি স্বয়ং কুলি হইয়া চা বাগানে কাজ করিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সঞ্জীবনী আজ নারী-নিগ্রহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, গাঙ্গুলি মহাশয়ের ঐ সকল "কুলি-কাহিনী" সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ সঞ্জীবনীর অঙ্গ ভূষিত করিতে লাগিল। সঞ্জীবনীর আন্দোলনের ফলে চা খাওয়া খুব কমিয়া গিয়াছিল। তখন সে দিকে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়িল। তখন আড়কাঠির বে-আইনী কুলী চালানের বিরুদ্ধে আইন হইল; পূর্ব্বের অপেক্ষা বিচার বিভ্রাট অনেক কমিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলি ও কুলি রমণীদের প্রতি অত্যাচারও অনেক কমিয়া গেল। অনেক পুষ্প সুগন্ধ বিস্তারে সুখদান করিয়া লোকদৃষ্টির অন্তরালে ঝরিয়া যায়। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণ্যে দ্বারিক গাঙ্গুলি নামে সুপরিচিত। ইঁহার আগ্রহে ও চেষ্টায় কুলিদের প্রতি অত্যাচার প্রশমিত হইল, কিন্তু কয়জন লোক তাহা অবগত আছে? আমার মনে হয় তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা উচিত। প্রত্যেক কুলির নিকট ১ পয়সা করিয়া লইলে সহজেই এই স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করা যাইতে পারে।

চা-পানের কুফল ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস গত অগ্রহায়ণের "বঙ্গলক্ষ্মীতে" সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন। আমরা তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম যাহা আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

"চা-পানের সর্ব্বনেশে অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, দশ বারোবার চা না হইলে চলে না। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা ভয়ানক অনিষ্টকর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দেখ্‌লেন বিলাতে চায়ের

জন্য স্বাধীন চীনের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাঁরা অধীন ভারতে চা উৎপন্ন করবার মতলব আটলেন। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারতে চায়ের চাষ করবার জন্য চীন থেকে চা এবং চীনাশ্রমজীবি আনালেন। তিনি সতীদাহ নিবারণ করেছিলেন বটে, কিন্তু চায়ের অপব্যবহারের দরুণ কত পরিবারের যে কত মর্ম্মদাহ ভবিষ্যতে হ'তে পারে তা তিনি অনুভব করেন নাই।

১৮৫২ সালে আসামোৎপন্ন চা চীনের চায়ের সমকক্ষ হ'য়েছিল। প্রথমে দেশীয় লোকেরা চা খেতেন না, এখন চা একটা নেশায় পরিণত হ'য়েছে। ১৮৬৪ সালে এদেশ থেকে ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। এখন প্রতি বৎসর ৩৫ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। দেশে চা ধরাবার জন্য এণ্ডু য়ুল কোম্পানী কেরাণীদের টিফিনের ছুটির সময় পাঁচ সিকে খরচ ক'রে চা খাওয়াত; তারপর খরচ করত দশ আনা, তারপর চার আনা। তারপর যখন দেখলে নেশা ধরেছে, আর তখন কিছুই খরচ করতে হল না। এখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে সকলে চা খায়, মুটে মজুর সকলেরই এখন চা না খেলে চলে না।"

আপাতত: বোধ হয় এত বড় ব্যবসায়ে ভারত লাভবান হয়; কিন্তু লাভ কত এদেশে থাকে, আর বিদেশে কত যায়, তার খতিয়ান দেখিলে দেখা যায় যে, যদি বা ভারতের কিছু লাভ থাকে সেলাভ অ'ত সামান্য। "সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়। ভারতবর্ষে চায়ের ব্যবসায়ে ৪৮ কোটী টাকা মূলধন খাটছে। এর মধ্যে ৩৭কোটি টাকা বিলাতী, অবশিষ্ট মূলধনের মালিক অধিকাংশ বিলাতের লোক, এদেশের মালিক অতি অল্প। লাভ প্রায় শত করা একশত কি দুই শত। আমাকে একজন চা বাগানের মালিক ব'লেছিলেন—এবৎসর দুর্ব্বৎসর, লাভ শত করা পঞ্চাশ মাত্র। যদি শত করা পঁচিশও ধরা যায়, ৩৭ কোটী বিলাতী মূলধনের দরুণ প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে ৯। কোটী টাকা যায়।

তা'ছাড়া বিলাতী ম্যানেজারদিগকে প্রায় ৫ কোটী টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ এই ব্যবসায়ের দরুণ ভারতবর্ষ বিলাতী বণিকদিগকে প্রতিবৎসর ১৪।০ কোটী টাকা দিয়া থাকে। সরকারী বিবরণী বলে, ৩৪০ টাকা বাগানে ৩১৫জন বিদেশী ম্যানেজার।

"প্রায় ১৮ লক্ষ শ্রমজীবি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদেশী বণিকদের অর্থকোষ পূর্ণ করেছে। তার প্রতিদানে পায় মাথা পিছু ৭॥০ টাকা দৈনিক চারি আনাতে কি একটা মানুষের জীবন ধারণ চলে? অত্যাচার অনাচারের কথা ছেড়ে দাও, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্থানে স্থানে সরকারী বেসরকারী রেলওয়ে ষ্টেশনে 'টী-সেস্ এসোসিএসনের অনুরোধ পত্র ঝুলছে। এক পেয়ালা চা খাও. কোন কষ্ট থাকবে না। মাতাল হবে না অথচ মত্তানন্দ পাবে, শরীর সুস্থ, সবল ও কার্য্যক্ষম হবে, ইত্যাদি, সহসা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদেশী বণিকদের এত উদ্বেগ কেন? সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

চায়ের দরুণ বছরে ১৪।০ কোটীতো তাঁদের উদরে যায় তাছাড়া এই ভারতেই ৪ কোটী টাকার চা বিক্রয় হয়। তাছাড়া এই চায়ের মোহিনী শক্তি বৃদ্ধি করতে হ'লে বিদেশী দেশী জীবন-নাশী দুটী পদার্থ আবশ্যক। বিলাতী টিনবদ্ধ দুগ্ধ এবং যাভার চিনি। যার যত নেশা তার তত বেশী কড়া চা এবং দুগ্ধ ও চিনি চাই।

টিনভরা দুধের দরুণ ১৯২২-২৩ সালে ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে ৪০লক্ষ টাকা গিয়েছিল; ১৯২৬-২৭ সালে সেই অঙ্ক উঠেছিল ৭৫ লক্ষের কোটায়। এক পাউণ্ড চা প্রস্তুত করতে হ'লে ৩॥০ কি ৪ সের চিনি চাই। বিদেশী চিনি নইলে অনেকের মুখে চায়ে তার লাগে না। ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বিদেশী চিনির দরুণ বিদেশে প্রতি বৎসর এদেশের ৪ কোটী টাকা বেরিয়ে যায়। দেশী চিনি ময়লা বলিয়া আমরা ঘৃণা করি। তাছাড়া

এই দেশী চিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীতেও প্রস্তুত হয় না। জাহাজে বিদেশী চিনির যেসব বস্তা বিক্রী হয়, সেই বস্তায় চিনির যে সব ময়লা লেগে থাকে তাহাই জাল দিয়ে চিনি বের ক'রে যে অপরূপ পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহারই নাম দেশী চিনি। এই ত গেল দুধ চিনির কথা। চায়ের জন্য বিলাতী পাত্র চাই। প্রতি বৎসর ভারতে ১ কোটী টাকার বিলাতী পেয়ালা আসে। এর একতৃতীয় কি এক চতুর্থ অংশও যদি চায়ের জন্য ব্যবহার হয় তা হ'লেও অন্ততঃ ২৫।৩০ লক্ষ টাকা এই বাবদে বিলাতে যায়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বশুদ্ধ চায়ের দরুণ দেশ থেকে ১৯ কোটী ৩০লক্ষ টাকা লুণ্ঠিত হ'চ্চে।

"চা-স্বাস্থেরও কিরূপ হানিকর তাহাও বলি। চা চল্‌তি হবার পূর্ব্বে ইংরাজ জাতি বেশী সবল ও সুস্থ ছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময় দশলক্ষ ইংরাজ সৈন্যহবার অযোগ্য বিবেচিত হ'য়েছিল। অবশ্য তার কারণ শুধু চা নয়। চা খেতে খেতে যখন নেশা জমে তখন খুব কড়া চা নইলে চলে না। এই প্রকার কড়া চায়ে যে বিষ থাকে তা থেকে জন্মায় পাকাশয়ের প্রদাহ, অম্বল অজীর্ণতা, অক্ষুধা ১৪।১৫ পেয়ালা চা খেয়ে সমস্ত দিন কাটিয়ে দেয়। কেহ কেহ এত গরম চা খায় যে, জিভ পুড়ে যায়, এই অত্যুষ্ণ চায়ের দরুণ পেটের ভিতর ঘা হয়। আজকাল অনেকের মধ্যে এই রোগটা প্রবল হ'য়েছে। তার দরুণ পেট কেটে চিকিৎসা করতে হয়।

"আর এক বিপদ সংক্রামক রোগ। পাত্রগুলি তো আর গরম জলে সিদ্ধ করে বিষ মুক্ত করবার অবকাশ বা অভিপ্রায় থাকে না। গরমি বা যক্ষ্মারোগী চুমুক দিয়ে চা খেয়ে যাচ্ছে, তার পরই আর একজন এসে সেই পাত্রে চা পান ক'রে রোগটা সঞ্চয় করল।"

এই সে দিন সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে, কোন সুপ্রসিদ্ধ বিলাতী কে-

স্পানীর কম বেশ। প্রায় ৫০টী সিন্ধুক চ নষ্ট করা হইল ইহার কারণ কি? কারণ—ঐ সিন্ধুক গুলিরচায়ে আ-র্সে-নি-ক বিষ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা কি প্রকার ভয়াবহ কথা, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমাদের প্রশ্ন এই যে, খুব অল্প পরিমাণে ঐ বিষ চায়ের সঙ্গে মিশাইলে কি উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল হয়, অথবা চায়ে সংশ্লে পোকা ধরে না, অথবা নেশা ভাল জমে? এতগুলি সন্ধুকে আর্সেনিক পাওয়া আমাদের সন্দেহ হয় যে, ইহা দৈবাতের কথা নয় কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশ্রিত। তবে হইতে পারে যে, এই কটা সিন্ধুকে উহা কিছু বেশী পরিমাণে মিশানো হইয়াছিল এই বেশীটুকু হয় তো দৈবাতের কাজ হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, কর্পোরেশন এই আর্সেনিক মিশ্রিত হইবারমূল তত্ত্বানুসন্ধান করুন, করিলে জানা যাইবে ও চায়ের কারখানার অনেক রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, আর একটী মস্ত বড় কোম্পানী তাঁহাদের চায়ে আফিমের জল ছিটাইয়া দিতেন তাহা হইলে একবার যাঁহারা তাঁহাদের চা খাইবেন তাঁহারা সহজে আর তাহা-দের চা ছাড়িয়া অন্য চা ধরিতে চাহিবেন না আমার এক বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন পাঠ্যবস্থায় এক হোষ্টেলে থাকিতেন তখন একজন সেই হোষ্টেলের সম্মুখে এক চায়ের দোকান খুলিল। দোকানে লোকে লোকারণ্য—এমন চা নাকি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তখন বন্ধু ইনি চা খাইতেন না—কৌতূহল বশতঃ সন্ধান লইতে উদ্যত হইলেন—এত প্রশংসার কারণ কি? শেষে কোন প্রকারে চা যেখানে প্রস্তুত হয় সেই কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, চায়ের জল ফোটাইবার সময়ে উহাতে "পোস্তর ঢেঁড়ি" (আফিমের ফলের বিচি) ফেলিয়া দেওয়ার কারণেই ঐ চায়ের প্রতি ছেলেদের এত ঝুঁকিবার কারণ; উহা জানিয়া ছেলেরা ঐ চায়ের দোকান পরিত্যাগ করিল।

আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, রেলওয়ে ষ্টেশনে একজনের খাওয়া চায়ের অবশিষ্ট অংশ মূল চা কুণ্ডে ঢালিয়া "হিন্দু" চা প্রস্তুত হইল। এবং তাহাই চা পানীয়দের পয়সার বিনিময়ে উপাদেয় রূপে বিতরিত হইতে লাগিল। শুধু চা কেন? আমি এক চায়ের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম—সেখানে লেখা আছে—চা, ঘোলের সরবত প্রভৃতি সবই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকাল, একজন এসে ঘোলের সরবত চাহিল দোকানদার ঘোলের নামধারী সাদাবিষ ঢালাঢালি করিয়া তাহাকে খাইতে দিল। লোকটীকে দেখিয়া বোধ হইল মেথর শ্রেণীর, তাহা না হইলেও ঐ প্রকার কোনও নিতান্ত নীচশ্রেণীর নিঃসন্দেহ। সে খানিকটা খাইয়া অল্পকিছু অংশ গেলাসে রাখিয়া চলিয়া গেল। দোকানদার সেই পরিত্যক্ত অংশটুকু নিঃসঙ্কোচে ঘোলের কুণ্ডের মধ্যে ঢালিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে কেরাণী শ্রেণীর এক দুর্ভাগ্য জীব আসিয়া যেই ঘোলের সরবৎ চাহিল দোকানদার অমনি তাহার সেই অমৃত ভাণ্ড বা ঘোলকুণ্ড হইতে অমৃত ঢালিয়া তাহাতে পচা গোলাপী আতর ও একটু গোলাপী রংয়ের বিষ ঢালিয়া এক গেলাস বিষ প্রস্তুত করিয়া দিল। কেরাণী বাবুটীও উহা পান করিয়া স্বর্গের সুখ অনুভব করিয়া চলিয়া গেলেন। এইভাবে সংক্রামক রোগের বীজ যে কিপ্রকারে দ্রুতবেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা কয়জন অভিভাবক লক্ষ্য করিয়া রাখিতেছেন?

প্রবীন ডাক্তার সুন্দরী মোহন বাবু বলেন যে, চায়ের বদলে গম কড়া করিয়া ভাজিয়া গুড়ি করিয়া রাখিয়া দাও তাহাই ফুটন্ত জলে দিয়া দুধ ও গুড়ের সঙ্গে খাও। চিনির ভিতর সার কিছুই নাই। তদপেক্ষা গুড় শতগুণে পুষ্টিকর। আমরাও শুনি যে, আজকাল অল্প খরচে চিনির মিষ্টতা বাড়াইবার জন্য স্যাকারীণ (Saccharine) ব্যবহার হয়। পড়িয়াছিলাম যে, এই পদার্থ বেশী ব্যবহার করিলে কর্কট (Cancer) রোগ হয়।

গমগুড়ার ব্যবস্থা করিলে চর্ব্বি মিশানো বিস্কুট ও ব্যবহার করিতে হয় না। সুন্দরী মোহনবাবু যে ভাবে গম গুড়ি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বিলাতী grapenut নামক পদার্থের ব্যবহারেরই অনুরূপ। তাঁহার মতে প্রতিদিন টাট্‌কামুড়ি নারিকেল দিয়া এবং কলারেরোন (অঙ্কুরিত) ছোলা, আদা ও গুড় দিয়া খাওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়, আরামের একটা কল্পনাই চা পান বৃদ্ধির অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। আমি আমার কয়েকজন বন্ধু চা খাইব না বলায়' দুধে চিনি ও গরম জল দিয়া তাহাদিগকে যেই বলিলাম, যে জার্ম্মানি হইতে আগত এক প্রকার সাদা চা আনিয়াছি তখনই তাঁহারা তাহাতে চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ অনুভব করিলেন, এবং বলিলেন সত্ত সত্তই তাঁহাদের অম্বল অজীর্ণতা প্রভৃতি ভাল হইয়া গেল। সমস্ত নেশার মূল হইল কল্পনা। আমরা আশাকার তরুণ সমাজ, চা, সিগারেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হইবেন।*

# ভগবচ্চিন্তা

যোগী, সাধক, ভক্ত প্রভৃতি উপাসকগণ শ্রীভগবানকে নানা ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। যোগীরা ভগবানকে হৃদয়গুহায় জ্যোতির্ম্ময়রূপে চিন্তা করেন। সাধকেরা গোলোকাদি অচিন্ত্যধামে আপন আপন ইষ্টদেবতার চিন্তা করিয়া থাকেন। কৈলাস, গোলোক, বৈকুণ্ঠ সকলি অতীন্দ্রিয় ও অচিন্ত্য ধাম। কল্পনার সাহায্যে সে সকল সূক্ষ্মতম ধামের তত্ত্ব পাওয়া যায়

* গত চৈত্রমাসের তত্ত্ববোধিণী পত্রিকায় এইপ্রবন্ধটী প্রকাশ হইয়াছিল। আমরা সমাজের চতুর্দ্দিকে যে সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও করিতেছি তাহাতে প্রবন্ধটী বিশেষ সময় উপযোগী বলিয়া ভক্তিতে পুনর্মুদ্রন করিলাম। এখন ভুক্তভোগীর চেতন্ত সম্পাদক হইলেই মঙ্গল। ( ভঃ সঃ )

না। সাধকেরা বলেন ষটচক্র ভেদ করিতে পারিলে, অথবা আত্মাকে পঞ্চকোষাদি আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় রাজ্যসমূহের সন্ধান পাওয়া যায়। তবেই দেখা যাইতেছে ভগবচ্চিন্তা যথাযথ ভাবে করিতে পারা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ভগবান কেবল যোগী বা জ্ঞানীর নিমিত্তই নহেন। আমাদের ন্যায় দীনহীন, অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরও ভাগবানকে প্রয়োজন আছে। সেইজন্য সাধারণতঃ শ্রীভগবানকে কিরূপে চিন্তা করা যায়, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা সচরাচর ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশ দেখিতে পাই। আমরা বাহ্য প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই ভগবান প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থেই বিদ্যমান। তাহার পর অন্তর্জ্জগতে বা মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি সেখানেও ভগবানের বিদ্যমানতা। তৃতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই ভগবান জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপারেই বিদ্যমান। এস্থলে বলা আবশ্যক ভগবানের ব্রহ্মরূপ বা নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় স্বরূপ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা ভগবানকে সগুণ, সক্রিয়, প্রেমময়, করুণাময়, মঙ্গলময় বিভুরূপে দর্শন করিতে চাই। যাঁহারা ভগবানের "শিব" "কৃষ্ণ" "কালী" "দুর্গা" প্রভৃতি রূপের চিন্ত করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভগবানের বিভুত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্বই চিন্তা করিব। ভগবানকে প্রাণ বা শক্তিরূপে চিন্তা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এইভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই ভগবান নিরাকার, কিন্তু প্রাণ বা শক্তিরূপে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তাঁহার রূপ নাই, অথচ তিনি ব্রহ্মাণ্ডেররূপী। এ বিশ্বের তাবৎ পদার্থই তাঁহার রূপ, এবং এ ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ বস্তুতেই তাঁহার অভিব্যক্তি; কি জড়জগৎ কি প্রাণীজগৎ কি উদ্ভিজ্জজগৎ কিছুই ভগবত সত্ত্বা বিরহিত নহে।

এক্ষণে ভগবানের ত্রিবিধ প্রকাশের প্রত্যেক প্রকাশটী আমরা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভগবান প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থে বিদ্যমান। যাঁহারা নিত্য শিবপূজা করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, শ্রীভগবানকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতে, এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও স্বকীয় চিত্ত-বৃত্তির মধ্যে চিন্তা করিতে হয়। বস্তুতঃ এ বাহ্য জগত বৈদান্তিকের চক্ষুতে "নশ্বর" বা "মায়াময়" হইলেও, ইহা ব্যবহারত ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত নহে। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সত্য এবং প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থেই ভগবানের বিদ্যমানতা সমুজ্জল ভাবে প্রতীয়মান হয়। আর, ভগবৎসত্ত্বা সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করিতে পারাই মানব জীবনের চরম সাধনা।

যখন পূর্ব্বগগন লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া মার্ত্তণ্ডদেব সমুদিত হন, তখন আদিত্য মণ্ডলেয় মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে। যাঁহারা নারায়ণের ধ্যান করেন, তাঁহারা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভগবানকে অবশ্যই চিন্তা কারবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ধ্যানটী মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ না হইয়া সম্পূর্ণ জীবন্ত হওয়া আবশ্যক, প্রত্যক্ষ ভাবে, পূর্ণ ভাবে, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে শ্রীভগবানকে দর্শন করাই নারায়ণের প্রকৃত ধ্যান। এইরূপে বায়ু, অগ্নি, সলিল প্রভৃতি প্রত্যেক ভূতেই ভগবানের প্রত্যক্ষ বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমরা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা দেবীকে নারায়ণের দ্রবময়ী রূপ চিন্তা করিয়া থাকি, সবং পতিতোদ্ধারিণীর পূত সলিল স্পর্শ করিয়া আপনা-দিগকে সুপবিত্র মনে করিয়া থাকি; কিন্তু সূক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে যেখানেই সলিলের বিদ্যমানতা সেইখানেই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ। কিন্তু সলিলকে জড় বস্তু ভাবিয়া সলিলের অভ্যন্তরে ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি না করিতে পারিলেই আমাদের সলিল দর্শন বৃথা হইল। বস্তুতঃ বৈদিগ যুগে আর্য্য ঋষিগণ, অগ্নি, বায়ু, সলিল প্রভৃতির স্তোত্রাদি লইয়া সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন; তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা পূর্ব্বেও স্থূল ভূতগণের

বাহ্যরূপ দর্শন করিতেন না, পরন্তু, অনল, অনিল ও সলিলের মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আমাদের চক্ষুকেও সেই ভাবে শিক্ষিত করা উচিত যাহাতে আমরা সলিলাদি ভূত পদার্থগণের বাহ্যরূপ দর্শন না করিয়া তদভ্যন্তরে শ্রীভগবানের সুস্পষ্ট সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারি। এইরূপ করিলে, ভগবান সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে আমাদের পক্ষে সুলভ হইবেন, এবং যখনই আমরা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, অথবা স্বচ্ছ জলাশয়, অথবা সুমন্দ বায়ুহিল্লোলাদি দর্শন বা অনুভব করিব তৎ তৎ বস্তুতে শ্রীভগবানের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইব। এইরূপে সামান্য অগ্নি হইতে ভীষণ দাবাগ্নি, সামান্য জলাশয় হইতে বিশাল মহাসাগরে, সামান্য বায়ু প্রবাহ হইতে ভীম প্রভঞ্জন, সর্ব্বত্রই সর্ব্ব আকারেই আমরা শ্রীভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।

এইরূপে বুঝিব সুনীল নভোমণ্ডল, অগণ্য তারাখচিত নৈশ আকাশ, রজত কিরণবর্ষী সুস্নিগ্ধ মিহির মণ্ডল সকলই শ্রীভগবানের সত্ত্বা ও মহিমা-দ্যোতক। বস্তুতই বাহ্য প্রকৃতির যেদিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, তখনই সেইদিকেই ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিলেই আমাদের চক্ষুলাভ সার্থক হয়। বৈদিক কালে পূজ্যতম ঋষিগণ এই ভাবে ভগবৎ সত্ত্বা উপলব্ধি করিতেন। তাহার পর উপনিষদের যুগ। এই যুগে ঋষিগণ, বাহ্য জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্জ্জগতেও ভগবানকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিত্তবৃত্তির সমস্ত কার্য্যে, মন, বুদ্ধি, হৃদয়, সর্ব্বত্র ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাহারা শ্রীভগবানকে চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, আত্মার আত্মা, হৃদয়েশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদিগেরও পূজ্যপাদ ঋষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অন্তর্জ্জগতে বা চিত্ত বৃত্তির মধ্যেও শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে হইবে। এইরূপে বুদ্ধি বিবেচনা, মেধা প্রতিভা প্রভৃতি মস্তিস্কের কার্য্যে, এবং স্নেহ, মমতা,

দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তিতেও আমাদিগকে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইবে। পিতার যত্নে, মাতার স্নেহে, বন্ধুর প্রণয়ে, পত্নীর প্রেমে, কারুণিকের করুণাধারায়, এবং ভক্তের ভক্তি ও আত্মনিবেদনে যদি আমরা ভগবানের প্রত্যক্ষ লীলা দর্শন না করিতে পারি, তবে আমাদের চক্ষুধারণ বৃথা। তৃতীয়তঃ পুরাণের যুগ। এই যুগে আমরা দেখিতে পাই ভগবান শুধু বাহ্য প্রকৃতি বা অন্তর্জ্জগতে বিদ্যমান নহেন পরন্তু তিনি জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই বর্ত্তমান। জাতি সকলের উত্থান ও পতন সাম্রাজ্য সকলের আবির্ভাব ও তিরোভাব, ব্যক্তিবিশেষের প্রাদুর্ভাব ও অন্তর্ধান সর্ব্বত্রই ভগবল্লীলা সমভাবে বর্ত্তমান। সামান্য কীটানুকীটের ধ্বংস বা পতনেও যে ভগবানের হাত বিদ্যমান, নেপোলিয়ন বা রুষিয়ার জারের পতনেও সেই ভগবানের হাত সমভাবে ক্রিয়াশালী। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই যেমন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ষড়ঋতুর আবির্ভাব, তেমনি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই জগতের রঙ্গমঞ্চে আজ, হরিশ্চন্দ্র, আজ রামচন্দ্র, আজ যুধিষ্টির, আজ অশোক, আজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রাদুর্ভাব। ফলতঃ জাগতিক কি ক্ষুদ্র, কি মহান্, কি প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ, কি ক্ষণিক কি সুদীর্ঘকালব্যাপী, সকল ব্যাপারেই শ্রীভগবান পূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। ভগবান না থাকিলে এই জগল্লীলা এখনই তিরোহিত হয়। তাঁহার সত্ত্বাতেই আমাদের সত্ব, এবং তিনিই আমাদের দ্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা ও সর্ব্বস্ব। আমরা যেন সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস।

# জীবের স্বরূপতত্ত্ব ও ভজনসার গোরা।

(৩)

শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবেশাবতার গোরা র'সে আত্মহারা হইয়া জগৎকে জানাইলেন,—

যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তাকে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥

পরম প্রেমিক মহাজন প্রেমানন্দ ঠাকুর, গোরা নাম রসে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বতত্ত্ব সার বাণী প্রেমকণ্ঠে গাইলেন :—

সে তিন যুগের, আচার বিচার, এখন সে সব রাখ।
বদন ভরিয়া, গৌরহরি বল, যুগের ধরম দেখ॥

সারগ্রাহী ভক্ত মহাজনগণ এরূপ আত্মহারা হইয়া নানাভাবে প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া জগজ্জীবকে গৌর নাম নিতে ও ভজন করিতে বিশেষ-ভাবে মিনতি করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অনন্ত গৌরভক্তের অনন্ত প্রেমরসবাণীর সীমা করিতে পারে কাহার সাধ্য। সারগ্রাহী ভক্ত মহাজনগণ সর্ব্বস্ব দিয়া গোরাপদ ভজন করিয়া গিয়াছেন, এবং সর্ব্বজীবকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন "গোরা" ভজিতে। সেন শিবানন্দের জাতি, প্রাণ, ধন, ছিলেন গোরা। পরমভক্ত দেবর্ষি নারদাবতার শ্রীবাস পণ্ডিত :—

সবংশে চারি ভাই করে গৌরাঙ্গের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনে নাহি জানে দেবী দেবা॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

রাধা শক্তি গদাধর পণ্ডিত গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস ও গোপীনাথ সেবা তৃণ প্রায় ছাড়িলেন। পণ্ডিত গোসাইর গৌরাঙ্গ প্রেমের

সীমা নাই। তিনি প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছিলেন, "কোটী গোপীনাথ সেবা তৎপদ দর্শন।" সবংশে গৌর বিনা কিছুই জানিতেন না, বন্ধু রামানন্দ ও রায় রামানন্দ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৌরপ্রেমের একটু নমুনা এই :—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই জপ এই তপ এই লয় নাম। ( শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ )

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের গৌরপ্রেম মহিমার কথা বলিবার সাধ্য নাই। তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ শতক মহাগ্রন্থদ্বয়। গৌরপ্রেমে আত্মহারা হইয়া ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন :—

পাষানে কুটির মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥

তিনি ভজনানন্দে আত্মহারা হইয়া জীবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন অমূল্য পদরত্নহার। যথা :—

ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ বিষকূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়াজলে, দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়, কায়মনে লহরে শরণ।
পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে, কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরাসম কেহ নহে, না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥

নারায়ণীসুত ঠাকুর বৃন্দাবনদাস ও পরম রসিকভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর, শ্রীশ্রীরসরাজ গৌরগোবিন্দ ভজনের ও প্রচারের মহাতত্ত্ব, অমূল্য

প্রেমভাণ্ডার শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাগ্রন্থদ্বয় পরম প্রেমিক, রসিকভক্ত শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল মহাগ্রন্থের কৃপায় গৌর প্রেমরসের ঢেউ সর্ব্বত্র বহিছে। শ্রীল দাসগদাধর গৌরপ্রেমে মাতোয়াল হইয়া দুর্দ্দান্ত কাজিগণের মুখে বোলাইলেন 'গৌরহরি' নাম। অনন্ত গৌরভক্তগণের গৌরপ্রেম ভজন ও প্রচার কার্য্যের বীজ, অনন্ত দেবাদির ও অবর্ণনীয়। অসাধনের ধন গোরাচাঁদ। তিনি নিজগুণে বিকাইলেন কলির জীবের হাতে। তাই মহাজন রসিকভক্তগণ 'গোরাভজ, গোরাভজ' বলিয়া উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন এবং নিজপদেও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতস্পুত্র ও প্রিয়শিষ্য শ্রীল নয়নানন্দ ঠাকুরের একটী পদ এই :—

কলি ঘোর তিমিরে, গরাসল জগজন, ধরম করম গেল দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥
ভাইরে গোরা গুণ কহনে না যায়।
কতকরি বদন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায় ॥
চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়াছে, সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
মিছা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহিনজন, দরপণে কিবা তার কাজে ॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানই, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দে ভনে, সেই সে সকল জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার ॥

এরূপভাবে অনন্ত গৌরভক্ত মহাজনগণের অনন্ত সুধামৃত পদ সমুদ্র রহিয়াছে। কত উল্লেখ করিব তাহা। তবে মহাজন ভক্ত চূড়ামণি প্রেমানন্দ ঠাকুরের একটী পদ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না সাধ মিটিতেছে না, তাই রসিক মহাজনের রস প্রেমগীতি লিখিয়া আত্মতৃপ্তি করিতেছি। পদটী এই :—

ভাইরে! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।

এতিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিত পাবন॥

হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি লেশ; বল তার কি হবে উপায়।

রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥

হেম-জলদ কায়, প্রেমধারা বরিষয়, করুণাময় অবতার।

গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল, কি জানি কেমন মন তার

কলি-ভব-সাগরে, নিজনাম ভেলা করি, আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।

তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে, এ প্রেমানন্দের পরিহার॥

গৌর পার্ষদ, গৌরগত প্রাণ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের "যদি গৌর না হইত, কিমেনে হইত, কেমনে ধরিতাম দে" এই মহাপ্রেমপদরত্নহার যিনি হৃদয়ের সর্ব্বস্ব না করিয়াছেন তাহার জনম বৃথা। ভক্ত মহাজনগণের ভজন সার পদামৃতে শ্রদ্ধা ও রুচি হইয়াছে যাঁর, মহাভাগ্যবান তিনি।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন রায়।

# বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

## বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, চৈতন্যাব্দ ৪৪৫—৪৪৬।

( তিথি মান গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা মতে গৃহীত )

### বৈশাখ।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১১ই বৃহস্পতিবার। |
| অক্ষয় তৃতীয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা | ১৮ই বৃহস্পতিবার। |
| জহ্নুসপ্তমী | ২২শে সোমবার। |
| একাদশী | ২৬শে শুক্রবার। |
| শ্রীশ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী | ২৮শে রবিবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা | ২৯শে সোমবার। |

## জ্যৈষ্ঠ।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১০ই শনিবার। |
| একাদশী | ২৪শে শনিবার। |
| শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা | ২৮শে বুধবার। |

## আষাঢ়।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ৭ই রবিবার। |
| শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা | ১৩ই শনিবার। |
| শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা | ২০শে শনিবার। |
| একাদশী ( মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীহরির শয়ন ) | ২১শে রবিবার। |
| চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ | ২২শে সোমবার। |

## শ্রাবণ।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ৬ই মঙ্গলবার। |
| একাদশী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রারম্ভ | ২০শে মঙ্গলবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ | ২১শে বুধবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন, শ্রীশ্রীবলদেবের জন্মযাত্রা, রক্ষাবন্ধন | ২৫শে শনিবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত | ৩২শে রবিবার। |

## ভাদ্র।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ৩রা বুধবার। |
| শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ব্রত | ১৪ই রবিবার। |
| একাদশী | ১৭ই বুধবার। |
| মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবামনদেবের অর্চ্চনা তদন্তে পারণ সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন | ১৮ই বৃহস্পতিবার। |

## আশ্বিন।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ২রা শুক্রবার। |
| শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব | ১৫ই বৃহস্পতিবার। |
| একাদশী | ১৬ই শুক্রবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসযাত্রা | ২০শে মঙ্গলার। |

## কার্ত্তিক।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১লা শনিবার। |
| গোবর্দ্ধনযাত্রা বা অন্নকূট | ৫ই বুধবার। |
| গোপাষ্টমী | ১২ই বুধবার। |
| একাদশী, সায়ংকালে শ্রীশ্রীহরির উত্থান | ১৬ই রবিবার। |
| চাতুর্ম্মাস্য ব্রতসমাপন | ১৭ই সোমবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা | ১৯শে বুধবার। |
| একাদশী | ৩০শে রবিবার। |

## অগ্রহায়ণ।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১৬ই মঙ্গলবার। |
| একাদশী | ৩০শে মঙ্গলবার। |

## পৌষ।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১৫ই বুধবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা | ১৯শে রবিবার। |
| একাদশী | ২৯শে বুধবার। |

## মাঘ।

| | |
|---|---|
| বসন্তপঞ্চমী শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন | ১০ই শনিবার। |
| মাকরীসপ্তমী শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব | ১২ই সোমবার। |
| একাদশী | ১৬ই শুক্রবার। |
| শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উৎসব | ১৮ই রবিবার। |

## ফাল্গুন।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১লা শুক্রবার। |
| শ্রীশিবরাত্রিব্রত | ৪ঠা সোমবার। |
| একাদশী | ১৬ই শনিবার। |
| শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব | ২০শে বুধবার। |

## ( ৪৪৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ আরম্ভ )

## চৈত্র।

| | |
|---|---|
| একাদশী | ১লা রবিবার। |
| শ্রীরামনবমী ব্রত | ১৪ই শনিবার। |
| একাদশী | ১৬ই সোমবার। |
| দমনকারোপণোৎসব | ১৯শে বৃহস্পতিবার। |
| শ্রীশ্রীবলদেবের রাসযাত্রা | ১৯শে বৃহস্পতিবার। |
| একাদশী | ৩০শে সোমবার। |

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা যতিধর্ম্মপরায়ণা (বিধবা) দ্বিজপত্নীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ( ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ) প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন ( শ্রীধাম নবদ্বীপ ) অথবা নিম্ননামে ও ঠিকানায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—
আচার্য্য ও সম্পাদক।
শ্রীভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল, ১৬১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# প্রাপ্ত-গ্রন্থের সমালোচনা ।

**শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-ব্রত দিন-ব্যবস্থা।**—শ্রীল হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ঈশ্বর-পাঠশালা, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৹আনা মাত্র। শ্রীগ্রন্থখানি বড় ভাল সময়ে প্রকাশ হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি শাস্ত্র মধ্যে মহাদ্বাদশ্যাদি বৈষ্ণব ব্রত দিন নির্ণয়ের যে সকল প্রমাণাদি আছে সাধারণে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বড়ই গোলমাল করিয়া ফেলে। তার পর প্রায়ই পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় শিরোমণি মহাশয় সুচিন্তা দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব জগতের বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন * * * "পণ্ডিত প্রবর শিরোমণি মহাশয় যে সকল সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম শাস্ত্র বিচারের সুসিদ্ধান্তের নিদর্শন। * * ইহাতে আমাদের দেশের বৈষ্ণবব্রত পরায়ণ নর নারীগণের বহুল সন্দেহ নিরসনের উপায় হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।" গ্রন্থখানিতে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া শেষে বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা যাহা করিয়াছেন সেটী সকল বৈষ্ণবেরই প্রনিধান যোগ্য। আমরা গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। প্রকাশকের নিকট পাওয়া যায়।

**গল্পে ভাগবত।**——প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত, এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ২৪৬নং নবাবপুর, ঢাকা হইতে প্রকাশিত, উৎকৃষ্ট বাঁধান মূল্য ১৲ একটাকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া

আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। মূল গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত, সহজে কেহ পড়িতে চায় না, যদিও কেহ কেহ ইচ্ছুক হন কিন্তু বহু সময় সাপেক্ষ বলিয়া ভয়ে সেদিকে যান না। গোস্বামী প্রভু সহজ ভাবে গল্পের মত করিয়া সংক্ষেপে লীলা সকলের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা এই খণ্ডে যাহা পাইলাম তাহার আস্বাদন করিয়া অবশিষ্টাংশ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলাম। বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রভুপাদের শিক্ষা ও উপদেশে গ্রন্থকার গোস্বামী প্রভু যেভাবে লেখনী চালাইয়াছেন তাহা যথার্থই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে, আমরা ভাগবত-রস-পিপাসু ভক্তগণকে এই শ্রীগ্রন্থের আস্বাদ লইতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

# বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

**শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগে স্মরণ মহোৎসব।—** বিগত ১৩ই বৈশাখ শনিবার শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য আমাদের গোবিন্দদাদা ( মহান্ত মহারাজ ) নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন তদুপলক্ষে বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার শুভাধিবাস হইয়া ৮ই, ৯ই ও ১০ই চব্বিশ প্রহর শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়া ১১ই মহোৎসব হইয়াছে। যেদিন প্রথম দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় সেইদিন হইতেই একেবারে স্নেহডোরে আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং অনেক অন্যায়,অনেক বিগর্হিত কার্য্য করিলেও শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহ লাভে বঞ্চিত হই নাই। দাদার পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় এবং জীবনের ঘটনাবলি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারি বারান্তরে শ্রীপত্রিকায় প্রকাশের চেষ্টা করিব। ইঁহার দ্বারা ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাজের সেবা ও শৃঙ্খলা যে

ভাবে রক্ষা হইয়াছে তাহা যথার্থই দেখিবার। কি প্রাণ খোলা ভাব, কি উদার চরিত্র, যাঁহারা দাদার সঙ্গ ক্ষণকালের জন্যও পাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা বুঝিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন এবং এইখানেই তাঁহার প্রাপ্তি হইয়াছে।

**নিবেদন**।——বর্ত্তমান বর্ষে আমরা পত্রিকা প্রকাশে বড়ই অসুবিধা বোধ করিতেছি। বহু চেষ্টা, অনুরোধ উপরোধ করিয়াও ছাপাখানার সহানুভূতি পাইতেছি না। সামান্য সামান্য কার্য্যে এত বিলম্ব করিয়া ফেলিয়া কার্য্যের বড়ই বিশৃঙ্খল করিতেছেন। কিন্তু ছাড়িয়া দিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতেও সময়ের দরকার, কাজেই আমরা মনে করিয়াছি, বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত এইখানে রাখিয়া কার্য্যের অসুবিধা দূর না হইলে নূতন বন্দোবস্ত করিব। সে কারণ আমরা সকল গ্রাহকগণকেই জানাইয়া রাখি যে, আগামী শ্রাবণ মাসে ভক্তির বর্ত্তমান ২৮শ বর্ষ শেষ হইয়া ভাদ্র মাসে ২৯শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। যাঁহাদের নিকট এখনও বার্ষিক মূল্য বাকী আছে এই সংখ্যা পাইয়া পাঠাইবেন, আর সকল গ্রাহকই নিজ নিজ বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অন্ততঃ ২।১টী গ্রাহক করিয়া আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিবেন। প্রেসের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেই আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিব। গ্রাহক মহোদয়গণ আমাদের কার্য্যের সহায় হউন।

আর একটী নিবেদন, যাঁহারা ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত উপদেশ পূর্ণ **"প্রাণেরকথা"** ও **প্রেমানন্দ-সংবাদ** লইতে চান, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া প্রাণের কথার জন্য ।/০ আনার ও প্রেমানন্দ-সংবাদের জন্য ।৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইবেন, কারণ অল্পদামের পুস্তক ভিঃ পি করিলে খরচ বেশী পড়িয়া যায়।

**শোকসংবাদ**। এবার শ্রীরাধারমণের কি ইচ্ছা হইয়াছে বুঝি না। গত বৈশাখ মাসে মহান্ত গোবিন্দদাদাকে হারাইলাম আবার

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের শ্রদ্ধেয় বিহারী দাদাকে হারাইয়াছি। শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীরাধারমণবাগে একবারও যিনি এই বিহারী দাদার সঙ্গে মিলিয়াছেন তিনিই ইহাঁর উদার প্রসান্ত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছেন। যে কোন উৎসবাদিতে বিহারী দাদাই ছিলেন অগ্রণী। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য তাই একে একে এমন শ্রীরাধারমণের বিশেষ কৃপাপাত্রগণ আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন। দাদার গুরুনিষ্ঠা যথার্থ ই অনুকরণীয়। যথাযোগ্য ব্যক্তির যথাযোগ্য অভিবাদন দাদার নিকট হইতে যেমনটি লোকে পাইয়াছে এমনটি বড় দেখা যায় না। এখনও যেন দাদার সেই সুনির্ম্মল শ্রীমুখের হাসিমাখা কথা অমোদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। রাধারমণ! তোমারইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমরা আর কতদিন এমনভাবে এসব দেখিব? দাদা যেখানেই থাক, এই কাঙ্গালদের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিও।

## মিয়াপুর সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ

Village directory of Presedency of Bengal.

Vol IX. Nuddea.

Compiled by the Post master General of Bengal.

Calcutta printed at the Bengal secretariate press 1886. page 43. Line 11

| Name of Village | Name of Mauza | Name of Thana | Post office from which served |
|---|---|---|---|
| Meyapur | Meyapur | Katwali | Belpukria |

অতএব উপরোক্ত MEYAPUR ( মিঞাপুর ) গ্রাম সম্বন্ধে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের ১৮৮৬ ইংরেজীর বিবরণ দ্বারা অবগত হওয়া গেল,—এই মিঞাপুর গ্রাম সেই সময় থানাকতোয়ালি ( অর্থাৎ কৃষ্ণনগরের ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর বর্ণিত মিঞাপুর গ্রাম তৎকালে বেলপুকুর পোষ্টাফিসেরই এলাকা ভুক্ত ছিল। সুতরাং এই মিঞাপুর গ্রাম ১৮৮৬সাল পর্য্যন্ত পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের বর্ণনানুসারে নবদ্বীপ থানা ও নবদ্বীপ পোষ্টাফিসের এলাকা ভুক্ত না থাকিয়া পৃথক থানা ও পৃথক পোষ্টাফিসের শাসনাধীনেই ছিল। অতএব ঐ মিঞাপুর গ্রাম যে নবদ্বীপ সহরের কোনরূপ সম্পর্কীয় ছিল না উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে এবং ১৮৮৬সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মিঞাপুরের অন্য নাম যে মায়াপুর ছিল তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। সুতরাং ১৯২৯সালে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে উপরোক্ত MEYAPUR গ্রামের নাম MAYAPUR ( মায়াপুর ) নামে ডাক বিভাগ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে, ইহাদ্বারা ঐতিহাসিক সত্যেরই অপলাপ করা হইয়াছে। মিঞাপুর গ্রামকে শ্রীমায়াপুর নামে প্রচারিত হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলীর একটা চির সত্য বিলুপ্ত হইয়াছে। ১১।৪।৩০।

শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজী
পোঃ নবদ্বীপ, প্রাচীন মায়াপুর নদীয়া

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"


| ২৮শ বর্ষ | ভক্তি | শ্রাবণ |
|---|---|---|
| ১২শ সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ১৩৩৭ |


# শ্রীশ্রীরথযাত্রা-গীতি

( শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব কৃত )

স্বরূপেরে ধরি কহে ধীরি ধীরি
শুনলো মরমী সখী।
রথেতে চড়িয়া আসিছে বঁধুয়া,
অরুণ কমল আঁখি॥
হাসিয়া বাঁশীয়া, মু'খানি চাহিয়া
কত না উঠিছে মনে।
মল্লিকা মালতী ফুলে মালাগাঁথি
সাজাইব সযতনে॥
অতি নিরজনে বসিয়া দু'জনে,
হৃদয় ঢালিয়া দিব।
অতি সঙ্গোপনে, পরশ রতনে
হিয়ার মাঝারে থোব।

শুনগো ললিতা, মরমের কথা,
কহিনু তোমার ঠাঞি।
এ তিন ভুবনে প্রাণবঁধু বিনে,
আর কেহ মোর নাই॥

—•—

(ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে কীর্ত্তন)

কে মোর মরমী বটে কারে কব দুখ।
না হেরি গৌরাঙ্গচাঁদে বিদরয়ে বুক॥
কাঁহা স্বরূপরাম রায় কাঁহা নিত্যানন্দ।
কাঁহা শ্রীবাস গদাধর শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র॥

সংগ্রাহক—শ্রীঅমূল্যধন রায়ভট্ট।

# ভক্তির অষ্টাবিংশ বর্ষশেষে

অনন্ত লীলাবিলাসী, অসীম করুণানিলয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণা ভঙ্গীতে এবং "ভক্তি" পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণের কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহে "ভক্তি" আজ ২৮শ বর্ষ পূর্ণ করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। কি ভাবে পাঠকগণ ভক্তিকে গ্রহণ করিয়া সুখ পাইতেছেন তাহা আমরা জানি না, তবে আমাদের বড় আদরের ধনকে যে নিয়মমত গ্রাহকগণের হাতে দিতে পারিতেছি, এখনও যে নানা প্রকার বাধা বিপত্তিতে দেবী আমাদের সেবাগ্রহণে নারাজ হন নাই, ইহাই আমাদের ন্যায় দীন দরিদ্র সেবকের বিশেষ সৌভাগ্য। এজন্য ভক্তির পাঠক পাঠিকা, লেখক ও উৎসাহ দাতা সকলেই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বৎসর শেষে ত্রুটী বিচ্যুতি স্বীকার করিয়া আবার আগামী বর্ষে কি ভাবে কি করিব না করিব তাহার একটা হিসাব দেওয়া অনেকের মতে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া দেখিতে পাই। আমরাও ইতিপূর্ব্বে তাহাই করিতাম, কিন্তু বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি যে, আমরা হাজার চেষ্টা করিয়াও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারি নাই, পারিব বলিয়াও স্পর্দ্ধা রাখি না। তাই এবার আর আগামী বর্ষে কি করিব তাহার বিবৃতি দিতে ইচ্ছানাই, তবে যথাসাধ্য দেবীর সেবার ত্রুটী হইবে না ইহা ঠিক; এখন তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যেই ইচ্ছা সেই ফল ধরে॥"

সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কিছুই হইবে না ইহা নিশ্চয়।

ভক্তির নিজের ছাপাখানা নাই, তারউপর নানা প্রকার দৈব দুর্ঘটনা আছে, কাজেই যথাসময় পত্রিকা প্রকাশের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমরা সকল সময় কৃতকার্য্য হইতে পারি না। আশা করি এই সকল কারণে ত্রুটী বিচ্যুতি যাহা ঘটে গ্রাহকগণ তাহা নিজ করুণাগুণে ক্ষমা করিবেন।

বরাবরই আমরা বলিয়া আসিতেছি যে, "ভক্তি" প্রচার করার মূলে আমাদের ব্যবসা বুদ্ধি নাই। আচার্য্যপাদের আদেশ পালন ও ধর্ম্মপ্রচার করাই উদ্দেশ্য, তবে নিজে সামর্থ বান নয় তাই গ্রাহকগণের নিকট আরও সাহায্য পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাই। সকলে একথা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু ভক্তি-কার্য্যালয়ের সহিত যাহাদের কিছু মাত্রও পরিচয় আছে তাঁহারা এবিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন। কি পুরাতন কি নূতন সকলেই যদি ভক্তির বহুল প্রচার করিয়া আমাদের সাহায্য

করিতে পারেন, তবে সে সাহায্যের বিনিময়ে ভক্তির কলেবরই বৃদ্ধি করিব। এ বিষয় আমাদের আর অধিক বক্তব্য কিছু নাই। আগামী বর্ষে ভক্তির বহুল প্রচারের জন্য সকলে অগ্রসর হউন ইহাই নিবেদন।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভক্তির চিরপ্রথা অনুসারে আমরা প্রথম সংখ্যা ভাদ্র মাসের কাগজই গ্রাহকগণের নিকট বার্ষিক মূল্য আদায়ের জন্য ভিঃ পি করি। ভিঃ পিতে ১৵০ আনা গ্রাহকগণের খরচ লাগে, অথচ ভিঃ পির টাকা সমস্ত আমাদের হস্তগত না হইলে পর মাসের কাগজও সকলকে পাঠান যায় না; কাজেই বিলম্ব হয়। যদি গ্রাহকগণ নিজ নিজ দেয় ১।৷০ দেড়টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠান তবে মাত্র ৵ আনা মনিঅর্ডার কমিসনেই হইতে পারে, অথচ যথাসময় পত্রিকাও পাইতে পারেন ইহাতে উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়। তারপর, পূজার ছুটিতে স্কুল কলেজ, আফিস আদালত সমস্তই বন্ধথাকে, পত্রিকা পাইতেও গোলযোগ হয়, কাজেই যদি শ্রাবণ মাসের পত্রিকা পাইয়া গ্রাহকগণ নিজ নিজ বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডারে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা পাইতে পারেন। আমাদের বক্তব্য আমরা বলিয়া রাখিলাম যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই করিবেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ নিতান্তই যদি কেহ ভক্তি প্রচারে সাহায্য করিতে বিমুখ হইয়া ভক্তিগ্রহণে অসম্মত হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া শ্রাবণ মাসের পত্রিকা পাইয়াই আমাদিগকে তাহা জানাইবেন। পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে—পক্ষান্তরে ভক্তি ভাণ্ডারের ক্ষতি করিবেন না ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত—ভক্তি-সম্পাদক

# রূপানুরাগ

( পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ।)

( ২ )

বরণি না হয় বরণ চিকনিয়া ।

কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয় দল
কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনীল মণিয়া ॥

অঙ্গদ বলয়া হারমণি কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি-কিঙ্কিনী বসনা ।

আভরণ বরণে অঙ্গহি ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যেছে চাঁদ কি চলনা ॥

কুঞ্চিত কেশ বেশ কুসুমাবলী
শোভে মদন শিখি চাঁদক ছাঁদে ।

স্বরূপের গান শেষ হইতে না হইতেই গৌড়ীয় ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির আঙ্গিনা হইতে ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। বর্ষার জলপ্লাবন যেমন স্থান অস্থানের বিচার করে না—পথ পাইলেই সর্ব্বত্র প্রবেশ করে—গৌড়ীয় ভক্তগণও গম্ভীরা ভিতরে কি হইতেছে, তাহার কোনও বিচার না করিয়া ভাব-রসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের রূপমাধুর্য্যের বর্ণনাময় সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দে বিভোর হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য ভিতরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন।

প্রভু ব্যাকুল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদিলেন, ভক্তগণ তাঁহাকে মধ্যে লইয়া তাঁহারই রূপ-মাধুর্য্যের গানের ধুয়ায় বিভোর ছিলেন। ভাববিভোর শ্রীগৌরচন্দ্র প্রথমতঃ উহার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, পরে বুঝিলেন—উহারা তাঁহারই কথা বলিতেছেন—আর অমনি হস্তদ্বারা উভয় কর্ণ রুদ্ধ করিয়া দন্তে জিভ কাটিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাপ্রভু অতি দীনের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া ইঙ্গিতে ভক্তগণকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। ভক্তগণের কীর্ত্তন প্রায় শেষ হইয়াছিল—তাঁহারা অচিরেই গানটি শেষ করিয়া মহাপ্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর অতি দীনের ন্যায় মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন জগতের পরম অমৃত, বৃথা কথা সেই কীর্ত্তনে শোভা পায় না—উহা শুনিতেও অপরাধ। তোমরা আমার চিরবান্ধব, যাহাতে আমার হিত হয়, যাহাতে আমি শান্তি পাই, তোমরা সেই কৃষ্ণ কথা বল—তাহা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই—আনন্দ নাই। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে আনন্দ করিব—সেদিন আর এখন আমার নাই। নিঠুর যে আমায় এমন উন্মাদ করিবে, আমি কখনও তাহা ভাবি নাই। কি করিতে কি করি, কি বলিতে কি বলি—সকলই যেন উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। আমি যদি তোমাদের কোন যত্ন করিতে না পারি, মনে করিও না যে, তোমাদের প্রতি আমার ভালবাসা নাই—যদি তোমাদের সহিত কথা না বলিয়া নির্জ্জনে পড়িয়া থাকি—ভাবিও না যে, আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন। আমি এখন আমার নিজের ইচ্ছার অধীন নই। তোমরা দয়া করিয়া আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আমি তাঁহার দেখা পাই।"

এই বলিয়া প্রভু অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন, ভক্তগণ প্রভুর

রোদন দেখিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইলেন। রামরায় ও স্বরূপ ভক্তগণকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থির করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই সুস্থভাবে উপবেশন করিলেন।

মহাপ্রভু প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন. আজ দুই রামানন্দকে একত্র পাইয়াছি। বসু রামানন্দ কুলীন গ্রামবাসী। কুলীন গ্রাম—ভক্তির পবিত্র ক্ষেত্র।

—কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর।<br>
সেহ মোর প্রিয়—অন্য জন বহু দূর॥<br>
কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহন না যায়।<br>
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ পায়॥

বসু রামানন্দ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—"দয়াময় সে তো তোমারই কৃপা"

মহাপ্রভু। রাম বসু, মনে হইতেছে যেন যুগযুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, তোমার মুখে গান শুনি নাই। তোমার সেই রূপানুরাগের পদটী আমি এখনও ভুলি নাই। সেই "মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।" স্বরূপ, বসু রামানন্দের এই পদটী অতি মধুর। তুমি শুনিয়া রাখ।

স্বরূপ। বেশ কথা—বসু মহাশয়, আপনার রচিত সেই গানটী আমাদিগকে এখন শুনাইতে হইবে।

রামানন্দ বসু লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। স্বরূপ বলিলেন, "ইহাতে আবার লজ্জা কি? বিশেষতঃ প্রভুর আদেশ।" বসু মহাশয় আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। মস্তক অবনত করিয়া মৃদুকণ্ঠে গান ধরিলেন—সঙ্গে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত।

মনু মনু শ্যাম অনুরাগে।<br>
মনোহর মধুর মূরতি নব কৈশোর<br>
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

জীতে পাসরিতে নারী বল না কি বুদ্ধি করি

শ্যাম শেল পশিল মোর বুকে।

টানিলে নাহিক যায় যত্নে নাহি বাহিরায়

অন্তরে জ্বলয়ে ধিকি ধিকে।

মহাপ্রভু বক্ষে হাত দিয়া মস্তক অবনত করিয়া গান শুনিতে ছিলেন —নয়নযুগল হইতে বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রুমালা প্রবাহিত হইতেছিল। স্বরূপ ও রামানন্দ রায় বিস্ফারিত নেত্রে বসু মহাশয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইতে ছিলেন। গায়কের নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, কণ্ঠ গদগদ হইয়া পড়িল, মুকুন্দ দত্ত গান ধরিয়া গাইতে ছিলেন, কিন্তু আর কণ্ঠস্থির রাখিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণের জন্য একবারেই নীরব।

আরও কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু মস্তক উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিলেন—"তারপর?"

রামানন্দ নয়ন জল মুছিয়া একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আবার গান ধরিলেন—

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে অধরে মুরলী লয়ে

দাঁড়াইয়ে তেরছ নয়নে।

অঙ্গুলী দোলায়ে শ্যাম কি কথা কহিল গো

সদাই তাহাই পড়ে মনে॥

কিছু না মোর সহে গায় কেবা পরতীত যায়

তিলে প্রাণ তিন ঠাইএ ধরি।

বসু রামানন্দের বাণী দিবানিশি নাহি জানি

গোপতে গুমরে মরি মরি॥

বসু রামানন্দ পদটীর শেষ তান এমন ভাবে পরিসমাপ্ত করিলেন যে, উহার ঝঙ্কার শ্রোতাদের হৃদয়ে ভাব তরঙ্গের সঞ্চার করিয়া দিল।

প্রভু বলিলেন—"রাম বসু, যোগীরা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যোগ করেন, অভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও তন্ময়তার সাধন করেন—উহাতে অনেক স্থলেই প্রাণের টান নাই—চিত্তের উপর অস্বাভাবিক বলপ্রয়োগ করিয়া চিত্তকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে হয় কিন্তু মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ও বলবৎ। যোগী যতই কেন বলপ্রয়োগ করিতে চেষ্টা করুন না কিন্তু অনেক সময়েই চিত্ত সেদিকে যায় না। দুষ্ট অশ্ব যেমন অশ্বারোহীর ইচ্ছা মত চলিতে চায় না—অপর পক্ষে বেশী তাড়না করিলে হঠ করে—অশ্বচালককে উল্টাইয়া ফেলিতে প্রয়াস পায়; দুষ্ট চিত্তও সেইরূপ যোগে বশীভূত হইতে চায় না। বরং বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু ব্রজবালাদের ভাব দেখ,—প্রাণের কেমন স্বাভাবিক টান। "দিবানিশি নাহি জানি গোপতে গুমরে মরি মরি।"—ধন্য শ্রীকৃষ্ণের রূপ আর ধন্য গোপীপ্রেম, প্রাণের স্বাভাবিক টান না থাকিলে মধুময় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। কেবল ব্রজরসেই এ সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিন রজনীই "কানু পড়ে মনে।"

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যাম-রূপ-খানি॥

রূপের আকর্ষণ বড় গুরুতর আকর্ষণ।

রামরায়। দয়াময়, এই যে এ জগতে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ভুবনমোহন রূপ প্রকাশ করেন, তাহার উদ্দেশ্য স্বীয় ভক্তগণের চিত্ত অধিকতর আকর্ষণ করা ও তাঁহাদিগকে সুখ দেওয়া। এই লক্ষণ দেখিয়াই স্বয়ং ভগবানের অবতরণ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ আপনার রূপ দেখিয়া আপনি চমৎকৃত হন, "রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার" মদনকে মোহিত করিয়া যিনি মদনমোহন নামে খ্যাতি লাভ করিয়া ছেন—তাঁহার রূপের আকর্ষণে সহজেই চিত্ত তাঁহার শ্রীচরণ পানে আকৃষ্ট হয়।

মহাপ্রভু।—তাই মনে হয়,—রূপানুরাগ মহা সাধনার ফল।

রামরায়।—কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলে সেই মদনমোহন রূপ দেখিতে পায় না। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিলেন, কংস সে রূপের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইলেন না। কংসের চক্ষে সেই শ্রীকৃষ্ণরূপই যমের ন্যায় মহাভীষণ বলিয়া বোধ হইল, আবার স্বয়ং ব্রজেও ভেদ-দর্শন বড় কম নহে। —স্নেহময়ী মা যশোদার বাৎসল্য ভাব; সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন,—আর মধুর ভাবের রস-আস্বাদনময়ী ব্রজবধূগণের কৃষ্ণরূপ দর্শন—স্বতন্ত্র;—কাহারও নিকট ইনি দুধের গোপাল—স্নেহের ধন—আবার কাহারও নিকটে শ্রীশ্রীমদন গোপাল—মধুরারতির উপাস্য মধুরোজ্জ্বল শৃঙ্গার-রসামৃত মূর্ত্তি! ভাবভেদেই রূপভেদ, তারতম্যও যথেষ্ট।

মহাপ্রভু।—হিরণ্যকশিপুর ভাব কি ভীষণ—তাঁহার জন্য ভয়ানক নৃসিংহরূপের প্রকাশ।

রামরায়। হাঁ প্রভু! তবুও রূপের প্রকাশ! উহা যতই ভয়ানক হউক না কেন? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদের দুর্ভাগ্য দেখুন,—তাঁহাদের জ্ঞানে শ্রীভগবানের কোনও রূপের প্রকাশ নাই।

মহাপ্রভু।—দুর্ভাগ্য বই আর কি? যাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্মবাদী, তাঁহারাও জানেন যে, ব্রহ্ম "সত্যং, শিবং, সুন্দরম্"। জীবে ও জগতে ব্রহ্ম শক্তিরই বিকাশ। যাহার শক্তি বিকাশেই এই জড়জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য—তিনি না জানি কত সুন্দর। সবিশেষ ব্রহ্মবাদীদের এক শ্রেণীর সাধক জগতের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দেখিয়াই ব্রহ্ম-সৌন্দর্য্যের অনুমান করেন। জগতের সৌন্দর্য্য মানুষের নয়নগোচর হয়। মানুষ আকাশের নীলিমায়, নিশার চন্দ্রিমায়, পাখীর পাখায়, কুসুমের সুষমায় সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করে। এ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কোথা হইতে আসিল, বায়ুতে কাহার সুগন্ধ

ভাসিয়া আসিতেছে, অনন্ত কিরণজালে কাহার রূপ মানুষের নয়ন সমক্ষে খেলা করিতেছে—একটুকু চিন্তা করিলেই মানুষ আপন হৃদয়ে তাহার আভাস পায়। কিন্তু এই সুন্দর জগৎ যে চিরসুন্দরের লীলা, সেই গোপী-হৃদয়-রঞ্জনের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সাক্ষাৎ অনুভব বাস্তবিকই সুদুর্লভ।

রামরায়।—হাঁ প্রভু, একশ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তির তত্ত্ব কথায় অনেক সময়েই রূপ-সাধনার মাধুর্য্য দূরে সরিয়া যায়। তাঁহারা বলেন, "তিনি অনন্ত তিনি অপরিসীম—তিনি সর্ব্বব্যাপী,"—সকল কথাই সত্য। কিন্তু এই সকল ভাব হৃদয়ে লইয়া সাধনায় বসিলে রূপের সাধন চিত্তে স্থান পায় না। রূপানুরাগ তো দূরের কথা। সসীম আমি—অসীমকে পাইব? ক্ষুদ্র আমি—অনন্তের সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ পাতাইব? অনন্ত—অনন্ত ভাবে ব্যাপ্ত। আমি কি করিয়া তাঁহাকে টানিয়া আপন করিব?

ব্রজবধূগণের রূপানুরাগ যে সিদ্ধাবস্থারও চরম ফল, সে ধারণা এই শ্রেণীর সাধকের নাই। নরেন্দ্র সরোবরের তীরে শুষ্ক জ্ঞানীসন্ন্যাসী আমাদের স্বরূপ ঠাকুরের গান শুনিয়া একবারে গলিয়া গিয়া বলিয়াছিলেন —"যিনি এমন সুন্দর তাঁহাকে যদি হৃদয়-সখা, প্রাণ প্রিয়তম ও প্রাণবল্লভ বলিবার অধিকার না পাইলাম, তবে সে সাধনায় সুখ কি? যিনি এত সুন্দর, যিনি এত মধুর—এত সরস? তিনি "অরূপ ও নিরাকার" একি ভীষণ সত্য! এ হৃদয়ে ভালবাসার স্রোত অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে—সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদনের বাসনাও অবিরাম বেগে ছুটিয়াছে তাহা তো রোধ করিতে পারি নাই—জগতের অনন্ত বস্তুতে সেই সৌন্দর্য্যের প্রভা ও মাধুর্য্যের আভা প্রকাশ পাইতেছে। সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সুন্দর মধুর জগতের উৎপত্তি। যিনি আনন্দ স্বরূপ ও রস স্বরূপ—তিনি কি নিজে অরূপ—নিরাকার? এই জাতীয় ভাব-সাধনায় নমস্কার।" সন্ন্যাসী এই বলিয়া স্বরূপের চরণতলে গড়াইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু।—এই ব্যক্তিটী তো বড় ভাগ্যবান! তারপর?

রামরায়।—তারপর তাহার বন্ধুগণ তাঁহার সহিত অনেক প্রকার তর্ক করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি শাস্ত্র তর্কে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—"তোমাদের জ্ঞান লইয়া তোমরা যতক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচার করিবে, শুষ্ক জ্ঞানের মরুভূমিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইবে, ততক্ষণ আমি এই প্রেমিক ভক্তগণের সুধাময় সঙ্গীতে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মধুর রূপ সন্দর্শন করিয়া আনন্দ সুধায় ডুবিয়া থাকিব। তোমাদের এই জ্ঞানের আলোক লইয়া তোমরা দূরে থাক, উহাতে চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া উহার দিব্য দর্শন-শক্তি নষ্ট করিবে। ভক্তের ভগবান, আপন দেহের মধুর জ্যোতিতেই প্রিয়তম ভক্তের নিকট আত্মরূপ প্রকাশ করেন, সেরূপ দেখিয়া তাঁহারা আনন্দরসে বিভোর হন। তোমাদের জ্ঞান দিব্যজ্ঞান নয়, মানুষের জ্ঞান তর্কনিষ্ঠ জ্ঞান, উহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। রূপানুরাগের গানে যে জ্ঞান হয় তাহার নিকট এই জ্ঞান কিছুই নয়। তাহা অপেক্ষাও খারাপ উহা অন্ধকার বিশেষ। তোমাদের এই জ্ঞান যখন সীমা ছাড়ে, তখন অসৎ কল্পনায় মিশিয়া আত্মহারা হয়।"

"তোমাদের শুষ্ক তর্ক তোমাদিগকে মরুভূমিতে রাখিয়াছে, কিন্তু এই ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাগরের একবিন্দু সুধা লাভেও কৃতার্থ হয়েন—আমি বুঝিয়াছি সাধনার ইহাই পরম পুরুষার্থ। তোমরা ইহাকে অন্ধ বিশ্বাস বল, অজ্ঞান বল বা কুসংস্কার বল কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের বলে যিনি শ্রীভগবানের ভুবনমোহন রূপানুরাগে বিভোর হইয়া সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন তাঁহারাই মহাপুরুষ। আমি সেই মহাপুরুষকে লাভ করিয়াছি আর তোমাদের তর্কের কচ্‌কচিতে থাকিব না।"

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"সুলক্ষণ বটে, দেশশু ফলিতেছে। ভাল, রামরায় তারপর?"

রামানন্দ। তার পরে শুষ্ক জ্ঞানীর দল আমাদের স্বরূপ ঠাকুরকে ঘেরিয়া বসিয়া গেলেন, বলিলেন—"ঠাকুর! এই রস-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের আরও একটী গান শুনাইতে হইবে।" স্বরূপ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণরেণু লাভের পূর্ব্বে এ গান শ্রবণের অধিকার জন্মে না। তোমরা প্রথমে তাঁহার চরণ-রেণু গ্রহণের অধিকারী হও, পরে এ গান শুনিতে পাইবে।

সন্ন্যাসীরা সেদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া আপনার চরণ-রেণুতে মাথা বেচিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"রামানন্দ, গঙ্গাপ্রবাহে কূপজল মিশাইবার কি প্রয়োজন? তুমি রূপানুরাগের কথাই বল।"

রামরায় মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—"প্রভু আপনার চরণ দর্শনের পূর্ব্বে এ সকল কথার কিছুই বুঝিতাম না। তবে শ্রীভগবানের রূপে যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে সে কথা শুনিয়াছিলাম। শৈশবে অভ্যস্ত একটী শ্লোক বহু কাল পরে মনে পড়িল। আমি তখন খুবই শিশু, পিতৃদেব বহু বহু গ্রন্থের ভাল ভাল পদ্যগুলি বাছিয়া বাছিয়া আমায় মুখস্ত করাইতেন, সেই সময়ের একটী পদ্যের অর্থ ক্রমেই আমার নিকট অধিকতর উজ্জ্বল হইতেছে। পদ্যটী মহা নাটকের। এক পদ্যেই প্রশ্নোত্তর। কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলিতেছেন—

আনীতা ভবতা যদা পরিণাতা সাধ্বী ধরিত্রীসুতা।
দুর্জ্জদ্ রাক্ষসমায়য়া নচ কথং রামাঙ্গমঙ্গীকৃতম্?

ধরিত্রীসুতা ক্লেশসহনশীলা সীতাদেবী বিবাহিতা, তাহাতে অতি সাধ্বী; শ্রীরাম ভিন্ন অন্য কোনও পুরুষই যখন সীতার গ্রহণীয় নয়—

এ অবস্থায় রাক্ষসী মায়ার সাহায্যে রামের রূপ ধারণ করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটিত না। তুমি তাহা না করিলে কেন ?

ইহার উত্তরে রাবণ একটী মহা সত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন—"ভাই, সে যুক্তিটী আমার মনেও উঠিয়া ছিল, চেষ্টাও করিয়া ছিলাম, কিন্তু বিপরীত ফল দাঁড়াইল—

কর্ত্তুং চেতসি রামরূপমমলং দুর্ব্বাদল শ্যামলং
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরং পরবধূসঙ্গপ্রসঙ্গঃ কুতঃ ॥

"রূপধারণ করিতে হইলেই সেরূপের ধ্যান করিতে হয়। আমি রামরূপ ধারণ করিব বলিয়া সেই দুর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ চিন্তা করিতে যাওয়া মাত্রেই পরমপদ যে ব্রহ্মপদ তাহাও আমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল, পরবধূ-সঙ্গ প্রসঙ্গ তো অতি তুচ্ছ কথা।" প্রভু, আপনার চরণ-রেণু লাভের পর হইতে এই পদটীর মর্ম্ম বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীভগবানের রূপ-ধ্যানের এমনই শক্তি বটে।

মহাপ্রভু। সত্য সত্যই রামরায়, তুমি রূপানুরাগের মর্ম্ম বুঝিয়াছ। রূপানুরাগের হোমানলে তোমার হৃদয় চির শুদ্ধ, চির পবিত্র ও নিত্য বিশুদ্ধ রসময়। ইতর রাগ দূরে ফেলিয়া শ্রীভগবানের মধুর রূপানুরাগ তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে বলিয়াই তো তুমি নির্ব্বিকার। একমাত্র এই ঔষধেই ইন্দ্রিয়-লালসা কাল-সাপ তোমার ত্রিসীমাতেও ঘেঁসিতে পারে না। আমি যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেই, আমারও তোমার ন্যায় অধিকার নাই।

রামানন্দ অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"প্রভো! যদি প্রতি কথাতেই এইরূপ করিয়া অপদস্থ করেন, তাহা হইলে চরণ-সমীপে একবারে নীরব থাকাই ভাল।"

স্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"রায় মহাশয়! প্রভু অন্যায় কথা

কি বলিয়াছেন, যে মহাপুরুষ এমন নির্ব্বিকার চিত্তে যুবতী দেবদাসীকে ব্রজভাব শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি তো আমরা আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই নাই। প্রভু যথার্থ ই বলিয়াছেন—

এক রামানন্দের হয় ঐছে অধিকার।
তাই তো জানি অপ্রাকৃত শরীর তাঁহার॥

এরূপ না হইলে কি ব্রজরস আস্বাদনের অধিকার জন্মে? তিনি যে আপনার দ্বারা রূপানুরাগের তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন—প্রকৃতই আপনি উহার যোগ্য ব্যক্তি। সাক্ষাৎ মদনমোহনের রূপ যাঁহার হৃদ যে নিরন্তর জাগরণ করে তিনিই ব্রজরসের ভজনার অধিকারী।"

রামানন্দ রায় মস্তক অবনত করিয়া দুই হাতে কর্ণরোধ করিলেন।

প্রভু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"রামরায়, আমি ন্যায্য কথাই বলিয়াছি। স্বরূপ আমার কথা ঠিক বুঝিয়াছে। ভক্তগণও তোমার মুখেই রূপানুরাগময়ী কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন। যাঁহারা ব্রজরসে রূপ সাধন করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে তোমার ন্যায় ইন্দ্রিয়-লালসা-লেশ বর্জ্জিত হইতে হইবে, এবং আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে তবে এই সকল কথা শ্রবণের অধিকার জন্মিবে।

গৌড়ীয়-ভক্তগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর এই গম্ভীর উপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক বিপুল বিপ্লব উপস্থিত হইল। কাহারও কাহারও মনে অনুতাপের অনল জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য সকলেই নীরব রহিলেন।

ক্রমশঃ

# শ্রীশ্রীগৌর গীতিকা

( জিনি ) কাঞ্চন কমনীয় কান্তি কলেবর
কুসুমেষু গঞ্জনকারী।
( শ্রী ) রাধা রাধারমণ মিলিত তনু সুন্দর
কীর্ত্তন-রাসবিহারী।
সুবিমল শারদ শশধর লাঞ্ছন
সুরুচির শোণ চম্পকরাগ গঞ্জন
সুললিত লাস্যললাম সুশোভন
সুর-নর মুণি-মনোহারী ॥
চরণ-কমলে মণি-মঞ্জীর মঞ্জুল
কুন্দ মালতীদাম কৃত চারু কুন্তল
হৃদিপর বনমাল দোলন চঞ্চল
পরিমল সুষমা সঞ্চারী ॥
পারিষদ সহচরী কৃত পরিবেষ্টন
রাসমণ্ডল ভেল শ্রীবাস অঙ্গন
( মহা ) ভাব বিনোদন শ্রীশচী নন্দন
নটবর নদীয়া বিহারী ॥
বেপথু পুলক সুবিপুল বপু সুন্দর
অবিরল বিগলিত প্রেম নয়নাসার
চন্দ্রবদনে ঘন কৃত প্রেম হুঙ্কার
কলুষ নাশন অবতারী ॥
মঞ্জরী সেবিত কুঞ্জ কেলি বিলাস
শ্রীরাধা মাধব প্রেম-উজ্জ্বল রস
(শ্রী) গুরুপদ সরবস কৃষ্ণচরণ দাস
পদ-সরোজে রজ ভিখারী ॥

দীন—শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস

# কপটতা।

( শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাস, মুন্সেফ। )

মানুষের যতগুলি ভগবৎ প্রাপ্তির বাধক আছে, তন্মধ্যে কপটতা অন্যতম। কপটতার সাধারণ অর্থ—যাহা ভিতরে প্রকৃত নয় তাহাই বাহিরে দেখান এবং অপরকে ভুলান। কপটতার মধ্যে প্রবঞ্চনেচ্ছা প্রবল। ভিতর বাহির সমান রাখিতে না পারিলে, তাহাকে কপটতা বলে। কপটতার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক অনেকগুলি দোষ আসিয়া পড়ে; ব্যবহারিক জগতে ইহা সব বড় পরিস্ফুট, তাই তাহার বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

উপস্থিত প্রবন্ধে পারমার্থিক জগতে কপটতা কোথায় দেখা যায় তারই কিয়দংশ বিচার করা যাউক্। প্রথমতঃ—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তি-লতা বীজ॥"

শ্রীগুরুপদাশ্রয় তো হইল; এখন কপটতা চেপে ধরে; মুখে গুরু গুরু করি কিন্তু কাজের বেলায় নিজের বল বুদ্ধি ধন জনাদির উপর ভরসা রেখে কাতর হয়ে পড়ি, সেই ভবকর্ণধার পরম করুণ শ্রীগুরুদেবের কথা ভুলে যাই। সময় সময় অপরকেও "শিখাই, আগে আশ্রিত হওয়া চাই।" কিন্তু আমি যে আশ্রিত হ'য়েও নিরাশ্রয় এবং স্বতন্ত্র তাহা তাদের বলি না বা বলিতে লজ্জা ও সঙ্কোচ হয়।

এই কলিযুগে দুটি মাত্র অবলম্বন আমাদের আছে; গুরু এবং নাম। এখন এই দুই জায়গায়ই কপটতা আসিয়া পড়িয়াছে, তাই নিরাবিল গঙ্গাজলবৎ নির্ম্মল ও পবিত্র ভজনানন্দ স্রোতের পরিবর্ত্তে পঙ্কিল ও

পূতিগন্ধময় দাম্ভিকতা ও অভিমানের গর্ত্ত সব চারিদিকে দেখা যায়। কেউ বলিতেছেন শাস্ত্রোক্ত মতে আমাদের দলের অধিনায়ক বা আমিই সদ্‌গুরু, অপরে তেমন নহেন। অপরের দোষ বিচার করিতে লেখনী কলুষিত করিতেছেন। যে কোন প্রকারে অপরের নিন্দাবাদ করাই মুখ্যব্রত করিয়া লইয়াছেন। কটুবাক্য প্রয়োগে অশ্লীলতারও পরিচয় দেখা যায় এবং বলিতে ভয় হয় ঐরূপ বাক্‌চাতুরীপূর্ণ প্রবন্ধও সমাদরে অনেক ধর্ম্ম-প্রচারিণী পত্রিকাদিতে অকাতরে স্থান দেওয়া হইতেছে। নিজ নিজ দল পরিপুষ্টের জন্যে স্বার্থান্ধ হইয়া অপরের যত দোষ প্রচার কর না কেন,অপর, মহানুভবদিগের বা তাদের জ্ঞানের যতই ছিদ্র অনুসন্ধান কর না কেন, তাহাতে তোমাকে কেহই নির্ম্মল ভজন পথের পথিক বলিবে না; তোমার বাক্যজালাবৃত কপটতা বাহির হইয়া পড়িবে এবং তুমি তোমার অসদুদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না; তোমার কথা শুনিয়া কাহারও হৃদয় দ্রবিবে না বা কেউ পরমার্থ রাজ্যে একতিলও অগ্রসর হইবে না। বরং এই সব কপটতাপূর্ণ দাম্ভিকের আস্ফালন ও বাহ্বাস্ফোটনাদি শুনিতে পাইয়া বহু নূতন পথিকেরা পথ-ভ্রান্ত হইয়া যাইবে এবং ভক্তির অঙ্কুর যাহার হৃদয়ে এক আধটু উদ্গম হইতেছিল তাহাও শুষ্ক হইয়া যাইবে। শাস্ত্রে পরনিন্দা বা পরছিদ্রানুসন্ধান যে মহাপাপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনানুমোদিত। তা'ছাড়া শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে নিন্দাদি শুনিলে শিষ্যের হৃদয়ে যে কিরূপতাপ হয় তাহা বর্ণনাতীত। কত অসংখ্য শিষ্যের হৃদয়ে যে কত জন্মের পুণ্যফলে, কত কৃপার গুণে যৎকিঞ্চিৎ গুরুনিষ্ঠা জন্মিয়াছিল তাহা তোমার কপট বাক্ চাতুরী দ্বারা গুরুদেবের নিন্দাবাদ শুনাইয়া তুমি নষ্ট করিয়া দিলে ইহাই কি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংস্কার? শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ বর্গের বংশধরের নিন্দা করিয়া করিয়া কত পূজ্যপাদ গোস্বামী প্রভুদের চরণে মতি ও নিষ্ঠা খাট করিয়া তুলিলে। আজকাল গোস্বামী প্রভুদের উপর

কটাক্ষ বা অবজ্ঞা অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার কলুষতা ও কপটতাপূর্ণ বাক্যবিন্যাসে কাহারও মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। একেত কলির জীব আমরা ঘোর অবিশ্বাসী, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানে আরও অবিশ্বাস ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আবার উপরিউক্ত কপটতাময় প্রবন্ধাদি পড়িয়া বা বক্তৃতাদি শুনিয়া বা তাদৃশ অসৎসঙ্গ করিয়া আমাদিগকে অবিশ্বাসের ও অপরাধের কোম্ রসাতলে যে টানিয়া লইতেছে তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই প্রকার সে ক্রমে ক্রমে কলিকালে হইবে তাহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ অনুভবে দেখিয়া গিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের একটি পদে দেখা যায় :—

আরে ভাই! বড়ই বিষম কলিকাল।
গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পুরি
তৈছ দেখ সকলি বিটাল।
ভকতের ভেক ধরে সাধু পথ নিন্দা করে
গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু পদে যার মতি খাট করায় তার মতি
অপরাধী নহে গুরুনিষ্ঠ।
প্রাচীন প্রাচীন পথ তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট কথার সঞ্চার।
গঙ্গাজল যেন নিন্দে কুপ জল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সবার।
যার মন নিরমল তার করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদুমতি করে ভঙ্গ
তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড।

কাল ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে এ জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিধি তায় ॥

এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীনামের উপরও কটাক্ষ। ভগবানের নানাপ্রকার নাম। যাহার যাহা অভিরুচি গুরু পরম্পরা ক্রমে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে অপরের বলিবার কি আছে? কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় নানাস্থানে ও নানাভাবে অপরের প্রিয় নামের উপর ধর্ম্ম সংস্কারের ভান করিয়া কতই আবল তাবল বকিতেছেন, কতই প্রকারে শ্রীগুরু-প্রদত্ত নামের উপর নিষ্ঠা কমাইয়া দিতেছেন। অবশ্য নিজ উপাস্য প্রিয় নামের উপর নিষ্ঠা চাই, তাই বলিয়া কি অপর নামের উপর কটাক্ষ বা নিন্দা করিব? নাম সর্ব্বশক্তিধর, নাম নামী অভিন্ন, এসব পরমার্থ রাজ্যের বর্ণ পরিচয়; কিন্তু বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আমরা জ্ঞাতসারে প্রভুর নামের উপর কতই না সমালোচনা করিতেছি। নিজে ত নামের কাছে অপরাধি হইতেছিই সঙ্গে সঙ্গে বহু কোমল হৃদয় নব অনুরাগীর প্রাণে অপরাধের বীজ বপন করিতেছি। ভাইরে! বহু জন্ম সুকৃতির ফলে বহু কৃপার গুণে যতকিঞ্চিৎ নামের প্রতি অনুরাগ হইতেছিল তাহা আমরা এই সব কপটতাময় বাক্‌জালে হারাইয়া ফেলিতেছি। অন্য সম্প্রদায় বা উপাসকগণের কথা ছেড়ে দিলেও যাঁরা শ্রীমাধবগৌড়ীয় সম্প্রদায় অন্তর্গত বলিয়া দাবি করেন, অর্থাৎ যাঁরা শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উপাসক, তাদের মধ্যেও এই উপরিউক্ত নামের উপর কটাক্ষ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। তুমি অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নানা ভাবের মধ্যে কোন ভাবের উপাসক এবং সেই সেই ভাবের পুষ্টিকারক বা অনুকূল কোন নামের উপাসক, তাই বলিয়া কি অপরকে বা অপর কোন ভাবের

উপাসককে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে? তাদের উপাসিত অপর নামের উপর কটাক্ষ ও সমালোচনা করিবে? তোমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রী গৌরসুন্দর বিশেষ ভাবে নামের প্রচার করিতে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এ হেন মহাপ্রভুর উপাসক হইয়া নামেরউপর কটাক্ষ করিব, ইহা প্রাণে সয় না। আমাদের একটা অভিমান যে, এই অবতারে নামের যেরূপ প্রচার হ'য়েছিল তাহা অন্য কোন অবতারে হয় নাই। সেই 'হরেকৃষ্ণ পূর্ণ শ্রীবদন' প্রভু কোথায়, তার সেই নাম প্রেম প্রচার লীলা কোথায়, আর তাঁর তথাকথিত উপাসকগণ যাঁরা অপরের আরাধিত বা উপাসিত নামের উপর খড়্গহস্ত কটাক্ষ করেন তাঁরা কোথায়। আমরা কোথায় চলিয়াছি বা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি এবং অসৎ যুক্তি পূর্ণ দাম্ভিক ও কপটের অবজ্ঞাসুচক কথা শুনিয়া আরও কোথায়ইবা যাইব, তাহা একটু ভাবিবার কথা নহে কি? সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! এই সব কাণ্ড দেখিয়া প্রাণ কেঁদে উঠে, তাই দু এক কথা প্রভুর প্রেরণায় লিখিলাম।

"নাহি কারো স্ববিরোধ নাহি কারো অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবরণ।" ( চৈঃ চঃ )

যাহা ঘটিতেছে, যাহা চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি—শুনিতেছি, তাই লিখিলাম আশা করি কৃপাময় অদোষদরশী বৈষ্ণবগণ, দোষ লইবেন না।

আরও দেখা যায়, শ্রীধামের উপরও বাক্যবাণ সুরু হইয়াছে। কেহ বা একেবারে শ্রীধাম মাহাত্ম্য উড়াইয়া দিতে বসিয়াছেন। আমাদের প্রাণারাম মধুর শ্রীধাম নবদ্বীপ, যার নাম শুনিলেই প্রভুর লীলা সব জাগিয়া উঠে এবং সাত্বিক বিকার সব দেখা যায়, সেই পরম মুখ্য ধামের উপর কটাক্ষ। কত শত সিদ্ধ মহাত্মা মহানুভবগণ যে বর্ত্তমান অবস্থিত শ্রীধামের রজ প্রার্থী হইয়া সেই ধামে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, এখন সেই প্রভুর নিত্যবিহার ভূমি

কপটি দাম্ভীকদিগের নূতন আবিষ্কৃত ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক মতানুযায়ী কিছুই নয় একটা কল্পনা মাত্র এবং আসল শ্রীধাম অন্য এক স্থানে! ভাইরে! এসব দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ কাঁদে—আমরা কোথায় চলিয়াছি, ধর্ম্মের নামে বা ভান করিয়া আমরা কি অকল্যাণকর অধর্ম্মের পোষণ করিতেছি। দেখুন লুপ্তলীলাভূমি সব মহাত্মারা অনুভবলব্ধ জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারেন ইহার কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রজের সমস্ত লীলাস্থলী গোস্বামীপাদগণ অনুভবে বাহির করিয়াছেন; তদ্রূপ কত সিদ্ধ মহাত্মাগণ এই বর্ত্তমান অবস্থিত শ্রীধাম নবদ্বীপ মধ্যে অনুভবে জানিতে পারিয়া তাদের কত কঠোর সাধন ভজনের ফলে সেই রজপ্রাপ্তি হইয়াছেন। আমরা অন্ধ আমাদের ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কি তাদের অনুভব লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়? আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সতর্ক থাকা চাই, নচেৎ এই সুদুর্ল্লভ ধাম নিষ্ঠাও আমরা অল্পদিনে হারাইয়া বসিব। একে একে আমরা সকলই হারাইব।

একদিন কোন মহাত্মা এইসব বিষয় লইয়া কতই না আক্ষেপ করিতেছিলেন—যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম, যতটুকু পারিলাম তারই হৃদয়ের ভাবের অনুবাদ করিলাম। ইহাতে আমার মৌলিকতা কিছু নাই। তাঁর কথা তাঁকে সমর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

প্রেমানন্দ দাসের মনঃশিক্ষা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

এ মন! তুমি কি ভাঁড়াম কর।
সেবক হঞাছি আশ্রয় করেছি
কিসে এ গরব ধর॥

সেবক বলিয়া　　এ তিন আখর
তিনের তিনটি কাম।
তা যদি না কর　　কি মত আচার
তে কিসে সেবক নাম॥
সে আখর কয়　　কর গুরু সেবা
স্বীকার গুরুর বাক।
তা ছাড়ি সেবিলি　　স্ত্রীবাক্ পালিলি
সে ঘুচি রহিল বক্।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে　　বাসুদেবে ভজ
ফুকারি কহিছে 'ব'।
তাহা না করিলি　　অসতে মাজলি
'ব' ছাড়ি রহিল 'ক'॥
'ক' বলে কহ না　　কৃষ্ণের চরিত
শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান।
তা কৈলে কখন　　সংসারে মগন
'ক' গেল করিয়া মান॥
একে একে দেখ　　তিনেই ছাড়িল
বসতি হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ　　তে যম কিঙ্কর
হাতে বাজাইছে তালি॥

গৌর বিশ্বম্ভর! নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদের কপটতা ঘুচাইয়া আমাদিগকে তোমার পানে টানিয়া লও।

# শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব

( প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম এ। )

( ২ )

সত্যদ্রষ্টৃগণ সুপ্রাচীন কাল হইতেই পরম সত্য বস্তুকে "আনন্দ" বলিয়া দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন-বিশ্বের—অনুপরমাণুর অন্তরে এক মহাকামনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই মহান্ কামনাময় সুরের মূল কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা এক কামনাময় পুরুষের সন্ধান পাইয়াছেন। এই কামপুরুষের আয়তন কামনা। আয়তন বলিতে 'পরিমাণ' 'সীমানা' 'বিস্তার' যাহাই মনে করা যাউক না কেন সকল দিক দিয়াই অসীমতাকে বুঝাইবার জন্যই কামকে সেই মহাপুরুষের আয়তন বলা হইয়াছে। কামের শেষ নাই। হৃদয় সেই পুরুষের বাস স্থান। এই হৃদয় সমষ্টিও হইতে পারে ব্যষ্টিও হইতে পারে। কামায়তন মহাপুরুষের বাসস্থান জীবের হৃদয়। মন সেই মহানের জ্যোতিঃ। সঙ্কল্প ও বিকল্প করাই ম'নর স্বভাব। এই সঙ্কল্প বিকল্পের মধ্যদিয়াই কামনা বহ্নির বিকীরণ। অতএব জীবের মন জ্যোতিঃ সকলের পরম আশ্রয় এই কাম পুরুষকে জানিলে সকল বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই কাম পুরুষের দেবতা স্ত্রী। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই কামময় মহান্ পুরুষের কথা আছে যথা—

"কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনো জ্যোতির্য্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্যাত্মনঃ পরায়নং স বৈ বেদিতা স্যাৎ * * * * * তস্যকা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ"। বাংলার শ্রীগৌরসুন্দর ভালবাসা

দিয়া—প্রীতি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে এই কামময় পুরুষের দ্বি-দেবতা পুরুষের আনন্দলীলার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি বার্ত্তাং কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ

সঞ্চার্য্যরূপেব্যতনোৎ পুনঃসঃপ্রভুর্বিধৌ প্রাগিবলোকসৃষ্টিম্।

সাধারণতঃ মনে হয় প্রথমে একটী পদার্থকে বিশেষ করিয়া বিশ্লেষণ করিব, উহার স্বরূপ স্বধর্ম্মের পরিচয় জানিয়া লইব, পরে উহাকে ভালবাসিতে হয় ভালবাসিব। কার্য্যতঃ কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে না। স্বরূপ মাধুরীই সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া দেয়; বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞান, স্বরূপের পরিচয় হয় তাহার প্রীতির গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে। কোনরূপ বিচার বুদ্ধি প্রীতিকে পরিচালিত করিতে পারে না উহারা প্রীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যেখানে প্রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় বিচার বুদ্ধি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। বিচার বুদ্ধি থাকে না বলিয়া প্রীতির কিছু গৌরব হানি হয় না, ভালবাসার মহিমা কমিয়া যায় না। এই বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া এবং প্রেম-মহিমা অনুভব করিয়াই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিক কবি ব্রাউনিং ( Browning ) বলিয়াছেন,—

"So let us say, not, since we know we love,

But rather since we love know enough."

"আমরা জানি অতএব ভালবাসি একথা না বলিয়া বরং বলিব যেহেতু ভালবাসি অতএব আমরা খুব জানি।"

শ্রীবৃন্দাবন মাধুরীতে যাঁহারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করিয়াছেন সেই বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বেদোক্ত কামময় পুরুষকে বৃন্দাবনে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।

কামবীজ কাম গায়ত্রী যাঁর উপাসন॥

অন্যস্থানে—

"কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করিল উদয়
ত্রিজগত কৈল কাম ময়॥"

ত্রিজগতকে কামময় করার স্বভাবটী নূতন আগন্তুক নহে। উহা চিরন্তন। এই কামময় লীলাও নিত্য। কামনার টানে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, গুল্ম, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, নর, দেবতা স্বয়ং ব্রহ্মা রুদ্রকে পর্য্যন্ত টানিয়া কামময় মহান্ পুরুষের সহিত মিলিত করিবার জন্য পিয়াসী করিয়া তোলে। নন্দনন্দন স্বরূপ গোপবেশ বেণুকর নব কিশোর নটবর রূপ নরলীলার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই স্বরূপের মাধুর্য্যও অসমোর্দ্ধ। এমন মাধুরী ভগবানের আর কোন স্বরূপেই ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ বা সুযোগ নাই। শ্রীবৃন্দাবন ধামই এই স্বরূপটীকে বিশেষ করিয়া বিকাশ করিয়া দিয়াছে—তাহাতে আবার ভৌম বৃন্দাবন। অতএব বৃন্দাবন ধাম আমাদিগের শরণ হউক।

বিকুণ্ঠপুর সংশ্রয়াৎ বিপিনতোঽপি নিঃশ্রেয়সাৎ
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রস শ্রেয়সীম্।
চতুর্ম্মুখ মুখৈরপি স্পৃহিতার্ণ দেহোদ্ভবা
জগদ্‌গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি জগতের আদি গুরুবর্গও এই শ্রীধামের রজে অভিষিক্ত হইতে; এই চিন্ময় ভূমিতে তৃণ জন্ম লাভ করিবার জন্য কামনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা চারিমুখে ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্॥

পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন—রাজপুত্র হয়েন—সাধারণের বন্ধু, সুহৃৎ, আত্মীয়, কুটুম্ব হয়েন সেই দেশবাসীর সৌভাগ্য অবশ্যই কীর্ত্তনীয়। ব্রহ্মাও এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াই বলিলেন,—

তদ্ভুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকম্॥

হউক না কেন বন তবুতো বৃন্দাবন। না হয় উহা গো সকলের আবাস স্থান তাহাতে ক্ষতি কি? গোবিন্দ সেই গো সকলের রক্ষক। ধূলি হইলেই বা ক্ষতি কি? উহা যে প্রেমময়ী গোপীপদ রেণু! ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যময় সুখ অতি তুচ্ছ শ্রীবৃন্দাবন ধামই বরং অধিকতর সুখময়।

শ্রীগোবিন্দের নিত্য সঙ্গী, বৃহস্পতির মেধাবান পরম প্রিয় শিষ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয় ব্রহ্মার বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রজসুন্দরীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিয়া উঠিয়াছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্॥

"ব্রজরমাগণের চরণরেণু ভোগি গুল্ম লতা ওষধি বৃক্ষের স্বজন হইয়া আমি বৃন্দাবন বাস করিতে পারিব কি?

কথিত আছে শ্রীবৃন্দাবনে বাস লাভ করিবার জন্য বৃন্দাবন ধাম মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া ঐশ্বর্য্যের প্রতীক শ্রীভগবানের বক্ষস্থল বিহারিণী স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবীও তপস্যা করিয়াছিলেন।" যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপঃ।" বৃন্দাবন বিহারীর মাধুরী পতিব্রতা শিরোমণি সাবিত্রী অরুন্ধতি প্রভৃতির মনও বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে।

শ্রীভগবানের নাভি কমলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা, নিত্য সঙ্গী হইয় উদ্ধব, প্রিয়া হইয়াও শ্রীলক্ষ্মী দেবী, বৃন্দাবনের মাধুরীতে পরমাকৃষ্ট। তাহাতেই ব্রহ্ম সংহিতার কথা মনে পড়ে—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ
দ্রুমাঃ ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দ জ্যোতিঃ পরমপি তদস্বাদ্য মপি চ॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণি গণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না ম্যাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য প্রতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তি মান॥
লক্ষ্মী জিনিগুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ॥

এই সকল গুণেই সকলের মন কম্পাশের কাঁটার মত শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবস্থান করে। অন্যের কথাতো দূরে স্বয়ং ভগবান বৃন্দাবন বন-মহিমার আকৃষ্ট। শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার সহিত বৃহদ্বন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিবার সময় যে পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীগোপাল চম্পুগ্রন্থে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছেন। শ্রীভাগবত বক্তা শ্রীশুকদেবও

পরমাবিষ্ট চিত্তে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের এই আনন্দ দর্শন করিয়া লীলাশ্রবণাবিষ্ট পরীক্ষিতকে প্রেম ভরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

বৃন্দাবনং গোবৰ্দ্ধনং যমুনা পুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীৎ উত্তমাপ্রীতি রাম মাধবয়োর্নৃপ ॥

বৃন্দাবন ধাম শ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভোগ্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। তরু, লতা, কুঞ্জবন, যমুনা পুলিন, কুণ্ড, গিরি, গোষ্ঠ সকলেই গোবিন্দ সেবার উপকরণ লইয়া সুসজ্জিত। নাটকে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্বাভাবিক শোভা সম্পদ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে পরমানন্দ প্রদান করিতেছে।

কচিদ্ ভৃঙ্গী গীতং কচিদনিল ভঙ্গী শিশিরতা
কচিদ্ বল্লী লাস্যং কচিদমলমল্লী পরিমলং।
কচিদ্ধারা শালী করক ফল পালীরস ভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনম্ ॥

মধুঋতুর সমাগমে কুঞ্জবনে অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে উহারা গোবিন্দের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে সেবা করিবার জন্যই এই গুঞ্জন ব্রত ধারণ করিয়াছে। সুশীতল হিল্লোলে লতাকুল আন্দোলিত হইয়া গোপালের লোচন যুগলের আহ্লাদের জন্য নৃত্য কুশলতার পরিচয় দিতেছে! মল্লিকার সৌরভ গোবিন্দের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিয়াই মন্দ মারুতের সঙ্গী হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছে। এই যে দাড়িম্ব বৃক্ষে সুপক্ক ফল বিদীর্ণ হইয়া রসধারা প্রবাহিত হইতেছে উহা শ্রীগোবিন্দের আস্বাদনের জন্যই তো? কুঞ্জ শোভার পরিসীমা নাই। অগণিত কবি, ভাবুক, রসিক, ভক্ত, দার্শনিক এই কুঞ্জ শোভা বিবিধ ভাবে অনুভব করিয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ বিলাসের উপকরণে কুঞ্জবন সুসমৃদ্ধ। নিত্য নবভাবে বিলাস-

আনন্দ। বসন্ত বিলাসের একটী দৃশ্য কবি গোবিন্দদাস কিরূপভাবে অনুভব করিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন—

নব ঘন কানন শোভিত কুঞ্জ।
তহিবর বিকশিত কুসুমক পুঞ্জ॥
নূতন পল্লব সৌরভ ভাল।
শারি শুক পিককুল বোলত রসাল॥
তঁহি ধণি অপরূপ রতন হিন্দোর।
তঁহি পর বৈঠল যুগল কিশোর॥
ব্রজ রমণীগণে দেই ঝখোর।
পরব জানি ধনি নাগর আগোর॥
কত কত উপজল রস পর সঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

শ্রীভাগবতে গোবর্দ্ধনকে হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সত্যই গোবর্দ্ধনের মত এরূপ সেবা আর কোথাও দেখা যায় না। গিরিরাজের মহিমা বর্ণনাতীত। গোবিন্দ-সুখের জন্যই তাঁহার জীবন। নিদাঘ তাপে পরিতপ্ত হইয়া গোচারণ ক্লেশের পর বিশ্রাম লাভ করিবার ইচ্ছা হইলে গোবর্দ্ধন পরম রমণীয় সুশীতল মণি শিলার আসন পাতিয়া দেন। পক্ষিগণের সুমধুর কাকলিই স্বাগত। নির্ঝরের জলে গোবিন্দের চরণ প্রক্ষালন করাইয়া প্রেম বিহ্বল মৃগকুলের পদক্ষিপ্ত দর্ভ-তৃণের অতি সুকোমল অংশ দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করা হয়। কুণ্ডের কমল গন্ধিজল আচমনীয়—ধেনুগণের দুগ্ধ, দধি ও বৃক্ষের মধু প্রভৃতির মিলনে মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা গোবিন্দ সেবার উপকরণ প্রস্তুত হয়। এ সকল বস্তুই গোবর্দ্ধনে সুপ্রাপ্য। ধারাপাতে স্নানীয় জল, বৃক্ষ বল্কল বসন, সুগন্ধি হরিচন্দন প্রভৃতি গন্ধ এবং প্রফুল্ল কুসুম সমূহে সেবা করিয়া গিরিরাজ

চিরদিনই শ্রীকৃষ্ণকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। ধূপ, দীপ, আভরণেরও কিছুমাত্র অভাব পড়ে না। দেবদারু, মহামণি, গুঞ্জাপুচ্ছ প্রচুর পরিমাণে পর্ব্বতের স্থানুপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল কন্দ ও মূলে গোবিন্দের বিচিত্র আহার্য্য রচনা হয়। তুলসী মুখবাসে শ্রীকৃষ্ণ না জানি কতই আনন্দিত হয়েন! পুষ্পবাসিত কুণ্ডের জল পুনরাচমনীয় ও পুষ্প চম্পকাদি দ্বারা আরত্রিক করিয়া হরিদাস বর্য্য গিরিরাজ গোবিন্দ সেবা করেন। ফুল্ল পল্লব শোভিত বকুল ছত্র, মলয় মারুত হিল্লোলিত নব পল্লব ব্যজন, ময়ূরের অঙ্গভঙ্গি নৃত্য পুষ্পশয্যা শয়ন স্থান, কোকিলের কূজন মঙ্গল গান, গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপকরণ সকলই আছে। ধন্য গিরিরাজ!

এবারে কুণ্ডের কথা! কুণ্ড বহু আছে, তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রধান। শ্রীগোবিন্দ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গোবিন্দপ্রিয় সহচরগণের আনন্দ কুঞ্জ, আর শ্রীরাধা কুণ্ডের চারিদিকে শ্রীরাধাপ্রিয় সহচরীগণের বিলাস কুঞ্জ। এই সকল কুঞ্জশোভা ও মহিমা প্রাকৃত মন বুদ্ধির অগোচর একমাত্র কুণ্ড বিলাসিনী শ্যামরঙ্গিণীর দাসীগণের কৃপা লাভ করিলেই এই অপূর্ব্ব দর্শনীয় দর্শন হয় ও মাধুরী অনুভব হয়।

ক্রমশঃ

# বিরহ

(১)

জীবন কবে আস্‌বে বল,
মরণ-মুখস পরিয়া,
মরণ আমার জীবন সখা!
বাঁচব আমি মরিয়া,

যাহার তরে জীবন ধারণ
তাহার যদি না পাই চরণ.
তুচ্ছ আমার জীবন যাপন
কি ফল বল বাঁচিয়া ॥

( ২ )

চাঁদ্ আজি গো বহ্নি-শিখায়,
জ্বালাইছে হৃদি মোর
কণ্টক-কঠিন-ঘায়
নিশি মোর হয় ভোর।
ব্যথার বেদন সারানিশি
অশ্রুছারা-কাঁদন হাসি,
( আমায় ) ভাসিয়ে দেয় শোকসাগরে
জড়িয়ে দিয়ে ছিন্ন ডোর ॥

( ৩ )

( আজি ) সাজায়ে রেখেছি প্রাণে
আসন, তাহারি তরে
সারাটি দিবা-নিশি
তা'রি তরে অশ্রু ঝরে।
পাষাণে আসেনা করুণা-বারি
হাসে না ইন্দু তামস হরি',
বৃথা কেন গো জীবন-প্রলোভন
মরণ চাহি, পরাণভরে' ॥
আশারি বাঁধনে পরাণ বাঁধিয়া।
পাইব জীবন, জীবন ত্যজিয়া ॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী।

২৮শ বর্ষ সমাপ্ত।